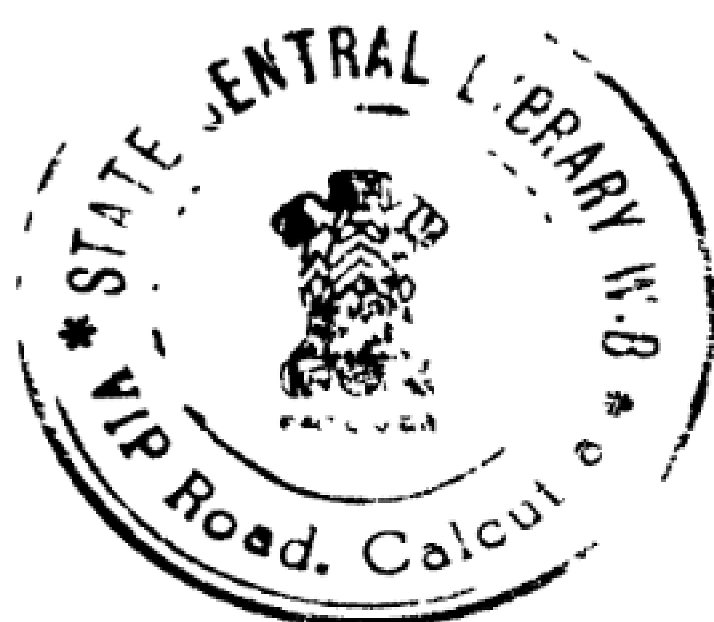




অ্যামাস্ট চটাং

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়





সেঞ্চুরি প্রকাশ

৫-১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : চৈত্র, ১৩৬৬

প্রকাশক :
ময়ূখ বসু
গ্রন্থপ্রকাশ :
৫-১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মুদ্রক :
শ্যামসুন্দর বসু
একমি প্রিন্টার্স
৭-ডি, হেরম্ব দাস লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ-চিত্র :
শচীন বিশ্বাস

মূল্য : পাঁচ টাকা

লটারিতে টাকা পেয়ে কতলোক বড়লোক হয়ে গেছে মুখে-মুখেই শুনে এসেছি, কিন্তু আমাদেরই পরিবারে আমার জলজ্যান্ত জাঠতুতো দাদা সে-ই যে একদিন লটারি-পাওয়া ভাগ্যবান পুরুষরূপে আমাদের চোখের সামনে এসে দাঁড়াবেন, এ কে ভেবেছিল ? সেই জাঠতুতো দাদা যেদিন তার আপিস যাবার ঠিক আগে একখানা চিঠি পেয়ে খামখানাকে খুলে কি রকম বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবোল তাবোল বকতে শুরু করে দিয়ে দেরি করে আপিসে গেল, তার অনেকক্ষণ বাদে আমরা বুঝলুম দাদা লটারিতে টাকা পেয়েছে।

দেড় হাজার টাকা। দাদার পক্ষে বড় কম নয়। এক সঙ্গে দেড় হাজার টাকা দাদা চোখেও দেখেনি। জেঠিমা এবং ঠাকুমা দুজনে মিলে অনেক হিসেব করেও ঠিক মালুম করতে পারলেন না টাকার অঙ্কটা কত বড়। বাড়ির কর্তাদের মধ্যে গবেষণা সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল। পরিবারের মধ্যে টাকাটা যখন এসেই গেছে তখন ওটা নিয়ে কি করা যায় ? অনেকেরই বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত বহুত রকম সদিচ্ছা ছিল যা মেটাবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। তাঁদের কথা শুনে মনে হল এ টাকাটা আসবে তাঁরা আগে থেকেই জানতেন এবং তার সদ্ব্যবহারের ব্যবস্থা তাঁরা করেই রেখেছিলেন।

দাদা কিন্তু আপিস থেকে ফিরে এসেই জানিয়ে দিলে লটারির দেড় হাজার টাকাটা হাতে পেলে সে কি করবে তার পুরো বন্দোবস্ত সে ইতিমধ্যেই করে ফেলেছে। তার আপিসেরই এক বন্ধু একখানা পুরোনো লরি দাঁওয়ে কিনবে বলে কিছুদিন ধরে মতলব ভাঁজছিল। ছ-হাজার টাকা দাম। সাড়ে চার হাজারের মত যোগাড় হয়েছে।

দাদার দেড় হাজার পেলেই ছ-হাজার হয়। এর উপর আর কি কথা? দাদা কথা দিয়ে এসেছে দু-জনে মিলে লরিটা কিনবে এবং ভাগে মাল-বওয়ার ব্যবসা শুরু করে দেবে। লভ্যাংশ দাদার অংশ অনুসারে চার ভাগের এক ভাগ। কর্তারা মুখে দাদার বুদ্ধির খুব প্রশংসা করলেন। কিন্তু দাদার লটারির টাকার কোনো ভাগই যে তাঁরা পেলেন না তাতে বিষম চটলেন মনে মনে।

এই হচ্ছে আমাদের লরি কেনার ইতিহাস। এই ঘটনার সঙ্গে আমার সমস্ত জীবনের গতি যে কী অদৃশ্য বন্ধনে বাঁধা ছিল তা কি আর সেদিন জানতুম? ভবিতব্যের এক অমোঘ নির্দেশে সেইদিনই আমার পরিণত জীবনের মোটামুটি চিত্রটি অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল। সেইদিনই ঠিক হয়ে গিয়েছিল যে আমি হব চটকলের বাবু এবং মানুষের প্রতি অবিচার, অত্যাচার, প্রবঞ্চনার চাক্ষুষ জ্ঞানে আমার জীবনের অভিজ্ঞতা একদিকে যেমন ঐশ্বর্যশালী হবে অন্যদিকে তেমনি মনুষ্যকুল চালিত করবার দায়িত্ব যাঁদের হাতে তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার মন হয়ে উঠবে সন্দিহান।

আমাদের উঠোনে বেশ খানিকটা জায়গা ছিল বলে লরিটা আমাদের উঠোনেই থাকত। কিন্তু কারবার চলতে থাকলো দাদার বন্ধুর বাড়ি থেকে। দাদার বন্ধুর বাড়ির বৈঠকখানা-ঘরের তক্তপোশটাকে সরিয়ে একখানা চেয়ার, একটা টেবিল, দু-খানা টুল, লাল পালিশ করা ছোট্ট একটা আলমারি, কিছু কাগজপত্র কালি দোয়াত আর রবার স্ট্যাম্প এই সাজিয়ে দিতেই সেটা দাদাদের কারবারি আপিস-ঘর হয়ে গেল। বৈঠকখানা ঘরের যে দেয়ালটা রাস্তার উপর সেখানে হলদে রং-এর একটুকরো টিন মেরে তাতে লিখে দেওয়া হল—অমুক ট্র্যান্সপোর্ট কোম্পানী! শুরু হয়ে গেল ব্যবসা। আমাদের পাড়ার লোকেরা সবাই জেনে গেল আমাদের পাড়ায় একটা লরি এসেছে। আর দাদার বন্ধুর পাড়ায় যত দোকান আছে সবাইকে জানানো হয়ে গেল, যদি কারো লরির প্রয়োজন ঘটে

তাহলে অমুক ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর আপিসে খবর দিলেই মুহূর্তে লরি এসে পড়বে।

আমি 'আই-এ'টা কোনরকমে পাশ করে আরও লেখাপড়ার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে চুপচাপ বাড়িতে বসেছিলুম। আমাকে আরো পড়াবার সামর্থ্য বাড়ির কারুর নেই—তা ছাড়া লেখাপড়ায় কোনোদিনই এমন কিছু কৃতিত্ব দেখাইনি যাতে করে আমার লেখপড়ার পিছনে আরো খরচ করাটাকে অনর্থক বিলাস ছাড়া আর কিছু বলে কেউ ভাবতে পারেন। বরং সকলেই চাইছিলেন, মুখ ফুটে যদিও কেউ প্রকাশ করেননি, যে এইবার একটা চাকরি-বাকরি যোগাড় করে আমি যেন নিজেকে বাড়ির উপযুক্ত পুত্র বলে প্রমাণ করার চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগে যাই।

কিন্তু চাকরি কেমন করে পেতে হয়, কেমন করেই বা তার চেষ্টা করতে হয় এ-সব আমার কিছুই জানা ছিল না। হাতে প্রচুর সময় থাকায় দাদাদের লরিতে কোনো মাল বইবার কাজ এলে আমি উঠে বসতুম। বেশীর ভাগ সময়েই অবশ্য লরিটা পড়ে থাকতো আমাদের উঠোনে। ডাক আসতো কালে-ভদ্রে। তখন তাড়াহুড়ো করে ঠিকে ড্রাইভার খোঁজা হত। মাইনে করা ড্রাইভার তো ছিল না। আমি লরিতে উঠে ড্রাইভারের পাশটিতে বসে পড়তুম।

ঠিক এমনি করেই একদিন দাদার লরিখানা বারাসত থেকে কাঁচা গাঁটের পাটে বোঝাই হয়ে যখন জগদ্দল অঞ্চলের এক চটকলে ঢুকলো, সেইদিনই আমার কপাল খুললো। অযাচিত অভাবিত-ভাবে ঘুচলো আমার গলগ্রহ দশা। এখন ভেবে দেখলে মনে হয়, দাদার যে দেড় হাজার টাকা সেটাও যেমন লটারির ফল, আমি যে কেউ কিছুই নই, হঠাৎ একটা চাকরি পেয়ে গেলুম সেটাও ঐ একই লটারির ফল।

আমরা যে চটকলের দরজার সামনে এসে হাজির হলুম তার

দরজা তখন বন্ধ। দরজার সামনে রাস্তার বাঁ পাশে ঠিক আমাদেরই মত আরো অনেক লরি পাট বোঝাই হয়ে সারি-সারি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

চটকলে সব সময়েই এমনি। একটা দু-টো কি তিনটে দরোয়ান সারাক্ষণ খাড়া থাকে ফটকটা একটুখানি ফাঁক করে রেখে। হুকুম বিনা কোনো গাড়ি ঢোকবার বা বেরবার উপায় নেই। অন্তত বারো হাত উঁচু প্রাচীর। পাঁচিলের উপর কাঁটা-তার এ-পার থেকে ও-পার অবধি লম্বা করে টানা। জেলখানার মতো। ওপারে কি আছে দেখবার যো নেই। শুধু দেখা যায় প্রকাণ্ড মোটা একখানা ইঁটের তৈরী চিমনি উঠেছে আকাশকে প্রায় ছুঁয়ে। তার মুখ দিয়ে বার হচ্ছে পাঁশুটে রং-এর ধোঁয়া। আর সেই পাঁচিলের ধারে খোলা নর্দমার পাশে চট বিছিয়ে বসে আছে ফেরিওয়ালারা। মোটা কোরা কাপড়ের গাঁট, জামা, ফতুয়া, লুঙ্গী, গেঞ্জী এই সবই বেশী। বাসন, তেলের কুপী, ছুরি, কাঁচি, দড়ি আর নানারকম নিত্য-ব্যবহার্য জিনিসও এখানে ওখানে ধুলোর মধ্যে সাজানো।

রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল একটা লোক। আমাদের লরিটা আসতেই সে হঠাৎ এগিয়ে এসে আমাদের লরির নম্বরটা পড়ে নিল। তার হাতে ছিল একটা ছোট্ট ময়লা খাতা—মনে হল যেন তারই সঙ্গে নম্বরটা মিলিয়ে দেখছে। তারপর সে আমাদের ড্রাইভারকে হাত নেড়ে ইশারা করলো এগিয়ে যেতে এবং ফটকের দরোয়ানও ঐ লোকটার কি একটা ইঙ্গিত দেখে ফটক খুলে ধরল।

কে যেন কাকে বলে উঠল—মিলকা লরি! কানে পৌঁছল কথাটা, কিন্তু ভেবে উঠতে পারলুম না দাদাদের লরিটা মিলকা লরি হয়ে গেল কি করে! অত তখন ভাবিওনি। পাঁচিল-ঘেরা অত বড় একটা কারখানা নিজের চোখে দেখা সেই আমার প্রথম। তারই দরজা খুলে যাচ্ছে এবং তার মধ্যে প্রবেশ করছি

এই অভিজ্ঞতাটাই আমার কাছে এত নতুন যে, মনে হচ্ছিল যেন কোনো রহস্য-পুরীর মধ্যে প্রবেশ করছি। সেখানে কোন কলে কি চলে, কোথা দিয়ে কি হয়ে যায়, কোন ভাষায় কোন ইঙ্গিতে কথা চলে এ সব আমার বোধশক্তিতে আমার ধারণায় ছোঁয়াই যায় না।

সমস্ত রহস্যটা পরিষ্কার হয়েছিল আরো অনেক পরে, যখন আমি চটকলের চাকরিতে বহাল হয়ে গেছি। সে কথা পরে বলছি।

আমাদের লরি খোলা ফটকের মধ্যে দিয়ে ঢুকতেই দরোয়ান হাত নেড়ে দেখিয়ে-দিলে কোন দিকে যেতে হবে। মাটিতে পাতা তৈলাক্ত রেলের লাইন, মাথার উপর কপিকল, বাতাসে উড়ছে ধুলোমাখা পাটের ফেঁসো। সোজা কিছুদূর যেতেই আবার এক দরোয়ান হাত দেখিয়ে বলে দিল জুট হ্যাণ্ডলিং ডিপার্ট-মে চলা যাও। যেন আমাদেরই জন্যে অপেক্ষা করছিল। অবশেষে একটা করগেটের দরজার সামনে এসে আমরা থামলুম। কত উঁচু দরজাখানা! মনে হয় যেন আকাশে গিয়ে ঠেকছে। এরই আড়ালে গুদম ঘর—পাট গুদম; আমাদের লরিখানা দাঁড়াতেই জুট-হ্যাণ্ডলিং ডিপার্ট-এর দু-তিনজন কুলি টপাস করে আমাদের লরির পাটের বোঝাই-এর উপর লাফিয়ে উঠে পাট পরীক্ষা করতে লেগে গেল। চুলের মুঠি ধরার মতো করে টেনে টেনে পাটের গোছা বার করতে লাগল নিজের ইচ্ছামত পাটের গাঁট থেকে। এর অনেক পরে জেনেছিলুম চটকলের এই সব ওস্তাদ পরীক্ষক লরি থেকে বেছে সব সময় ভালো পাটের গোছাগুলি বার করে দেখায় সায়েবদের, পরীক্ষার জন্যে। খারাপ বা জলে-ভেজা পাট বার করে না। কাঁচা মাল যারা সরবরাহ করে তাদের সঙ্গে আগে থেকেই এই সব কুলিদের বন্দোবস্ত করা থাকে। এর জন্যে তারা বেশ মোটা টাকা পায়। অনেক ক্ষেত্রে মিলের যে সায়েবের

উপর কাঁচা পাট কেনার ভার তাঁর সঙ্গেও গোপনে বরাদ্দ করা থাকে সরবরাহকারীর, কাজেই তিনিও মাল কেনবার সময় বিশেষ খুঁটিয়ে দেখে নেন না। কুলিদের হাত থেকে পাটের গোছা নিয়ে একবার নাকের কাছে এনে শোঁকেন, খানিক টেপেন, একবার দৈর্ঘ্যটা আন্দাজ করেন, তারপর আবার কুলির হাতে ফিরিয়ে দিয়ে পকেট থেকে রুমাল বার করে হাত মুছে ফেলেন। পরীক্ষা যখন চলেছে, হঠাৎ কোথা থেকে এলেন এক ভদ্রলোক। পরনে ফিন-ফিনে ধুতি, আদ্দির পাঞ্জাবি, মুখে পান, তৈলাক্ত কোঁকড়া চুল, কিন্তু দাড়ি গোঁফ বোধ হয় দু-তিন দিন কামানো হয়নি। এসে তিনি আমাকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করে বসলেন। তাইতে আমি ভারি অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি লরি থেকে নেমে প্রথমেই তাঁর ভুল শুধরে দিলুম। বললুম—আমাকে কেন আপনি—আপনি করছেন? বয়েস তো একটা—

ভদ্রলোক বললেন—লরিটা কার?

—দাদার লরি। আসছিল তাই চড়ে পড়লুম। ঘুরে যাবো একটু।

লরিটা যে আসলে শেয়ারের, দাদার যে আরও একজন অংশীদার আছেন সেটা মুখে এলেও বলতে কি রকম বাধল। তা ছাড়া বলতে গেলেও অনেক কথা বোঝাতে হয়—সেও এক অসুবিধা।

—আহা, তবে তো একই কথা হল। শোনো, তোমার দাদাকে একটা কথা বোলো। বলতে পারবে?

—আজ্ঞে কেন পারব না?

বেশ বোলো যে এই লরি কাল থেকে আমার কাজে রোজ খাটবে। অন্তত পাঁচ মাস। তোমার দাদা যেন আর কারো কাছে কথা না দেন। যদি দিয়েও থাকেন নাকচ করে দিতে বোলো। আর বোলো এর দরুন আজ যা ভাড়া ঠিক হয়েছে তার থেকেও আরও দুটাকা বেশী ভাড়া আমি দেব।

—বলব।

—বাড়ি ফিরেই বলা চাই। দেরি করলে চলবে না। কাল সকালে আমার লোক গিয়ে টাকাকড়ির বন্দোবস্ত করে আসবে।

নিজেকে আমার মস্ত লোক বলে বোধ হতে থাকল। এত বড় দায়িত্ব এর আগে কেউ কোনোদিন আমায় দেয়নি। সেই দায়িত্ব-বোধের জন্যেই বোধহয় বললুম—দাদার সঙ্গে কিন্তু সন্ধ্যের আগে আমার দেখাই হচ্ছে না। .আপিসে যায় কিনা!

—তাতেই হবে। তাতেই হবে।

সন্ধ্যায় দাদা ফিরলে দাদাকে সব বললুম। দাদা বললে—বাঃ এ তো চমৎকার অফার পাওয়া গেছে। ভাড়াও বেশী, তার উপর পাঁচমাসের কড়ার। আজ এখানে কাল ওখানে করতে হবে না। যা তুই শিগ্‌গীর আমার পার্টনারকে খবর দিয়ে আয়। বন্দো-বস্তের জন্যে ওরই বাড়িতে আসবে।

এই মস্ত খবর দিয়ে এবং খবরের দরুন পেট ভরে সন্দেশ খেয়ে বাড়ি ফিরে সেদিন ভারি তৃপ্তি পেয়েছিলুম। কিন্তু ঐ যে বলছিলুম দাদার লটারিতে আমারও কপাল খুলে গিয়েছিল সেটা তার পরের দিন।

॥ দুই ॥

পরের দিন আবার লরিতে পাট বোঝাই করে চটকলে ঢুকলুম। সেদিনও দেখলুম বিস্তর পাটের লরি মিলের ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে। সবাই ভিতরে ঢোকার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমাদের লরি কিন্তু বিনা বাধায়, এক হাতের ইশারার পর আর-এক হাতের নির্দেশ অনুসারে সোজা গিয়ে হাজির হল ইপ্সিত স্থানে।

গুদমের দরজা সেদিন খোলা। পাহাড়ের মতো স্তূপীকৃত পাটের গাঁট—এক স্তরের পিছনে আর এক স্তর। উচ্চ থেকে উচ্চতর।

বাংলা দেশের লক্ষ লক্ষ চাষীর জীবনধারণের সম্বল। চটকলের মূল রসদ। ইংরেজরা সোহাগ করে যার নাম দিয়েছে 'দি গোল্ডেন ফাইবার'। এই নিয়ে যারা কারবারে নেমেছে সোনায় ভরে গেছে তাদের ঘর। আধ খোলা ঘরের মধ্যে থেকে জমা-পাটের স্যাঁতসেতে আর কড়া গন্ধের সঙ্গে একটা গরম হাওয়া বেরিয়ে আসছে। মনে হয় যেন পাটের কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে কারা—তাদেরই গরম নিঃশ্বাসের হলকা বাইরের বাতাসে এসে মিশছে।

আমাদের পাট পরীক্ষা হয়ে গেলে আগের দিনেরই মত লরি থেকে যখন পাট নামানো হচ্ছে এবং আমাদের মতো আরো দু-তিনখানা লরি এসে গুদমের সামনে দাঁড়িয়েছে আর চলেছে তাদের পাট পরীক্ষা, ঠিক তখনই আগের দিনের সেই আদ্দির পাঞ্জাবি পরা বাবুটি এসে হাজির হলেন। আজকে তাঁর সঙ্গে এক সায়েব। সায়েব দেখলুম সেই বাবুটির সঙ্গে পাট পরীক্ষা করতে লাগলেন। বাবুটি আমাকে দেখে চিনেছিলেন। সায়েব এক সময় যখন গুদমে ঢুকছেন সেই সময় বাবুটি এসে আমায় বললেন—আজও বেড়াতে বেরিয়েছ বুঝি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কি করা হয়? ইস্কুল কলেজ নেই?

—আজ্ঞে না। আই এ-টা পাশ করেছি! আর পড়বার ইচ্ছে নেই।

—কেন হে কি হল?

—লেখাপড়া করে আর কি হবে বলুন? সেই তো ত্রিশ টাকা মাইনের চাকরি। তার চেয়ে স্বাধীন ব্যবসা ভালো!

তখন আমার বয়েস এবং অভিজ্ঞতা এতই কাঁচা যে চাকরি সম্পর্কে আমার যতটুকু জ্ঞান ব্যবসা সম্বন্ধেও তাই। তাই অতি সহজে চাকরি বা ব্যবসা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ লোকের মত গম্ভীর গম্ভীর কথা বলতে পারতুম।

বাবুটি বোধহয় একটু মনে মনে হাসলেন। বললেন—এটি অতি খাঁটি কথা। তারপর একটু থেমে বললেন—কিন্তু আপাতত যখন তুমি কিছুই করছ না, একটা চাকরিই কর না কেন? করবে? ঐ ত্রিশ টাকাই মাইনে।

প্রথমটা ভারি অপমানিত বোধ করলুম। কিন্তু সে এক মুহূর্ত। ভদ্রলোকের কথার মধ্যে যে শ্লেষটা ছিল সেটা মনে হল হঠাৎ যেন উবে গেল। উবে গিয়ে যেটা বাকি রইল সেটা ঐ ত্রিশ টাকা। মাসে মাসে তিরিশটা করে টাকা হাতে আসার কল্পনার মধ্যে যে সুখ সেটা সত্যিই আমার চিত্তের উপর সুধা বর্ষণ করে দিয়ে গেল। ঐ এক মুহূর্তেই যে বদলটা এল আমার মধ্যে তাতে করে মনে হল আমি আর ছেলেমানুষ নই, বড়দের মতো করে বাস্তবকে দেখার একটা রাস্তা খুঁজে পেয়ে গেছি। ভাবলুম—এ কি সত্যি? তুচ্ছ নগণ্য আমি। অজানা অচেনা। এখানকার এই জাঁদরেল বাবুটি, যাঁর সঙ্গে সায়েব ঘুরে বেড়ায়, তিনি আমায় চাকরি দিতে চাইছেন?

আমি একটু আমতা আমতা করে বললুম—চাকরি করতে বলছেন? কোথায়?

—যদি রাজী থাকো তো বলো। এইখানেই এই চটকলে। ঐ যে সায়েব বেরিয়ে আসছেন। নাম কি তোমার?

—শ্রীসুকুমার পালিত।

—সুকুমার? বেশ, বলি তাহলে?

আমি ঘাড় নেড়ে বললুম—আচ্ছা।

ঘটনার পর ঘটনা এমন দ্রুত ছন্দে একটার পর একটা হুড়মুড় করে আমার জীবনে কখনও আসেনি। কি যে বলছি, কি যে করছি, সেদিন আমার সব কিছুই উপলব্ধির বাইরে।

বাবুটি দেখলুম সায়েবের সঙ্গে ঘাড় নেড়ে নেড়ে কি সব কথা কইলেন। সায়েব একবার ঘুরে আমার দিকে তাকালেন। তারপর যতদূর মনে পড়ে যাবার সময় বোধহয় বলে গেলেন—টেক হিম।

বাবুটি মিষ্টি হেসে এগিয়ে এসে বললেন—হয়ে গেল। কালকে এসে জয়েন কোরো। রেশনিং বিভাগে চলে আসবে। আমার নাম কোরো। আমার নাম বিভূতিবাবু। সবাই চেনে। আটটার সময় এসো। আটটায় হাজিরা দিতে হয়।

—আজ্ঞে কালই? সামনের মাসের পয়লা থেকে···

—এই তো বললে বসে আছো। দেরি করে লাভ কি? যত দেরি করবে ততই লোকসান। বেশী দেরি করলে চাকরি ফসকেও যেতে পারে।

—আচ্ছা। বলে সেদিনের মতো চলে গেলুম।

ত্রিশ টাকা মাইনের চাকরি পাওয়ার এই আমার ইতিহাস। দাদার লটারির প্রত্যক্ষ ফল।

বিভূতিবাবু ছিলেন রেশনিং বিভাগের বাঁটোয়ারিবাবু। যুদ্ধের সময় তখন কলে কলে রেশনিং চলেছে। প্রধানত চালেরই রেশন। তার সঙ্গে বাঁধা দরে কখনও কখনও সর্ষের তেল, চিনি, ময়দাও দেওয়া হত। আমাকে সেই বিভাগেরই এক সামান্য কেরানীর পদে বহাল করা হল। বলা হল আমাকে হিসেব রাখতে হবে।

আমার একটু ভয় হল। হিসেব রাখার আমি কি জানি? কেউ যদি শিখিয়ে না দেয়, কোথায় কি ভুলচুক করে ফেলব তারই বা ঠিক কি? কিন্তু বিভূতিবাবুই আমায় বাঁচালেন। একটু আগেই তিনি আমায় বলে গিয়েছিলেন যে, আমায় হিসেব রাখতে হবে, আবার একটু পরেই এসে বললেন—ওহে সুকুমার, ভাল করে শিখে পড়ে না নিলে তো আর তুমি খাতা লিখতে পারবে না—কে-ই বা এখন শেখায় তোমায়? তুমি এক কাজ কর, এই খাতাটা নাও। দেখ দেখি নম্বরগুলো পড়তে পারো কি না?

বলে আমার হাতে একখানি ছোট্ট ময়লা নোট বুক দিলেন। তাতে দেখলুম পেন্সিলে লেখা একসারি অক্ষর আর সংখ্যা গোটা

গোটা করে। বেশ কয়েক পৃষ্ঠা। একটু লক্ষ্য করে বুঝলুম সেগুলি লরির নম্বর।

বললুম—আজ্ঞে হ্যাঁ। এগুলি গাড়ির নম্বর বুঝি?

বিভূতিবাবু বললেন—ঠিক বলেছ। চল কি করতে হবে বলে দিই।

সেই থেকে আমার কাজ হল কারখানার বাইরে একটি ল্যাম্প-পোষ্টের পাশে খাতাটি হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকা এবং লক্ষ্য করা পাটে-বোঝাই হয়ে যে লরিগুলি আসছে তার নম্বরগুলি কি? খাতায় লেখা নম্বরের সঙ্গে যদি কোনো নম্বর মিলে যায় তাহলে দূর থেকে দরোয়ানকে ইশারা করা—দরজা খুলে দাও। যে লরির নম্বর মিলবে না তার জন্যে কোনো ইশারা নেই। তাকে অপেক্ষা করতে হবে সার-বন্দীর মধ্যে গেটের বাইরে। ভিতরে যাবার জন্যে অনুমতি চেয়ে পাঠাতে হবে এবং অনুমতি পত্র এসে পৌঁছান পর্যন্ত, সে যতই দেরী হোক, অপেক্ষা করতে হবে বাইরে দাঁড়িয়ে, ঝড়, বৃষ্টি, রোদ সব কিছু মাথায় করে।

আমাদের লরিটা আগের দিন ঢোকবার সময় যে লোকটি খাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন ঠিক তার জায়গায় আমি গিয়ে দাঁড়ালুম। ঠিক তাঁরই মতো খাতা দেখে নম্বর মিলিয়ে চললুম। সেই পূর্বোক্ত ভদ্রলোক যে কোথায় গেলেন আজও জানি না।

কারখানার বড় ফটকের ঠিক সামনে পর পর তিনখানা খাবার দোকান। মাঝেরটা বেশ বড়, পাশের দুটো কিছু ছোট। খোলা নর্দমায় উপরেই ঝুলে আছে দোকানের খাবারের আলমারি। তার কাঁচের ডালার পিছনে বড় বড় জিলিপি, হিংএর কচুরি, মোটা মোটা ঝুরি ভাজা, ফুলুরি, বেগুনি, ইত্যাদি। বিরাট কড়ায় সব সময় কিছু না কিছু ভাজা হচ্ছে। খাবার বাসি হতে পায় না। গ্যালভানাইজ টিনের গোল বুয়ামে জল ফুটে চলেছে সর্বক্ষণ। যখন দরকার তার থেকে ফুটন্ত জল কানিতে মোড়া গুঁড়ো

চায়ের উপর ঢেলে চায়ের নির্যাস বার করে নেওয়া হচ্ছে—এর আর বিরাম নেই। কারখানা চলুক আর বন্ধ থাকুক খদ্দেরের অভাব নেই এই তিনটে দোকানে। দোকানের ভিতরে বসবার চওড়া তক্তা আছে। বাইরে খোলা নর্দমার ধারে আছে সরু সরু কাঠের টুল। খদ্দেররা নর্দমার ধারের এই টুলগুলিকেই পছন্দ করে বেশী। নর্দমার গন্ধ চা বা জিলিপি পুরি খাবার সময়ও কারো নাকে যায় না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি এই দেখি। এখানকার কারখানার লাগাও রাস্তার ধারের জীবনটা নতুন রকম লাগে। ছোট দোকানের একটাতে সন্দেশ, মনোহরা, পান্তোয়া বিক্রি হয় আর অন্যটায় কেক বিস্কুট নান-খাতাই। সন্দেশ আর পান্তোয়া আনিয়ে খেয়ে দেখেছি, ছানার চেয়ে ময়দার স্বাদই বেশী। সন্দেশের উপর পেস্তার কুঁচির মতো একরকম জিনিস দেওয়া থাকে। চেখে দেখেছি আসলে সেগুলি সবুজ রং করা নারকেলের কুঁচি। তাহলেও আমার মন্দ লাগে না। এ সব যেন এই বিরাট কারখানার পাঁচিলের ছায়ায় বেশ মানিয়ে যায়। এখানকার পরিবেশের সঙ্গে এখানকার রাস্তার ধারের খোলার চালের দোকানগুলি, যেখানে হারিকেন লণ্ঠন থেকে চুলের ফিতে পর্যন্ত সব কিছু বিক্রি হয়, একটুও অসঙ্গত ঠেকে না। উত্তুঙ্গ পাঁচিল তুলে জায়গাটাকে মৃতবৎ করে তোলবার যে চেষ্টা এক সময় করা হয়েছিল, এই সব নোংরা দোকানের ভিড়, রাস্তার ধারের এবং রাস্তার ধুলোর উপর সস্তা পণ্যের হাট তা একেবারেই ব্যর্থ করে দিয়েছে। জায়গাটা হয়ে উঠেছে জীবন্ত।

'মিল্‌কা লরি' যে কাকে বলে বুঝে উঠতে দেরী হল না। মিল্‌কা লরি মানে আমার হাতের ময়লা তেলচিটে ছোট্ট খাতার তালিকাভুক্ত লরি—যাদের নম্বরগুলি মিলে যাচ্ছে। দাদার লরির নম্বরও খাতায় লেখা ছিল। কিন্তু সেটা মিল্ কা লরি কি করে হল এ রহস্যের সমাধান হল যখন বুঝলুম বিভূতিবাবুর ভাড়া-করা

লরির অন্য নাম হচ্ছে মিল্ কা লরি। তাদের গতি কেউ রোধ করতে পারে না। তাদের ছাড়পত্র আমার হাতের ঐ ময়লা খাতার পাতায়। তাদের চালই আলাদা।

বিভূতিবাবু রেশনিং বিভাগে কাজ করেন কিন্তু তাঁর আসল কাজ সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। এ সব কথা আমার কানে আসতে লাগল এবং খুব দ্রুতই আসতে লাগল। অনেকেরই ধারণা হয়েছিল, কোনো অজানিত কারণে আমার উপর বিভূতিবাবুর সুনজর পড়েছে। তাই অনেকেই অযাচিতভাবে আমাকে বিভূতিবাবু সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে তুলতে লাগলেন।

॥ তিন ॥

রেশনিং বিভাগের সামান্য পদের কেরানী বিভূতিবাবু। যুদ্ধের সময় খাবার জিনিসের বিশেষত চালের ঘাটতি পড়ায় সর্বত্র যখন রেশনিং চালু হল তাঁর, বেশ কিছুদিন আগে থেকেই চটকলের কর্তারা কলের মজুরদের কম দরে কিছু কিছু খাবার সরবরাহ করতে শুরু করেছিলেন। কলের মালিকই এর দায়িত্ব নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, নইলে পরে হয়তো শুধু চালের দুর্মূল্যতার ফলেই সব মজুর কারখানা ছেড়ে ফিরে যেত গ্রামে—কারখানাই বন্ধ হয়ে যেত। বিভূতিবাবু সেই গোড়া থেকেই আছেন। যে সময় গভর্নমেণ্ট চালের কণ্ট্রোল সম্পূর্ণ নিজ হাতে নেননি সে সময় নানান গোপন আড়ত ঘুরে বিভূতিবাবু চাল যোগাড় করে কারখানার গুদমে এনে ভরেছেন। কোথায় কত দামে যে চাল পাওয়া যাবে তার তোয়াক্কা সেই যুদ্ধের বাজারে তখন কে করে? কাজেই বিভূতিবাবুর হাতে তখন থেকেই কিছু কাঁচা পয়সা আসতে আরম্ভ করেছে। এবং অভিজ্ঞতা শুরু হয়েছে কেমন করে বেশ মোলায়েমভাবে কিছু অর্থাগম করা যায় অথবা কারুর চোখ না টাটিয়ে।

হারিচ সায়েব যে কিছু বুঝতেন না তা নয়। রেশনিং বিভাগকে চালু রাখার দায়িত্ব ছিল তাঁর। বিভূতিবাবু বা অন্যান্য সরকার বাবুরা যদি বাইশ টাকা দরে চাল কিনে বিল সহ প্রমাণ দেন চব্বিশ টাকা দরে কিনেছেন, হারিচ-এর তাতে রাগ হবার কথা নয়। যুদ্ধের বাজারে এ তো হবেই। এ সবকে বাধা দিতে যাওয়া বা বন্ধ করার চেষ্টা করা মানেই যুদ্ধের গতিকে রোধ করা।

কারখানায় কারখানায় রেশনিং চালু রাখতে পেরেছিলেম বলে মিল-কর্তারা পরে কত বাহাদুরি নিয়েছেন। গভর্ণমেন্ট যখন রেশনিং বিভাগ গঠন নিয়ে, চালের 'প্রোকিওরমেন্ট' নিয়ে পল্লীতে পল্লীতে রেশনের দোকান খোলার সমস্যা নিয়ে হিম্‌সিম্ খেয়ে যাচ্ছেন ততদিনে কলকাতা শিল্পাঞ্চলে 'ফুড-স্টাফ-স্কীম' রীতিমত চালু হয়ে গেছে। সারা যুদ্ধের মধ্যে দশ লক্ষ মজুরকে খাবার যুগিয়ে গেছে এই কারখানার মালিকরা। বরঞ্চ যারা তা পারেনি, যারা বেশী দাম চেয়েছে, যারা উপযুক্ত চাল দিতে পারেনি, চাল নিয়ে চোরাই কারবার করতে গিয়ে ঠেকায় পড়ে গেছে, তাদেরই বরং কারখানায় হরতাল হয়েছে, লক্ আউট হয়েছে, কারখানা বেচাল হয়ে গেছে।

সরকারী রেশনিং যখন পুরো চালু হল, বিভূতিবাবু যখন তাঁর ছোট্ট বিভাগের ছোটকর্তা, তখন কালো বাজার থেকে চাল এনে মিলকে ঠকিয়ে পয়সা করার পথ বন্ধ হল। তা হোক, কিন্তু রেশনের মাল এদিক ওদিক সরিয়ে রাখা, ওজনে প্রত্যেককেই কিছু কম দিয়ে উদ্বৃত্তটাকে কালোবাজারে বেচে দেওয়া—এগুলিতে কোনো বাধা ছিল না। হারিচ সায়েবের দুজন বাবুর্চি, দুজন মালী, চারজন বেহারা, দু'জন দরোয়ান এরা সব সময় রেশনের সবচেয়ে ভাল চাল, বেশ খানিকটা বাড়তি তেল আর চিনি নিয়মিত পায়। হারিচ সায়েব জানেন। জেনে খুশী। কালে অকালে তিনি নিজেও যে বিভূতিবাবুর কাছ থেকে কলাটা মুলোটা পান না তা তো নয়। দুই কাতলাও মাঝে মাঝে মেলে। তাই বিভূতিবাবুর

আগেকার রোজগারে মন্দা পড়লেও তাঁর প্রতিপত্তি অল্প-বিস্তর ছড়াতে থাকে। সামান্য মাইনের কেরানী হলেও কারখানার অনেকেই জানে সায়েব তাকে বেশ পছন্দ করেন।

এমনি সময় হঠাৎ একদিন হারিচ সায়েব বিভূতিবাবুকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন। বললেন—বিভূতি, তোমায় একটা বিশেষ কাজের ভার দিচ্ছি। বারাসতে যেতে পারবে?

—আজ্ঞে হাঁ সাহেব। অনায়াসে।

—তোমার দৈনিক কাজের কোনো ক্ষতি হবে না? রেশন বেটে দেওয়া, হিসেবপত্র, এ সব?

ভাববেন না সায়েব। গোছানো ডিপার্টমেন্ট। সব কিছু ম্যানেজ হয়ে যাবে। কোনো অনুযোগ শুনতে পাবেন না।

আপিসের অন্য সব চুনোপুঁটি বড়বাবু-ছোটবাবুর সঙ্গে এইখানে ছিল বিভূতিবাবুর তফাত। যাঁরা বড়বাবু তাঁরা তাঁদের সাঙ্গোপাঙ্গ অনুচরদের নিয়ে ছোটোখাটো একটি সামন্তরাজ্য গড়ে তারই ভোগসুখে মেতে থাকতে ভালবাসতেন। তাঁরা চান তাঁদের অস্তিত্ব এবং প্রতাপ প্রতিমুহূর্তে তাঁদের নিম্নতম কর্মীরা সশঙ্কিতচিত্তে অনুভব করুক এবং বুঝুক যে এক মুহূর্ত তাঁরা সরে দাঁড়ালে তাঁদের সাম্রাজ্য লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। কিন্তু বিভূতিবাবুর আপিস চালানোর প্রথা ছিল অতি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত। তিনি জমিদারি তাঁবেদারী প্রথায় বিশ্বাস করতেন না। তাঁর আপিস চালানোর এমন আশ্চর্য গুণ ছিল যে প্রয়োজন হলে যে-কোনো সময় তিনি সরে দাঁড়াতে পারতেন। তাতে তাঁর আপিসের কাজের বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত ঘটত না। এই দুর্লভ গুণের কদর হারিচ সায়েব করতেন।

সায়েব শুনে খুশী হলেন। বিভূতিবাবু সায়েবের একখানা চিঠি নিয়ে বারাসতের পাটের বাজারে স্থানীয় এক দালালের সঙ্গে দেখা করলেন। দালাল তাঁকে প্রচুর কাঁচা পাট দেখালো। বিভূতি-বাবুর উপর ভার ছিল পাটগুলি দেখে সায়েবকে এসে বলা। কেমন

ভাবে কি কি দেখতে হবে তা সায়েব কিছুই বলে দেন নি। তা ছাড়া পাট কি করে চিনতে হয় বিভূতিবাবু রেশনিং বিভাগের কেরানী তার কী বা জানেন ?

তিনি প্রশ্ন করলেন—কত গাঁট পাট মজুত আছে এখানে ?

—দেড় হাজার।

—দেড় হাজার ? বেশ তাহলে তিন মণ কি চার মণ করে যদি গাঁট হয় তবে দাঁড়াচ্ছে হাজার পাঁচেক মণ—এই তো ?

বিভূতিবাবু যে পাটের গাঁটের একজন দক্ষ বিচারক এই ধাপ্পাটা তাঁর কথার মধ্যে দিয়ে যত পারেন বোঝাবার চেষ্টা করলেন। তাঁর ভয় ছিল দালাল না ভেবে বসে এ আবার কোন্ বুদ্ধুকে সায়েব পাঠিয়েছে।

তারপর বিভূতিবাবুর হঠাৎ মনে হল পাটগুলো কেমন ভিজে ভিজে ঠেকছে না ? ভিজে পাট নিয়ে কারখানায় অনেক গোলমাল হয় তিনি জানতেন। ওজনে বেশী হয়ে যায়। সুতোর জোর কমে যায় বলে চট বোনবার সময় থেকে-থেকে সুতো ছিঁড়ে যায়। তাঁতীরা তখন রাগ করে চেঁচামেচি শুরু করতে থাকে। ঘণ্টায় যত গজ কাপড় বোনবার কথা তার থেকে কম বোনা হয়—তাদের আয়ও সেই অনুপাতে কমে যায়।

বিভূতিবাবু বললেন—এ তো দেখছি ভিজে পাট। জল ঢেলেছেন নাকি ?

দালাল ততক্ষণে বিভূতিবাবুর বিদ্যের দৌড় আঁচ করে ফেলেছে। সে বললে—জল ঢালবো কেন বাবু ? কাঁচা গাঁটের পাট তো ভিজে হবেই খানিকটা। কিন্তু এমনিতে শুকনো। দেখুন না হাত দিয়ে—হাতে জল লাগবে না।

বিভূতিবাবু হাত দিয়ে দেখলেন সত্যি ভিজে তো ঠেকছে না একটুও। অথচ তাঁর সন্দেহ গেল না। ভিজে ভিজে গন্ধ, ভিজে ভিজে রং—কোথায় যেন পাটের স্তরে স্তরে জল লুকিয়ে আছে।

ফিরে এসে সায়েবকে সেলাম করে বিভূতিবাবু বললেন—পাট দেখে এলুম সায়েব।

—কেমন দেখলে ? কত পাট ?

—হাজার পাঁচেক মণ হবে।

—পাট চেন ?

—পাট চিনি বললে মিথ্যে কথা বলা হবে সায়েব। তবে একটু বলতে পারি যে পাট ভিজে।

—কেমন করে বুঝলে ?

হলপ্ করে বলতে পারব না সায়েব। দালাল আমায় ছুঁয়ে দেখতে বললে, ছুঁয়ে দেখতে বললে, ছুঁয়েও কিছু ধরতে পারিনি। তবে খানিকটা গন্ধে খানিকটা আন্দাজ মনে হল যেন পাট ভিজে।

—এই তো বেশ শিক্ষা হচ্ছে। এইরকম করলে কিছুদিনের মধ্যে তুমিও এক্সপার্ট হয়ে উঠবে। শোনো বিভূতি। আমাদের মিল-এ এখন কাঁচা গাঁটের পাটের প্রয়োজন। আমার কাছে দালালেরা যাওয়া-আসা করছে। তুমি একটু এদিকে আমায় সাহায্য কর। কাল একবার শেওড়াফুলির পাটের বাজারে যাও। আরও এদিকে-ওদিকে দালালরা যা খবর দিয়েছে একবার নিজের চোখে দেখে এসো।

বিভূতিবাবুর ট্রেনিং শুরু হল। পাট চেনার ট্রেনিং নয়, কত পাটে কত জল, কত মেশ্তা কত ছাঁট এটুকু বুঝতে আর কত সময় লাগে ? আসল ট্রেনিং হচ্ছে বাজার চেনা। কোন বাজারে কত পাট কোন সময় আসে। কারা চালান দেয়, কে কে বড় বড় দালাল, কার সঙ্গে কার রেষারেষি, কার সঙ্গে কার গলাগলি। কে কার এজেন্ট হয়ে কাজ করে। মোটামুটি কে কত দরে কোথা থেকে কেনে এবং কতবার হাত বদল হয়ে মাঠের পাট চাষীর হাত থেকে অবশেষে চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, হুগলীর বাজারগুলোতে গরুরগাড়ি বোঝাই হয়ে এসে পৌছয়—এমনি অতি-প্রয়োজনীয় বাজারের খুঁটিনাটি খবর।

বিভূতিবাবুর এদিকে মাথা ছিল, আগ্রহ ছিল। পাটের দালাল, আড়তদার এবং জমাদার দারোয়ানদের সঙ্গে তিনি বনিয়ে চলতে পারতেন। এই গুণে তিনি নিজেকে অতি দ্রুত সুশিক্ষিত করে তুললেন।

তারপর আর একদিন আর এক বিশেষ কাজে হ্যারিচ সায়েব বিভূতিবাবুকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন।

—শোনো বিভূতি।

—ইয়েস্ সার্।

—কাঁচা গাঁটের পাট যা বেশীর ভাগ খাল দিয়ে আসত তা আর আসবে না। খালের জল শুকিয়ে গেছে। সামনের পাঁচ-ছ-মাস লাখ লাখ মণ পাট এসে জমবে ঐ শেওড়াফুলি আর বারাসতের বাজারে। ঐ সব বাজার থেকে লরি করে আনতে হবে মাল।

—ইয়েস্ সার।

—ইয়েস্ সার মানে? লরির ব্যবস্থা আমায় এখনি করতে হবে—বাজারের আড়তদার তো এখানে মাল পৌঁছে দেবে না।

—ইয়েস্ সার।

—থামো বিভূতি। গর্দভের মতো ইয়েস্ সার, ইয়েস্ সার কোরোনা। আমাকে এখন লরির কনট্রাক্ট ঠিক করতে হবে। এক-শ থেকে সওয়া-শ লরি রোজ খাটবে—বড় সহজ কথা নয়। তোমার কথা ভাবছিলুম এই জন্যে যে তুমি তো বাজার-টাজার বেশ চিনেছ—তুমি কিছু লরির কনট্রাক্ট নিলে তোমার কিছু রোজগার হতে পারে।

বিভূতিবাবু গলে পড়লেন।

সায়েব বলে চললেন—আমি অবশ্য বাজারে যারা লরি সরবরাহ করে তাদেরও জানাবো। তারা কাজ নিতে চাইলে তাদের কাছ থেকে টেণ্ডার চাইবো। সুতরাং তুমি কি দরে লরি খাটতে দেবে সেটাও যাচাই হয়ে যাবে।

বিভূতিবাবুর নিজের উপর অগাধ বিশ্বাস জন্মে গিয়েছে। বিশেষ

করে সায়েবের কাছ থেকে বার বার এমন পৃষ্ঠপোষণ পাবার পর থেকে।

বিভূতিবাবু সায়েবকে ভরসা দিয়ে গেলেন—চারদিনের মধ্যে তিনি জানাতে পারবেন কত দরে তাঁর পক্ষে কত লরি সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

বিভূতিবাবু চার দিন আপিস থেকে ছুটি নিলেন। এই চারদিনে সায়েব লরির কনট্রাক্টারদের কাছ থেকে টেণ্ডার পেয়ে গেলেন। পাঁচদিনের দিন বিভূতিবাবু এসে সায়েবের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বললেন।

কি কথাবার্তা হল সবটা জানা যায় নি। কিন্তু তার কয়েকদিন পরেই জানা গেল যে লরি সরবরাহের বেশ মোটা একটা অংশ বিভূতিবাবুর ভাগে পড়েছে। আরো শোনা গেল বিভূতিবাবুর 'রেট'ই যে সব চেয়ে কম ছিল তা নয়, কিন্তু অন্যান্য সরবরাহকারীদের রেট কম হলেও তারা যে সময়-মতো এবং মিল-এর সুবিধামত লরি নিয়ে সব সময় আসতে পারবে তার স্থিরতা নেই। কাজেই বিভূতিবাবুর টেণ্ডার গৃহীত হল। বিভূতিবাবুর রেট হল লরি-পিছু প্রতি ট্রিপ্-এ সাড়ে সাতাশ টাকা। অন্যান্য সরবরাহকারীদের কারো পঁচিশ কারো সাড়ে পঁচিশ। লরি ভাড়ার খরচ পড়তো বিভূতিবাবুর প্রতি ট্রিপ্-এ চৌদ্দ থেকে পনের টাকা। মাল বোঝাই মাল খালাসের খরচ মিল দিত। তবে বিভূতিবাবুর আরো কিছু নিজস্ব খরচ ছিল—যেমন দৌড়োদৌড়ি করবার জন্যে দু-একজন বিশ্বস্ত লোক মাইনে করে রাখতে হয়েছিল। বাকিটা সমস্তই লাভ।

দাদার লরির সঙ্গে বিভূতিবাবুর সংযোগ এই সূত্রেই। দাদাদের নতুন ব্যবসায়ে ঢুকেই এইরকম একজন বাঁধা খদ্দের পেয়ে যাওয়ায় পরম লাভ হয়েছিল। সুবিধে ছিল দিনের মধ্যে তিন-চারবার লরি খাটত এবং ভাড়ার টাকা বিভূতিবাবু কোনদিন ফেলে রাখতেন না।

বিভূতিবাবুর লরি কেন যে মিল্কা লরি নামে পরিচিত সে রহস্যও

এইসব শুনে পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে। বিভূতিবাবু যখন মিল্‌-এরই রেশনিং বিভাগের চাকুরে এবং হারিচ সায়েবের প্রিয়পাত্র তখন তাঁর লরি মিল্‌-কা লরি না তো কি? তা ছাড়া ও লরিকে মিলের ফটকে আটকালে অথবা পাট-গুদমে মাল খালাস করতে দেরি করলে ফিরে গিয়ে আবার নতুন মাল ভরেও লরি আসবে কি করে? এই কারণেই তো অন্য লরি যেখানে সারাদিন একবারের বেশী ট্রিপ্‌ দিতে পারে না, অন্য লরি যেখানে মিল-এর মধ্যে ঢুকেও মাল খালাস করতে পারে না, হয়তো আটকাই পড়ে যায় সারা রাতের জন্যে, মিল্‌কা লরি সেখানে তিনবার-চারবার ঘুরে আসতে পারে। আশিখানা লরির সঙ্গে বন্দোবস্ত করা কি চাট্টিখানি কথা? পঁচিশখানা লরি দিয়ে তাই বিভূতিবাবুকে আশিটার কাজ চালাতে হয়।

হারিচ সায়েবের মুখটা বেশ খুশী খুশী লাগে। বিভূতিবাবু ঘন ঘন তাঁর আপিসঘরে এমন কি তাঁর কুঠিতেও আজকাল যাতায়াত করেন। হারিচের মেম-সায়েবও বিভূতিবাবুকে চিনে গেছেন—বিবুটি বিবুটি বলে ডাকেন। যারা কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, দেখো এইবার বিভূতির পদোন্নতি হবে, গায়ে কোটপ্যাণ্ট উঠবে, বিভূতিকে আর চেনা যাবে না, তাদের অবশ্য হতাশ হতে হয়।

মাসের পর মাস যায়, বিভূতিবাবু রেশনিং বিভাগের সত্তর টাকা মাইনের যে বাবু সেই বাবুই থাকেন। আদ্দির পাঞ্জাবি পরা তাঁর চিরকেলে অভ্যেস—সেই পাঞ্জাবি আর ধুতিই থাকে টিকে। কোন বদল হয় না। কোনো নতুনত্ব দেখা যায় না তাঁর পোশাকে, আশাকে, আচরণে, ব্যবহারে। নিয়মিত ঘড়ি ধরে তিনি হাজিরা দেন। সবার সঙ্গে হাসিমুখে বিনীতভাবে কথা কন—আপিসের সহকর্মী, দরোয়ান, চটকলের মজুর, সবাই তাঁর কাছে সমান। যেমন বরাবর ছিল।

কারখানার সকলেই কিন্তু জানে জলের স্রোতের মত যে লরিগুলো

সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি কারখানার মধ্যে পাট বোঝাই হয়ে ঢুকছে তার মধ্যে আশিখানা বিভূতিবাবুর। জলের স্রোতের মত যেমন লরিও ঢুকছে মিলে, জলের স্রোতের মত তেমনি টাকাও ঢুকছে বিভূতিবাবুর কোন এক অদৃশ্য পকেটে।

যে লোকটি কারখানার বাইরে ল্যাম্পপোষ্টের ধারে দাঁড়িয়ে বিভূতিবাবুর লরিগুলি সনাক্ত করত সে একবার অন্য এক লরি-ওয়ালার কাছে কিছু টাকা পাবার লোভে তাদের একটা লরিকে মিলের ফটকে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। বেচারা জানত না মিলের ভিতরে বিভূতিবাবু পাট গুদমের কাছেও আর একটা 'চেকিং' রেখেছিলেন! জানবার কথাও নয়, কারণ মিলের মধ্যে সে কোনোদিন ঢুকতেও পায়নি। বিভূতিবাবু অতি সহজেই ধরে ফেললেন যে বাইরের একখানা লরি দু-বার মাল নিয়ে মিল-এ ঢুকেছে। অমার্জনীয় অপরাধ। চারিদিকের আট-ঘাট এমনিভাবেই বাঁধা ছিল যাতে করে বাইরের কোনো লরি একবারের বেশী মাল নিয়ে দুবার ঢোকার কোনো সুযোগই পাবে না।

সেই হতভাগ্য লোকটিকে বিভূতিবাবু এমন নিঃশব্দে জগদ্দলের সেই ল্যাম্পপোষ্টের তলা থেকে সরিয়ে দিলেন এবং আমাকে সেখানে বহাল করলেন যে কারুর চোখেই পড়ল না। কারুর মনেই হল না যে একটা নতুন কিছু ঘটেছে। সে লোকটিকে কেউ কোনদিন আর জগদ্দলে দেখেনি। আমাকেও এমনভাবে সেই ল্যাম্পপোষ্টের গায়ে লেপটে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল যে মনে হতে থাকল সৃষ্টির আদিকাল থেকে আমি ঐখানে ঠিক অমনিভাবে একটা ময়লা নোট বই হাতে দাঁড়িয়ে আছি।

বিভূতিবাবুর সব কাজই এমনি। কাজ যত গুরুত্বপূর্ণ হোক না, বাইরে থেকে কিছু বোঝবার যো নেই। তাই বিভূতিবাবুর ভাণ্ডারে যখন রাশি রাশি টাকা এসে জমা হতে লাগল—অন্য যে-কোনো লোক হলে তার পোশাকে আশাকে তো বটেই, কথাবার্তা হাবভাব

চালচলনে পর্যন্ত নতুন টাকা আমদানির সুর ধরা পড়ত। বিভূতিবাবুর কিন্তু কিছুই হল না।

সমস্ত লাভটা বিভূতিবাবুর পকেটে আসছিল বলে কেউ বিশ্বাস করেনি। আরো অনেক অদৃশ্য হাত ছিল এবং যিনি এই সমস্ত উদ্যোগের প্রধান কর্তা হারিচ সায়েব—তিনিই বা এই অদৃশ্য মিছিলের অগ্রণী হয়ে থাকবেন না কেন? তা হলেও বিভূতিবাবুর লাভের কড়ির হিসেব খুব কম করে ধরেও লোকে বলত লরি-কন্ট্রাক্টের পাঁচ মাসে অন্তত ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকায় দাঁড়াবার কথা। বিভূতিবাবু যে-রকম ঘরের মানুষ তাতে করে এই টাকার অঙ্কটায় তাঁর টলে যাবার কথা। কিন্তু তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত, উৎক্ষিপ্ত বা রোমাঞ্চিত হননি।

হারিচ সায়েব বুঝলেন, তাঁর অনুচরদের মধ্যে এক নিরেট প্রস্তর তিনি পেয়েছেন —সলিড রক্!

বিভূতিবাবু আমার কাজে খুশী হয়েছিলেন। লরি সনাক্তর কাজে ছেলেমানুষ আমাকে নিযুক্ত করার আসল কারণই ছিল, তিনি জানতেন আমার বয়সের গুণে তাঁকে আমি ঠকাতে পারব না। লোক-ঠকাবার মত বয়সই আমার তখনও হয়নি। খুব বেশী দিন আমাকে ল্যাম্পপোষ্টের গায়ে দাঁড়াতে হয়নি। আস্তে আস্তে কারখানার দরোয়ান বিভূতিবাবুর পঁচিশ ত্রিশখানা লরি আর তার ড্রাইভারদের চিনে ফেললে। আমি তখন গিয়ে রেশনিং বিভাগে বসলুম এবং খাতা লেখার কাজ শেখায় মন দিলুম। মাঝে মাঝে হঠাৎ যদি দু-একখানা লরি কোন কারণে ছাঁটাই হয়ে নতুন লরি আমদানি হত তখন একবার বাইরে গিয়ে আমায় লরি চিনিয়ে দিয়ে আসতে হোত।

চটকলে এসেছিলুম নতুন, ক্রমে পুরোনো হলুম। শীত, বসন্ত গ্রীষ্ম গিয়ে নতুন বর্ষা নামল। খালে জল এসে পড়ায় ডাঙ্গার পথে কারখানায় পাট আনা বন্ধ হয়ে গেল। বিভূতিবাবু এসে বসতে লাগলেন রেশনিং আপিসে। তাঁর ঘোরাঘুরি বন্ধ হল। পান খাওয়া একটু

কমল। তারপর পুজোর সময় বিভূতিবাবুর গায়ে নতুন চুনোট-করা আদ্দির পাঞ্জাবি, পরনে কাঁচি ধুতি দেখা গেল প্রতি বছরেই যেমন দেখা যায়। শেষে বছর ঘুরতে খরার সময়ে যখন খালের জল শুকোতে আরম্ভ হল, বড় বড় নৌকোর তলা আটকে যেতে লাগল পাঁকে তখন আবার বিভূতিবাবুর ডাক পড়ল হারিচ সায়েবের ঘরে। আবার সেই পুরোনো প্রশ্ন—লরির কন্ট্রাক্ট।

বাংলা দেশে যে আড়াই কোটি মণ পাট জন্মায় তার প্রায় সবটাই নদী নালা খাল বিলের পথে কলকাতায় এসে পৌছয়। পাট গাছ কেটে ডোবার জলে পচিয়ে পাটের আঁশ ছাড়িয়ে যখন চাষীরা কাঁচা কাঁচা গাঁট বেঁধে ফেলে ঠিক তখনই বাংলার জলপথ জলে ভরপুর। নৌকো বোঝাই হয়ে, গাধা-বোটে বোঝাই হয়ে, জলে জলে সেই পাট চটকলের আর চট-'প্রেস'-এর ঘাটে ঘাটে পৌছয়। এই হচ্ছে চটশিল্পের সব চেয়ে বড় বাহাদুরি। ভারি ভারি মাল বহনের কাজ এইতে সস্তায় সারা হয়। এ না হলে, যদি রেলের পথে, ডাঙ্গার পথে এই আড়াই কোটি মণ পাট চটকলে আনতে হত তাহলে আজ পৃথিবীর বাজারে এত সস্তা দরে চটের থলি চটের কাপড় বিকোতো না—চটের বাজারও এত বিস্তৃত, এত লাভবান, এত লোভনীয় হতে পারত না। কিন্তু এই আড়াই কোটি মণ পাটের বিরাট বোঝা বইতে বইতেও অনেক পাট থেকে যায় যা নৌকোয় ওঠে না। বর্ষার জলের ঢল যেমন আসে তেমনি চলেও যায়। ক্ষেতের ফসল সব জায়গায় ঠিক সময় কাটাও হয়ত হয় না। তা ছাড়া ভরা-নদী থেকে দূরেও কিছু গ্রাম থাকে সেখানকার চাষীরা যেবার পাট চাষ করে, তাদের পাট নৌকোয় করে চালান দেওয়া যায় না। এমনি করে একটা ছিটে-ফোঁটা অংশ থেকে যায় প্রতি বছরই—যাকে হয়ত খানিকটা জলপথে আর বাকিটা স্থল পথে আনতে হয় কলকাতার বাজারে। আড়াই কোটি মণের এই ছিটে-ফোঁটা কিন্তু বড় কম নয়। এই ছিটে-ফোঁটার একটুখানি ফোঁটা প্রতি বছর এসে জমে খরার সময়ে বারাসত, শেওড়াফুলি, হুগলী আর

অন্যান্য পাটের বাজারে। তারই কিছু অংশ লরি মারফত বয়ে আনার তোড়জোড় আমাদের মিলকে করতে হয় খরার সময়। এই হল বিভূতিবাবুর মরসুম।

বলা বাহুল্য বিভূতিবাবুর প্রচুর অভিজ্ঞতা জন্মেছে ইতিমধ্যেই। আবার নতুন করে লরির কণ্ট্রাক্ট পেতে তাঁর কোনই কষ্ট হল না। আমার চোখের সামনে কয়েক বছরের মধ্যে বিভূতিবাবু বেশ কয়েক লক্ষ টাকার মালিক হয়ে পড়লেন।

॥ চার ॥

এই ক-বছরে বিভূতিব্যবু একটুও বদলান নি। যেমন মাটির মানুষ ছিলেন তেমনিই আছেন। লক্ষপতি বলে চেনাই যায় না। কারুর সঙ্গে, বিশেষ করে চটকলের কারুর সঙ্গে এক-ফোঁটা দুর্ব্যবহার করেন নি। অতি বিনীত ব্যবহার করেছেন। বরং হাতে কিছু ক্ষমতা থাকায় একে ওকে চাকরিও করে দিয়েছেন। চাকরি দেবার সুযোগ যখনই এসেছে তখনই তিনি 'ওয়ার্কস্' কমিটির' সভ্যদের সঙ্গে দেখা করে বলেছেন হাতে একটা কাজ আছে, তাদের কোনো লোক থাকে তো দিতে। নিজের আশ্রিত পালিত বা আত্মীয়-স্থানীয় বেকারদের দাবি এ ক্ষেত্রে তিনি মানেন নি। তার কারণও অবশ্য ছিল। বিভূতিবাবু মনে-মনে বুঝেছিলেন, তাঁর এই অভাবিত এবং আকস্মিক সৌভাগ্যসঞ্চারে অনেকেরই চোখ টাটাবে, অনেকেই তাঁকে ঘৃণা করবে, হিংসা করবে। এবং বিভূতিবাবু যদি হাত গুটিয়ে বসে থাকেন, কিছু সহানুভূতি, কিছু সম্প্রীতি, কিছু কৃতজ্ঞতা সঞ্চয় না করে নেন, তাহলে অনেক থেকে আরো অনেকে শেষে সকলেই তাঁকে অপ্রীতির চোখে দেখতে আরম্ভ করবে। এটা তাঁর একেবারেই পছন্দ নয়—একটা কিছু করা দরকার। এই জন্যেই তিনি

ওয়ার্কস্ কমিটির লোকদের খুঁজে বার করতেন। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন, তাদের বেঁধে ফেলতেন অনুগ্রহের বাঁধনে। কর্মীদের প্রতিনিধি নিয়ে এই ওয়ার্ক্স্ কমিটি। কোনো কোনো জাঁদরেল প্রতিনিধির পিছনে আছে দলে দলে মজুর আর চটকলের বাবুরা। এই সব প্রতিনিধিদের কিছু কিছু আত্মীয় বিভূতিবাবুর কৃপায় চাকরি পেয়ে গেল।

বিভূতিবাবুর কাছ থেকে কৃপা পেতে কারুর কোনো আপত্তি ছিল না, তা সে বিভাগীয় বাবু-ই হোন বা মজুরই হোন অথবা বিবেক সম্পন্ন কোনো প্রতিনিধিই হোন। বিভূতিবাবু চটকলের ম্যানেজার নন, তিনি রেশনিং বিভাগের সামান্য কেরানী, সকলের কাছেই তিনি যেতেন বন্ধুভাবে। বন্ধুর মতো সকলের উপকার করতেন।

এইভাবে যখন বিভূতিবাবু এক দিকে পরোপকার অপর দিকে প্রভূত অর্থোপার্জন করে চলেছেন সেই সময় হঠাৎ মিল্-এর ম্যানেজার বদলি হলেন। পুরোনো ম্যানেজার বুড়ো হয়েছিলেন— তিনি দেশে চলে গেলেন। তাঁর জায়গায় এলেন নতুন ম্যানেজার।

পুরোনো ম্যানেজার খানিকটা বয়সের জন্যে এবং বেশীটাই চটকলের অভিজ্ঞতার জন্যে নিজের প্রত্যক্ষ কাজগুলি ছাড়া অন্য দিকে বিশেষ মন দিতেন না। তাঁর নিম্নতন সায়েব কর্মচারীরা কে কেমন ভাবে তাদের বিভাগে কাজ করে যাচ্ছে সেদিকে নজর দেওয়া আবশ্যক মনে করতেন না। চটকল পুরোদমে চলেছে। মাইলের পর মাইল চট বোনা হচ্ছে, অভাবিত লাভ হচ্ছে, দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন আপনিই হয়ে যাচ্ছে, কাজেই ম্যানেজারের আর করবার রইল কি? খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দিকে যে মন দিতে হবে এর কোনো প্রয়োজনই ছিল না তাঁর।

নতুন ম্যানেজার এসে প্রথম থেকেই এটা ওটা দেখতে শুরু করলেন। মিল চালানোর চরম দায়িত্ব তাঁর। কারখানার ভালো-

মন্দর জন্যে শেষ অবধি তাঁকেই জবাবদিহি করতে হবে। কাজেই তিনি সব কিছু বুঝে শুনে দেখে নিতে চান। এখানে ওখানে দু'চারটে গলদ ধরে ফেললেন। তার সংশোধনের ব্যবস্থাও হল। তারপর হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করে ফেললেন কারখানায় পাট আনার লরির কন্ট্রাক্ট মিল-এরই একজন সামান্য কেরানীর হাতে। ভারি আশ্চর্য লাগল। মনে নানারকম সন্দেহও হল। মোটের উপর জিনিসটা একেবারেই মনঃপুত হল না।

হারিচ্ সায়েবকে ডেকে ম্যানেজার জিজ্ঞেস করলেন—এমনটা হল কি করে? এত টাকার কারবারের মধ্যে এতটুকু একজন কেরানী আসে কেমন করে?

হারিচ্ সায়েব কাগজপত্র খুলে দেখিয়ে দিলেন পাঁচ জায়গা থেকে রীতিমত টেণ্ডার নেওয়া হয়েছে। বিভূতিবাবুর টেণ্ডার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। মিল-এর হেড-আপিস কলকাতা—সেখানকার বড়সায়েবরা বিচার করেছেন, সুতরাং এর উপর আর কথা কি?

ম্যানেজার বুঝলেন কাগজে কলমে জিনিসটাকে বেশ পাকা করে গাঁথা হয়েছে। একে ওল্টানো সহজ নয়। তা হলেও কারখানার সুস্থ আবহাওয়ার দিক থেকে জিনিসটা একেবারেই গ্রহণীয় নয়। তিনি ভাবতে শুরু করলেন।

লরি করে পাট আনার মরসুম সে বছর প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বর্ষার আরম্ভের আর দেরি নেই। ম্যানেজার কিছুদিন চুপচাপ রইলেন। বিভূতিবাবুর কাজকর্ম গোপনে লক্ষ্য রেখে চললেন। তারপর যেদিন বিভূতিবাবুর শেষ লরি কারখানার প্রাঙ্গন থেকে পাট খালাস করে দিয়ে বেরিয়ে গেল, তার পরদিন সকালে জানা গেল বিভূতিবাবুর নামে ম্যানেজার চার্জ শীট করেছেন।

রেশনের বাঁটোয়ারিবাবু বিভূতিবাবু। তাঁর খাতাপত্রের হিসেবের মধ্যে বহু গলদ পাওয়া গেছে। ম্যানেজার সন্দেহ করছেন, রেশনের

মাল সরিয়ে ফেলা হচ্ছে, যার কোনো হিসেব নেই। সুতরাং বিভূতিবাবু এইবার সব কিছু বুঝিয়ে দিন। ব্যাখ্যা করুন। গলদ বলে যাকে সন্দেহ করা হচ্ছে তা যদি গলদ নয় বলে বিভূতিবাবু দেখাতে পারেন তাহলে চুকলো। আর যদি না পারেন, তাহলে? সবাই বললে, তাহলে তার অবশ্যম্ভাবী ফল—বরখাস্ত।

আমিও জড়িয়ে পড়লুম এর মধ্যে। খাতাপত্র আমিই তো রাখতুম। প্রচুর গলদ ছিল তার মধ্যে জানতুম। বিভূতিবাবু কোনোদিন পরিষ্কার করে কিছু আমাকে বুঝিয়েও দেন নি, বলেনও নি। আমিও ধরে নিয়েছিলুম কারখানার গতিকই এই। এইভাবে চিরকাল চলে এসেছে, চিরকাল এইভাবেই চলবে। চটকলের লাভের কড়ির কি কিছু লেখা জোকা আছে? ছোট হোক, বড় হোক, ফিটফাট হোক, নোংরা ময়লা হোক নতুন হোক, পুরোনো হোক, চটের কল হলেই হল। চতুর্দিক থেকে বৃষ্টির জলের মতো টাকা এসে পড়বে। প্রধান এবং সবচেয়ে মোটা ভাগ পান মালিক, আর যা এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে থাকে সেই সব এঁটোকাঁটা মুড়ি মুড়কি কুড়িয়ে খেয়ে কত হা-ভাতে ফুলে ফেঁপে ওঠে। এর আবার হিসেব কি? আমি তাই বেশ নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় ছিলুম। তাই হঠাৎ এই চার্জশীটের উদয়ে কোথায় যেন একটা ব্যতিক্রম ঘটেছে বলে মনে হল। ভাগ্যিস আমার নামে কোনো প্রত্যক্ষ দোষারোপ ছিল না। তবে অনেকেই বললে—বিভূতিবাবুর যদি কিছু হয়, কোপ যদি লাগে, তাহলে আমিও একেবারে বাদ পড়ব না।

বিভূতিবাবু থম্‌থমে মুখ করে সারাদিন কারখানার মধ্যে ঘুরে বেড়ালেন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সায়েবের চার্জশীটের একটা উত্তর দেবার কথা ছিল, তার কিছুই করলেন না।

তার পরদিন ম্যানেজার যখন বললেন—বেশ জবাবই যখন পাওয়া গেল না, এইবার তিনি বিভূতিবাবু সম্বন্ধে একটা চূড়ান্ত ব্যবস্থা করবেন, তখন এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটল। আধ ঘণ্টার মধ্যে দেখা

গেল ম্যানেজারের উক্তির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানিয়ে সমস্ত মিল স্ট্রাইক করে বসে আছে। তাঁতী তাঁত ছেড়ে দিয়েছে, স্পিনার তার ফ্রেম ছেড়ে দিয়েছে, কুলি-রমণীরা ছুঁচ সুতো গুটিয়ে বসে আছে।

ম্যানেজার এর জন্যে একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি মহা চিন্তিত হয়ে তাঁর সহকর্মীদের এবং লেবার অফিসারকে নিয়ে বসলেন। বহু পরামর্শের পর ঠিক হল ব্যাপারটাকে বেশী দূর গড়াতে দেওয়া হবে না—মিটিয়ে ফেলা দরকার।

হারিচ্ সায়েব উপদেশ দিলেন—বিভূতিবাবুকে রেশনিং বিভাগ থেকে সরিয়ে 'প্রভিডেন্ট ফাণ্ড' বিভাগে বদলি করা হোক—যেখানে চুরির কোনো সুযোগই নেই। এতে ম্যানেজারের মান রক্ষা হবে, বিভূতিবাবুরও বোধহয় আপত্তি হবে না।

হারিচ্ সায়েবকে দৌত্যকর্মে নিযুক্ত করা হল। হারিচ্ সায়েব প্রথমে বিভূতিবাবুর সঙ্গে এবং পরে কারখানার মজুরদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথাবার্তা কইলেন। বিভূতিবাবুকে স্পষ্টই বললেন—তোমার লরির কনট্রাক্ট যাতে বজায় থাকে তার ব্যবস্থা আমি করব। বাকিটাতে তোমার কি এসে যায়? এ-বিভাগেই থাকো ও-বিভাগেই থাকো, তোমার পক্ষে একই কথা।

বিভূতিবাবুর বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না। লরির কনট্রাক্টই তাঁর আসল। রেশনিং বিভাগ থেকে তাঁর কি-ই বা হয়? যেটুকু হয়, সেটুকু খেয়ে যায় হারিচ্ সায়েবের দরোয়ান, বাবুর্চি, বেহারা মালীদের চাহিদা মেটাতে। ও ঝঞ্ঝাট যাওয়াই ভাল।

স্ট্রাইক মিটে গেল। বিভূতিবাবু প্রভিডেন্ট ফাণ্ড বিভাগে বদলি হলেন, সেই সঙ্গে আমিও।

বিভূতিবাবুর সঙ্গে কিন্তু আমার আর বেশীদিন কাজ করা হল না। বিভূতিবাবু নিজেই বললেন আমায় কথাটা। একদিন দুপুরে নিজের চেয়ারের পাশের টুলটা ঠেলে এগিয়ে দিয়ে বললেন—বোসো।

বিভূতিবাবুর কাছে গিয়ে চিরদিন দাঁড়িয়েই থেকেছি। কোনোদিন বসিনি। তাই ইতস্ততঃ করছি দেখে আবার বললেন—বোসো হে, কথা আছে।

অগত্যা বসলুম। বিভূতিবাবু বললেন—আমাদের কারখানায় নতুন লেবার ডিপার্টমেণ্ট খুলেছে, দেখেছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ দেখেছি। এই তো গত বছর থেকে চালু হল।

—হ্যাঁ, দাস সায়েব বলে একজন লেবার অফিসার এসেছেন। লোকটি ভাল। আমাদের উপেনকে বড়বাবু করা হয়েছে। প্রমথও আছে—বোধ হয় ছোটবাবু। আর দু-একজন নতুন ছোকরাকে নেওয়া হয়েছে। আমি বলি কি, তুমি ঐ ডিপার্টমেণ্টে ঢুকে পড়।

আমি আকাশ থেকে পড়লুম। বললুম—আজ্ঞে, আপনি কি কোনো কারণে আমার উপর রাগ করেছেন?

বিভূতিবাবু বললেন—তুমি দেখছি এখনও নেহাত ছেলেমানুষ আছ। তোমার উপর রাগ করবার আমার সুযোগ কোথায়? তোমার উপকার হবে বলেই ভাবছিলুম কথাটা। আমাদের এই সব ডিপার্টে উপর দিকে ওঠবার আশা ভরসা কিছু নেই, বুঝেছ? শুনলুম তুমি প্রাইভেটে বি-এ পাশ করবার চেষ্টা করছ। এ বছর পারো নি কিন্তু করবে তো একদিন? তোমার চেষ্টা আছে। লেবার ডিপার্টটা নতুন—ঐ দিকেই তোমার বরং উন্নতির আশা বেশী। আমাদের কোম্পানীর সব মিল্-এই একটা করে লেবার আপিস খুলছে। সব জুটমিলেই খুলবে। তোমার বয়েস রয়েছে—কেনোদিন যদি কারো চোখে পড়ে যাও পাশটা করা থাকলে চাই কি লেবার অফিসার পর্যন্ত হয়ে যেতে পারো।

এমনভাবে সোনার সিংহাসনে বিভূতিবাবু আমায় কোনোদিন বসান নি। মনে মনে খুশী হলুম। তবু ভয় গেল না। বললুম—এত বছর আপনার আনডারে কাজ করলুম, এখন আবার—

বিভূতিবাবু বাধা দিয়ে বললেন—আমাদের দিন হয়ে গেছে ভায়া। দেখলে তো নতুন ম্যানেজার এসে কী নাস্তানাবুদই করল। তা ছাড়া বয়েসও তো হয়েছে। তারপর একটু থেমে বললেন—আর জুট-মিলে কাজ করারই বা আমার কি দরকার?

আমি কোনো জবাব দিলুম না।

বিভূতিবাবু বললেন—তবে বলি?

পরদিন তিনি বললেন—সামনের মাস থেকে তুমি লেবার ডিপার্ট-এ গিয়ে বসবে। মাইনে বাড়ল পাঁচ টাকা। আশীর্বাদ করি তোমার উত্তরোত্তর পদোন্নতি হোক।

লেবার দপ্তরটা ঘুরে একবার দেখে এলুম। নতুন টেবিল চেয়ার আলমারি পড়েছে। শুনলুম আমার জন্যে আলাদা কোনো টেবিলের ব্যবস্থা হবে না। সুজিত বলে যে ছেলেটি তার ছোট টেবিলটা সরিয়ে তাকে একটা বড় টেবিল দিয়ে তারই এক পাশে আমার জায়গা হবে। সুজিতের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। আমার চেয়ে কয়েক বছরের বড় সুজিত। আইন পড়ছিল। চাকরিটা পেয়ে পড়াশুনা ছেড়ে চলে এসেছে পাটকল-এ। উপেনবাবুও পুরোনো লোক—তাঁকে আগেই চিনতুম। দাস সায়েব ঘরের এক প্রান্তে ফ্রেমে আঁটা ঘসা কাঁচের দরজার আড়ালে তাঁর নিজের কুঠরীতে বসেছিলেন তাঁর স্টেনো-টাইপিস্ট-এর সঙ্গে। তাঁদের দেখতে পেলুম না। আর ছিলেন প্রমথবাবু। উপেনবাবুর চেয়ে বয়সে অনেক বড় হলেও তিনি ছিলেন ছোটবাবু। প্রমথবাবুর সঙ্গে পরিচয় হতে এক মিনিটও লাগল না। ভারি গপ্পে লোক। বয়েসের তারতম্য মানেন না। সবার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা। জমিয়ে ফেলেন দেখতে দেখতে। বললেন—এসো ভায়া তাড়াতাড়ি। তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে তুমি জীবনের রসকস বোঝো। কথা কয়ে আরাম পাবো। এই উপেন আর সুজিত দুটোই একেবারে হোপ্‌লেস্। প্রথম আলাপে প্রমথবাবুর উচ্ছ্বাসের প্রাচুর্যে খানিকটা পুলকিত

খানিকটা শিহরিত হয়ে উঠলুম আমি। পরে বুঝেছিলুম, সত্যি প্রমথবাবুর মত লোক হয় না।

॥ পাঁচ ॥

সেদিন এক মনে বসে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের খাতা লিখছি, হঠাৎ ঝড়ের মতো লেবারদপ্তরের উপেনবাবু ঘরে ঢুকে বললেন—ও হে সুকুমার, আমাকে পঞ্চাশটা টাকা ধার দিতে হবে। কালই চাই।

আমি বেশ খানিকটা অবাক হয়ে গেলুম। বললুম—আমার কাছে চাইছেন? কালই চাইছেন?

উপেনবাবু বললেন বিভূতির অ্যাসিস্টেন্টের কাছে চাইছি। এর চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি আর কে আছে? বলে এমন ভাবে হেসে উঠলেন যে আমি যেমন অবাক হলুম তেমনি রাগেও গা শিরশির করে উঠল। উপেনবাবুর কথার মধ্যে যে ইঙ্গিত সেটা এত সুস্পষ্ট বিভূতিবাবুর অ্যাসিস্টেন্টের পক্ষে এক লহমায় পঞ্চাশ টাকা বার করে দেওয়া যে কেন এত সহজ সেটা এমন নির্লজ্জভাবে উচ্চারিত যে রাগ হওয়া সত্ত্বেও আমি যেন এক ঝটকায় উল্টে পড়ে গেলুম। মুখে কথা জোগালো না। পায়ের তলায় মাটিটাই খুঁজে পেলুম না কথা কইব কি? বিভূতিবাবুর অ্যাসিস্টেন্ট—যত তার পদগৌরব তেমনি তার গ্লানি।

রাগ প্রকাশ করা হলই না, আমতা আমতা করে বললুম—পঞ্চাশ টাকা? এত টাকা আমার পক্ষে দেওয়া কি সম্ভব?

—হবে, হবে। কাল আসব আমি। বলে আমার পিঠ চাপড়ে উপেনবাবু চলে গেলেন।

আমি প্রমাদ গণলুম। উপেনবাবুকে চটানো—কারখানায় উপেনবাবুর বেশ দবদবা, লোকে তাঁকে ভয় করে, সমীহ করে চলে—

তাঁর মত লোককে চটানো? তাঁর কথাই বা বলি কেন—আমার মত নগণ্য কেরানীর পক্ষে আমার থেকে ঊর্ধ্বতন কাউকেই চটানো বাতুলতা। অথচ টাকা আমি কোথা থেকে যোগাড় করি? ধার করে হোক, চুরি করে হোক, টাকা আমায় যোগাড় করতেই হবে কারণ টাকা না দিতে পারলে উপেনবাবু ধরে নেবেন যে আমি ইচ্ছে করেই টাকাটা দিলুম না, আমার গুমোর হয়েছে। সুতরাং সে গুমোর তিনি ভাঙবেন।

সুজিতের শরণাপন্ন হলুম। উপেনবাবু যখন বাইরে, সেই সময় সুজিতদের আপিসে ঢুকে বললুম—সুজিত কি করা যায়?

সুজিত শুনে গালে হাত দিয়ে পড়ল। এত লোক থাকতে উপেনবাবু হঠাৎ আমাকে এমনভাবে আক্রমণ করে বসলেন কেন, কিছুতেই সে ভেবে উঠতে পারল না। আমি কি কোনো ক্ষতি করেছি তাঁর? কিছুই তো নয়। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কই বা কি? শুকনো মুখে আমরা ফিস্‌ফাস্‌ করছি শুনে প্রমথবাবু উঠে এলেন সুজিতের টেবিলের কাছে। তাঁর কানে দু-একটা কথাও হয়তো গিয়ে থাকতে পারে।

প্রমথবাবু বললেন—কিসের এত পরামর্শ? খুব চিন্তিত দেখছি?

আমি প্রথমটা উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলুম, কিন্তু প্রমথবাবু মনে হল খানিকটা যেন আঁচ করে ফেলেছেন। বললুম তখন। প্রমথবাবু শুনে শরীরটাকে টান করে সোজা হয়ে বললেন—ও? টাকা চেয়েছে শালা? তা ভাবছ কেন সুকুমার? চেয়েছে তো বিভূতির কাছ থেকে। তোমার মুখ দিয়ে বলাতে চায়। যে-কোনো কারণেই হোক, বিভূতি টাকাটা দিতে ভুলে গেছে। তোমায় দিয়ে মনে করিয়ে দিচ্ছে। তা মনে করিয়ে দিয়ো তুমি। তোমার আর কি?

আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না। বললুম—কিসের টাকা? বিভূতিবাবু কিসের টাকা দিতে ভুলে গেছেন?

প্রমথবাবু বললেন—একটা কিছুর টাকা নিশ্চয়ই। নিশ্চিত করে বলা শক্ত কিসের। তবে আন্দাজ করতে পারি। একটা ক্যাজুয়াল লেবারের ব্যাপার মনে হচ্ছে। একটা হিন্দুস্থানী লোককে আমাদের লেবার বিভাগ থেকে ক্যাজুয়াল খাটতে দেওয়া হয় মাঝে মাঝে। লোকটাকে বিভূতিই মাস চারেক আগে এনে দিয়েছিল। তার এক চেনা লরি-ড্রাইভারের গ্রামভাই না কি বলছিল যেন। বিভূতির লোক বলে উপেন তাকে প্রায়ই ক্যাজুয়াল কাজ দিয়ে এসেছে। তারপর হঠাৎ গত হপ্তার আগের হপ্তায় তার বদলির খাতায় নাম উঠেছে। বদলির খাতায় নাম ওঠানোয় যদিও উপেনের কোনো হাত নেই একমাত্র লেবার অফিসারই এটা করতে পারেন কিন্তু বড়বাবু হিসেবে সে সব ক্ষেত্রেই নতুন বদলিওয়ালার কাছ থেকে একটা প্রণামী আদায় করে। এবারের ব্যাপারটা একটু গোলমেলে। প্রথমত লোকটা যে বদলিওয়ালার পদে উন্নীত হবে, এ-কথা উপেন আগে থাকতে কিছুই জানতে পারেনি। দ্বিতীয়ত, লোকটা উপেনের পাওনা প্রণামীর কথা জেনেও একটা পয়সা উপুড়-হস্ত হয়নি। কিন্তু আমার গোড়া থেকেই সন্দেহ, বিভূতির এতে কোনো হাত ছিল—সে-ই দাস সায়েবকে বলে এটা করিয়েছে। যাই হোক, উপেন তার প্রাপ্য ছাড়বে কেন? উপেন লাগল সেই বেচারা হিন্দুস্থানী মজুরের পিছনে। কেবলই ঘুর ঘুর করে তার পিছু পিছু। বলে, বদলির খাতায় নাম উঠেছে, আমার পাওনা আমায় চুকিয়ে দে। লোকটা সরে সরে গা-ঢাকা দিয়ে বেড়ায়। বলে আমি গরীব মানুষ খেটে খাই, টাকা কোথায় পাবো? আর বদলির চাকরি বাবু এ হপ্তায় খাটবো তো সামনের হপ্তায় বসে থাকবো। এতে কি পেট চলে? উপেন বলে—আরে, বদলি বদলি করছিস, তোর চাকরি তো পাকা হয়ে গেল। আজ বদলি, কাল পারমেণ্ট। তোর বউ-এর গয়না, বাঁধা দে, দিয়ে এখন টাকা তোল। তারপর সময় হলে সোনা দিয়ে মুড়ে দিস বউ-এর গা। এ সবেও কিন্তু কিছু হয় না। লোকটা পিছলিয়ে

পিছলিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। এই চলেছে দেখছি কয়েক হপ্তা। উপেন শেষে তার ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়ল। তাকে বলল—দেখ হে, ভালমানুষের পো। আমার পাওনা মেরে দিয়ে কেউ কোনোদিন পালাতে পারেনি। তোমার বদলির চাকরি কি করে খেতে হবে সে আমার জানা আছে। তারপর যেটুকু ঘটেছে, সেটুকু সামান্য। লোকটা টাকা দেয়নি, বরং কি-একটা কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছে। কথাটা কি, তা কেউ জানে না। তবে এইবার বুঝতে পারছি।

আমি বললুম—কি বুঝতে পারছেন?

প্রমথবাবু বললেন—এতদিন চটকলে কাজ করলে এগুলোও ধরতে পারো না? চোরের উপর বাটপাড়ি—বুঝলে হে? চোরের উপর বাটপাড়ি। টাকাটা আদায় ঠিকই হয়েছে, তবে উপেনকে দিয়ে নয়—বিভূতিকে দিয়ে। লোকটা নিশ্চয় সেই কথাই গরম গরম ভাষায় শুনিয়ে দিয়েছে উপেনকে।

—কত টাকা? পঞ্চাশ টাকা? এত টাকা মজুররা দিতে পারে?

—হ্যাঁ, সেইখানেই একটু গোলমাল ঠেকছে। সাধারণত বদলি-ওয়ালারা পনের থেকে কুড়ি টাকা করে উপেনকে দেয়।

—এ-ব্যবস্থা উপেনবাবুর কতদিনের?

—উপেনবাবু আসবার অনেক আগে থেকেই এই ব্যবস্থা। বেশ আট ঘাট বাঁধা বন্দোবস্ত। আরো দু-চারজন পাওনাদার আছে নিশ্চয়, তবে উপেনই তাদের মুখপাত্র হয়ে টাকাটা নেয়।

—বিভূতিবাবু এর মধ্যে নেই?

—না, এ তো বিভাগীয় ব্যাপার কি না। অন্য বিভাগের লোক থাকবে কেন? আর সেই কারণেই তো হয়েছে মুশকিল। বিভূতি টাকা মেরে বসে আছে। উপেন তাই রেগে আগুন। এখন টাকাটা বিভূতির কাছ থেকে আদায়ের চেষ্টা চলেছে।

এ-এক বিচিত্র নাট্য। চটকলের রঙ্গমঞ্চের নাট্যলীলা। চোখের

সামনে অভিনীত হল এক দৃশ্যাংশ। এর পরের দৃশ্যে কি আছে কে জানে? এমনি হাসি-কান্না, সুখে-দুঃখে ভরা আরো কত নাটক, কত রঙ্গ দেখব, তাই বা কে জানে? আমি বললুম—আমি কি তবে বিভূতিবাবুকে গিয়ে বলব যে উপেনবাবু টাকা ধার চাইছেন?

প্রমথবাবু বললেন—নিশ্চয় বলবে। তা নইলে তুমি ছাড়া পাবে ভাবছ নাকি?

আমি বললুম—কিন্তু কি আশ্চর্য! চেনা লরি-ড্রাইভারের ভাই, গরীব মানুষ, তার উপকার করে দিচ্ছেন, এর মধ্যে আবার টাকা চাওয়া যায় নাকি?

—পাওনা যে। প্রাপ্য টাকা চাইতে চক্ষুলজ্জা কিসের? তুমি চাইবে না। কিন্তু আরো অনেকেই চাইবেন এই কারখানার মধ্যে। চোখ খুলে চলো হে ভায়া, অনেক কিছু দেখবে, অনেক কিছু শিখবে।

আমি সেইদিনই বিভূতিবাবুকে বললুম—উপেনবাবু এসেছিলেন আমার কাছে পঞ্চাশ টাকা ধার চাইতে। দেখুন দেখি, আমাকে এইভাবে বিব্রত করা। উপেনবাবু কি আর জানেন না আমার অবস্থা? তবু দেখুন তো! আমার এখন মুখ দেখাতেই লজ্জা করছে।

বিভূতিবাবু গম্ভীর মুখে শুনলেন আমার সমস্ত কথা। খানিকক্ষণ কি ভাবলেন। তারপর বললেন—কত টাকা চেয়েছে?

—পঞ্চাশ।

আবার খানিকক্ষণ চুপ। তারপর বললেন—আমি গোটা কুড়ি টাকা তোমার হাতে দিচ্ছি। বোলো এর বেশী তুমি যোগাড় করতে পারোনি। আমার মনে হয়, উপেন পীড়াপীড়ি করবে না।

এই বলে আমায় কুড়িটা টাকা বের করে দিলেন।

কাজ হল ওতেই। পরদিন টাকাটা উপেনবাবুর হাতে দিয়ে কাঁচুমাচু হয়ে সবে বলতে আরম্ভ করেছি—আজ্ঞে, এর বেশী—

কথা আর শেষ করতে হল না। উপেনবাবু বললেন—ওতেই হবে। ওতেই হবে। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি শোধ করে দেব। বলে, মনে হল খুশী হয়েই চলে গেলেন।

আমি বুঝলুম—উপেনবাবু তাঁর প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় পেয়ে গেলেন। শোধ করবার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না—ওটা শুধু মুখের কথা।

চোখের সামনেই দেখলুম, ক্যাজুয়াল মজুর বদলির পদে উন্নীত হলে তাকে কুড়িটি টাকা খসাতে হয়। এবার প্রশ্ন,বদলিওয়ালা যখন পারমানেন্ট হয়, তখনই বা তাকে কত দণ্ড দিতে হয়? প্রতি ধাপে ওঠার একটা মূল্য আছে তো? কত সেটা? খুব শক্ত হল না খবরটা সংগ্রহ করা। লেনদেন হয় যতদূর সম্ভব গোপনে, তাহলেও দেখলুম অনেকেই জানে। কানে কানে কথা ছড়িয়ে যায়। প্রত্যেকেই ছোট ছোট গণ্ডির মধ্যে আলোচনা করে কথাটা। আশি, নব্বই, এক-শ টাকার কমে কোনো বদলি আজ অবধি পারমানেন্ট হতে পারেনি, এ-ধারণা প্রায় সকলেরই।

সুজিত বললে—অনেকে খায় তো। তাই বোধ করি রেটটা একটু বেশী।

আমি হিসেব করে বললুম—সর্বনাশ সুজিত, পাট-কলে যে অন্তত দেড় লাখ পারমানেন্ট মজুর আছে। এদের প্রত্যেকের কাছ থেকে এক-শ টাকা নিলে যে দেড় কোটি টাকা হয়। এই এতগুলো টাকা কুলি-সর্দার আর এই উপেনবাবুর মত রক্তশোষকরা মজুরদের কাছ থেকে আদায় করে বসে আছে?

সুজিত বললে—তুমি নিশ্চিন্ত থাকো ভাই, ও-টাকাটা ওদেরই পকেটকে স্ফীত করেছে। ব্যাপারটাকে আর-এক দিক থেকেও দেখতে পারো। এই দেড় লাখ মজুরের একটা অংশ তো প্রতিনিয়তই ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। কেউ বুড়ো হয়ে পড়ছে, কেউ মারা যাচ্ছে, কেউ কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। এদের জায়গাগুলো

বদলি থেকে হচ্ছে পূরিত। খুব কম করে ধরলেও বছরে ধরাযাক শত-করা পাঁচ ভাগ নতুন স্থায়ী মজুর দরকার। কত হল? সাড়ে সাত হাজার? এই সাড়ে সাত হাজার বদলি কুলি প্রতি বছর সাড়ে সাত লাখ টাকা সর্দারদের আর নানা দপ্তরের বাবুদের এবং দপ্তরের বাবুদের মাধ্যমে সায়েবদের পকেটে গুঁজে তবে কাজে স্থায়ী হতে পারছে।

আমি বললুম—সাড়ে সাত লাখ টাকা দিয়ে অনেকগুলো মানুষকে যে বড়লোক করে দেওয়া যায় সুজিত।

সুজিত বললে—এবং তার প্রতিটি পয়সা গরীব বেচারাদের দেনা করে সংগ্রহ করতে হয়। নইলে কোথা থেকে হঠাৎ পাবে তারা এতগুলো টাকা? আর সেই দেনার যে সর্বনেশে সুদ শুধু সেই সুদই অনেক মজুর সারা জীবনেও শোধ করে উঠতে পারে না—আসলের কথা ছেড়েই দিলুম।

আমি বললুম—সুজিত, তুমি যা বলছ, এক সময় হয়তো তাই ছিল। সর্দারী প্রথা, সর্দারদের অত্যাচার, ঘুষ নেওয়া এ-সব আজকাল উঠে গেছে বলেই তো শুনতে পাই। কেন [illegible] কারখানায় যে লেবার আপিস হয়েছে, সেটা সর্দারী প্রথা তুলে দিয়েই তো?

সুজিত বললে—চোখের সামনেই তো দেখলে ভাই। সর্দারী প্রথায় আগের দিনে কি হতো? ঘুষ না দিয়ে কেউ কাজে বহাল হতে পারত না। এখনও তাই হচ্ছে। সর্দার না থাক, সর্দারী প্রথার ভূত এখনও আছে। ও কি সহজে যায়? বড় লোভের জায়গা। একজনকে হটিয়ে দিয়ে আর-একজন এসে ঢুকে পড়ে ফাঁকটায়। এখনও কতকাল এইভাবে চলবে জানি না।

॥ ছয় ॥

উপেনবাবুকে টাকাটা যোগাড় করে দেওয়ার পর থেকে আমি আর তাঁর চোখে একেবারে তুচ্ছ রইলুম না। হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে

এবার থেকে তিনিই একটু দাঁড়িয়ে দু-চার মিনিট আমার সঙ্গে কথা কয়ে যেতেন। এর ফলে কুলিমজুরদের চোখে আমার কদরও যেন একটু বেড়ে গেল। সুজিত আর ফটকের দরোয়ান ছাড়া মিলের মধ্যে কেউ কোনোদিন আমার সঙ্গে এগিয়ে এসে কথা কইত না। কিন্তু আজকাল দু'-চারটে চেনা-মুখ আগবাড়িয়ে মাঝে-মাঝে ভারি মিষ্টি হেসে আমার কুশল শুধোতে শুরু করলে। ফটকের দরোয়ান দেখে শুনে মন্তব্য করলে যে এইবার আপিসের একজন ছোটবাবু হয়ে পড়তে আমার আর খুব বেশী দেরি হবে না।

একদিন কারখানার ফটক পার হয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় পায়ের ধূলো নিয়ে একজন প্রণাম করে বসল। চেয়ে দেখি বিরাট চেহারার এক পুরুষ। গায়ের বসন মলিন, কিন্তু তার মাংসপেশীগুলো দেখবার মতো। বলিষ্ঠ সুদৃঢ় দেহ অথচ কেমন যেন নিজের শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন। অমন বিরাট শরীর, কিন্তু চোখ দুটো একেবারে শিশুর মতো। তার উপর বুলি এমনই দেহাতী হিন্দী যে বোঝে কার সাধ্য! যাই হোক তবু বুঝলুম। চটকলে যারা কিছুদিন কাজ করেছে এ কথা বুঝতে তাদের ভাষার মাধ্যম লাগে না। হাবেভাবেই বোঝা যায়। একটা ময়লা ধুতি পরা মানুষের এগিয়ে আসার ভঙ্গী দেখেই আমরা বুঝতে পারি যে সে চাকরির খোঁজে আসছে, আর কিছুর খোঁজে নয়। তার উপর এর কম্পমান হাতে ধরা একখানা পাঁচ টাকার নোট।

নোটটা দেখে আমি ঘাবড়ে গেলুম। এমন ধারা খোলা আকাশের নীচে সর্বচক্ষুর সামনে এমনভাবে ঘুষ, চটকলী-ভাষায় যাকে বলা হয় কমিশন বা প্রণামী আমাকে কেউ দেয়নি। এটা ঐরকম একটা বিরাট সবলকায় হিন্দুস্থানী শিশুর পক্ষেই সম্ভব। আমি লোকটাকে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে বললুম—তোর নাম কি রে?

—ফগুয়া।

—থাকিস কোথায়?

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—ঐ লাইনে।

—কতদিন এসেছিস্ ?

—চার মাহিনা। বদলির খাতায় নাম উঠেছে হুজুর—কিন্তু কাম এখনও পাইনি।

সিঁড়ির এক ধাপ উপরে উঠে বেচারা বসে আছে। বসে আছে তো বসেই আছে। এ যে কি যন্ত্রণা, যে তার মধ্যে না পড়েছে সে বুঝবে না। বেকারত্বের ঘোর অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ একবার ঝিলিক দিয়েই আবার যে-কে সেই অন্ধকার। মনে হয় এর চেয়ে যেন ঝিলিক না-মারাই ছিল ভাল। এই এক ধাপ উঠতে নিশ্চয় তার গোটা কুড়ি টাকা খসেছে—ওটা তো উপেনবাবুর ন্যায্য প্রাপ্য। সে টাকা আকাশ থেকেও পড়েনি, ফগুয়ার ট্যাঁকশাল থেকেও আসেনি। এসেছে সোজা পথে মহাজনের ঘর থেকে। তার উপর ঐ রকম একটা বিশাল দেহকে টিঁকিয়ে রাখতে গেলেও দু-বেলা দু-মুঠো চালের দরকার। তার খরচ দেয় কে ? তার খরচ দেশোয়ালী ভাইরা যুগিয়ে এসেছে এবং শোধের জন্যে তাগিদও দিয়ে আসছে। পুরুষ মানুষের পক্ষে এতগুলো দেনা মাথায় নিয়ে কতদিন আর চলে ? ধৈর্যের তো একটা সীমা আছে ? বদলির কাম তাই চাই-ই চাই, আর বসে থাকা চলে না।

—ফগুয়া ! টাকা রাখো ! তা আমায় ধরেছ কেন ?

—জানি হুজুর উপেনবাবুই আসল আদমি। কিন্তু উনি তো পাত্তাই দিতে চান না। আপনার সঙ্গে জান-পহচান্ আছে দেখেছি। একটু যদি দয়া করে বলে দেন। উপেনবাবুর টাকা আমি পুরা দেব। এই বলে আবার সে নোটখানা আমার দিকে এগিয়ে ধরল।

আমি লজ্জায় পড়ে গেলুম। চারিদিকে চেনা চোখের ভিড়। যদি কেউ দেখে ফেলে। এবার ধমক লাগালুম। বললুম—ফগুয়া ভাল হবে না বলছি। নোট ট্যাঁকে গোঁজ। শোনো। এক

কাজ কর। কাল টিফিনের সময় আমার আপিস ঘরে এসো একবার। প্রভিডেণ্ড ডিপার্ট।

অত বড় জোয়ান লোকটা কাঁচু মাচু হয়ে চলে গেল। মনে মনে কি ভাবলে কে জানে? হয়তো ভাবলে উপেনবাবু যেমন পাত্তা দিতে চান না, ইনি হয়তো তার চেয়েও এক কাটি দড়। কে জানে কত টাকা দিলে তবে এ-সব বাবুদের মন পাওয়া যায়।

চটকলের আনাচে কানাচে এমনি কত ফগুয়া হন্যে কুকুরের মতো ঘুরে বেড়ায়, তাড়া খেয়ে খেয়ে ফেরে, জুল-জুল চোখে চেয়ে দেখে ঐসব অজানা অচেনা কল-কব্জাগুলোর দিকে আর ভয় পেয়ে যায়। চটকলের এই অবুঝ সংসারের হাল-চাল নিয়ম কানুনগুলো এরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। যত বোঝবার চেষ্টা করে ততই গুলিয়ে যায়। উপদেশ দেবার, সহানুভূতি দেখিয়ে মন্ত্রণা দেবার প্রচুর লোক আশে পাশে। কিন্তু যে উপদেশ শুনলে নির্ভুল ভাবে চাকরি মিলে যায় সে উপদেশ কেউ-ই দিতে পারে না। ফগুয়ারা কেবল তাই ঘুরে মরে চটকলের গোলক ধাঁধার মধ্যে।

পরদিন সুজিতকে সব বললুম। সুজিত মন দিয়ে শুনে বললে—ফগুয়া? চিনতে তো পারলুম না। কত লোকেরই বদলির খাতায় নাম আছে। তবে শুনে মনে হয় লোকটা বড় সরল, নেহাত বোকা, একেবারে গ্রাম্য। নইলে এই তো ফাল্গুন মাসে বদলির মরসুম পড়ল। এ সময় আমাদের কারখানায় তিন-শ চার-শ কোনো কোনো বছর ছ-সাত-শ পর্যন্ত বদলিকে কাজ দেওয়া হয়। এ সময় একটু তৎপর হলেই তো কাজ পেয়ে যাওয়া যায়।

আমি বললুম—টাকা ট্যাঁকে গুঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে, একে ওকে ধরছে—এর থেকে তৎপরতা আর কি হতে পারে?

সুজিত বললে—তবে বোধ হয় ভাগ্যই খারাপ। যাই হোক, লোকটাকে তো তুমি আসতে বলেছ। আসুক না, দেখি একবার চেহারাটা।

ফাল্গুন মাস এল তো ছুটির মরসুম পড়ল। দেশে ফেরার এই হচ্ছে সময়। সারা বছর মুখ বুজে থেকে ঠিক এই ফাল্গুন মাসে কারখানার কুলিগুলোর প্রাণে শখ জেগে ওঠে। গ্রামের আমোদ প্রমোদের কথা মনে পড়ে যায়। আর মনে পড়ে যায় বিয়ে করার কথা। দলে দলে যুবক মজুর ছোটে বিয়ে করতে। যে-সব জোয়ান একেবারে শূন্য হাত নিয়ে কারখানায় ঢুকেছিল তাদের হাতে কিছু কড়ি জমলেই তাদের বিয়ে করার মতো অবস্থা হয়। তারা ট্যাঁকে পয়সা গুঁজে বেরিয়ে পড়ে বউ আনতে। সমাজের চোখে কেউ-কেটা হতে। আর যারা বউ-ছেলেপুলে দেশে রেখে এসেছে তারা যায় হাত-পা ছড়িয়ে একটু জিরোতে, সংসার ধর্ম পালন করতে, মদ খেয়ে কিছু স্ফূর্তিও করতে। ফাল্গুন-চৈত্র থেকে এদের যাওয়া হয় শুরু, দু-মাসের আগে কেউ ফেরে না। তিন-মাস, চার-মাস পাঁচ-মাসও হয়। আষাঢ় শ্রাবণের মধ্যে প্রায় সবাই ফিরে আসে। বছরের এই চার-পাঁচ মাস প্রতি চটকলেই মজুরের ঘাটতি। এই সময় পারমানেণ্ট মজুরের জায়গায় বদলি মজুর নেওয়া হয় প্রচুর। উপেনবাবুর মত করিতকর্মা বাবুরা এই সময় কিছু কামিয়েও নেন।

—কত করে পান উপেনবাবু এক-একটা মজুরের কাছ থেকে ?

সুজিত খানিকটা ভেবে বললে—যতদূর জানি উপেনবাবু যদি কোনো মজুরকে দু-মাসের কাজের নিশ্চয়তা দিতে পারেন, সে তাঁকে ত্রিশটা টাকা দেবেই।

সর্বনাশ, এ যে অনেক টাকা। গরিবগুলোর তাহলে আর থাকে কি ?

—থাকে একটা ভরসা ! যদি কোনোরকমে ছ-মাসের বেশীও কাজটা টিকে যায়। যদি পারমানেন্ট হওয়া যায়। যদি ভবিষ্যতে আবার খুচরো কিছু বদলি কাজ পাওয়া যায়।

দেশ থেকে হতভাগারা যখন আসে তখন কেউ ট্যাঁকে করে লাখ টাকা নিয়ে আসে না ! পেটের ধান্দায় আসে সবাই—হাত সবারই শূন্য। শহরে আসছে রোজগার করতে, সঙ্গে আবার পয়সা নিয়ে আসবে কি ? যার যা কিছু সামান্য পুঁজি ঘরেই রেখে দিয়ে আসে, ঘরের মানুষগুলোর জন্যে। এখানে আসে এক বস্ত্রে। প্রথম দিন থেকেই ধার করা শুরু করে। নির্ভয়ে বেপরোয়া ভাবে ধার করে যায়। ধার দেবার লোক অনেক আছে। কাবুলিওয়ালা তো আছেই, তা ছাড়া লাইন সর্দার, দরোয়ান আর বাজারের মহাজন। চড়া হারে সুদ। বছর গেলে আসলের পাঁচ গুণ ছ গুণ মহাজনের ঘরে আসে। দু-একটা দেনদার ছটকে পালিয়ে গেলেও গায়ে লাগে না। তবে মজুররা বেশীর ভাগই অতি সরল বিশ্বাসী। মহাজনকে ফাঁকি দিয়েছে এমন ঘটনা অতি বিরল। এইভাবে চড়া সুদে টাকা ধার নিয়ে মজুররা কিন্তু ডুবে যায়। বিশ বছর কারখানায় খেটেও মহাজনের টাকা শোধ হয়নি এমন দৃষ্টান্ত হাজারে হাজারে মিলবে। হাতে টাকা জমলে তবে একটা কিছু করব-দেশে জমি কিনব, ঘর তুলব, বউ আনব বা ছেলের বিয়ে দেব এ-ভাবে এখানকার জগত চলে না। এখানে দেখতে হবে কার চাকরির কত ভার, কত জোর। কে কত বেশী পারমানেন্ট। কার কত বেশী রোজগার। সেই অনুসারে এখানে টাকা ধারের পরিমাণ নির্ধারিত হবে। টাকার দরকার ? ধার করো। তারপর শোধ করবার কথা পরে ভেবো। শোধ যদি না-ও করতে পারো সুদটা গুঁজে দিও সময় মতো ঠিক মতো।

—আচ্ছা লোকটা যে বললে উপেনবাবু ওকে পাত্তা দিচ্ছেন না, তার আসল কারণটা কি ?

—কারণ তো অতি স্পষ্ট। যার সঙ্গে যত বেশী দর কষাকষি চলে। লোকটা নিশ্চয় ভালোমানুষ আর ভীতু। এগিয়ে এসে নিজের জোর জানাবে দাবি জানাবে এটা পারে না। উপেনবাবু এবং তাঁর দালালরা এই সুযোগে যতটা পারে ওর কাছ থেকে আদায় করে তো নেবেই।

—বেশ বললে সুজিত। আমায় তাহলে উপেনবাবুর দালাল ঠাউরেছে। উন্নতির পথে এগিয়ে চললুম তাহলে আমি।

এই সময়ে ফগুয়া এসে ভয়ে ভয়ে আমাদের ঘরে ঢুকল। কাঁধে কালকেরই সেই ময়লা গামছাটা, মাথার চুলেও তেল পড়েনি কিন্তু পরনের ধুতিটা আজ পরিষ্কার। তার কালো নিটোল দেহে পরিষ্কার ধুতিটা ভারি চমৎকার মানিয়েছিল। হয়তো ঐ টুকুর জন্যেই মনে হচ্ছিল একে ডেকে দুটো কথা বলি, দুটো কথা শুনি—ওর সুখ দুঃখের কথা, ঘর-সংসারের কথা।

কিন্তু সুজিত অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে শুরু করল—তোমার নাম ফগুয়া ?

—হুজুর।

—বদলি ?

—হুজুর।

—রোজ হাজিরা দিচ্ছ ?

—হুজুর।

—তবে আর কি ? জায়গা হলেই তোমায় নিয়ে নেওয়া হবে। তোমার টার্ন অবধি অপেক্ষা কর। এ বাবুকে ধরেছ কেন ? এ বাবু কি লেবার ডিপার্ট-এ কাজ করেন ?

ফগুয়া ওসব টার্ন ফার্ন বোঝে না। সে জানে চাকরি পেতে গেলে কিছু টাকা খসাতে হয়। উপেনবাবুকে ত্রিশ টাকা দিতে হবে, সেটা সে আলাদা রেখেছে। তবে আরো তো কেউ কেউ আছেন—কে তাঁরা এবং কতই বা তাঁদের রেট ? এই বাবুর সঙ্গে তো

উপেনবাবুর খুব জান-পছন্ লোকে বলছিল। তা চাকরি যদি হয়, এ বাবুকে সে পাঁচ টাকা কেন, আরও কিছু বেশীও দিতে রাজি আছে।

আমি মনে-মনে প্রমাদ গুনলুম। সুজিত একটা ধমক লাগিয়ে ফগুয়াকে বুঝিয়ে দিলে উপেনবাবুকে টাকা দিতে হয় সে ফগুয়া বুঝুক কিন্তু খবরদার এ-বাবু কিংবা অন্য কোনো বাবুর হাতে যদি সে টাকা দিতে যায় তাহলে ফগুয়া বিপদে পড়বে। বদলির খাতা থেকে তার নাম কাটা যাবে। যাই হোক, এখন সে নিশ্চিন্ত মনে ফিরে যাক। সুজিত তার ছু-মাসের চাকরির ব্যবস্থা করছে।

ফগুয়া খুশী মনে চলে গেল।

কারখানার কর্তারা লেবার দপ্তর খুলে নতুন লেবার অফিসার এনেছেন বটে কিন্তু লেবার অফিসারের আসল কাজ কি? আসল কাজ হচ্ছে মজুরদের সঙ্গে কোম্পানীর শ্রমিক-আইন ঘটিত কোনো বিরোধ ঘটলে তার ঝক্কি সামলানো। আইন-আদালত করা, হাকিমের এজলাসে যাওয়া, উকিলের পরামর্শ নেওয়া, শ্রমিক ইউনিয়নের মারফত মিটমাটের ব্যবস্থা করা। আমাদের লেবার অফিসার বোঝেন যে কারখানার মধ্যে শ্রমিকদের কর্ম-ব্যবস্থার কিছু উন্নতি করলে ঐসব ঝঞ্ঝাট অনেক কমে যাবে। সেই কারণে তিনি ধীরে ধীরে কিছু-কিছু সংস্কারের পথে এগচ্ছেন। তিনি পুরোনো সর্দারী প্রথার বদলে নাম রেজেষ্ট্রি করে বদলি নেওয়ার প্রথা প্রবর্তন করেছেন বটে কিন্তু এখনও সর্দারী প্রথার ভূতকে কারখানার আনাচ কানাচ থেকে তাড়াতে পারেননি। তাদের তাড়ানো কি একদিনের কাজ? নিরীহ মজুররা নাম রেজেষ্ট্রি বোঝে না, বিশ্বাসও করে না। খাতায় একজনের পর একজনের নাম লেখা হয়ে গেলেই যে ঠিক সেই একজনের পর একজনের নাম খাতা থেকে বেরিয়ে আসবে এ কখনও হয়? ওরই মধ্যে অনেক কারচুপি অনেক কারসাজি আছে নিশ্চয়। আগেকার দিনে তাদের গ্রামের

সর্দার যখন তাদের চাকরির বিলি-ব্যবস্থা করে দিত, সে ছিল অনেক সহজ। ব্যাপারটা বোঝা যেত বেশ পরিষ্কার। সর্দারের একটা প্রাপ্য ছিল। টাকা দিয়ে হোক অন্য কোনো ভাবে হোক সর্দারকে যে যত খুশী করতে পারত, সর্দারের কৃপা সে পেত তত বেশী। এখনকার দিনে লেখাপড়া-জানা লেবার অফিসার এসেছেন তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে। তার উপর একটা আপিস। এর মধ্যে কার যে কত থাঁই, কে যে কার দালাল, ঘুষ-ঘাষ গুলো গুঁজে দেবার যে-সব ভদ্র প্রথা আছে সেগুলিই বা কি এই নিয়ে বেকার মজুরদের চিন্তার আর গবেষণার অন্ত নেই। উপেনবাবুকে তবু বোঝা যায়—তাঁর প্রাপ্যের ন্যায্য একটা চাহিদা আছে। কিন্তু এ ছাড়া আরো কে-কে যে কোথায় আছেন তাঁদের খুঁজে বার করে কি করে বেচারারা? বড় গোলমেলে হয়ে দাঁড়িয়েছে সমস্ত বিষয়টা। সর্দার ছিল একটা সবার-জানা মানুষ। সে লোকটাকে যার যেমন ক্ষমতা ঘুষ খাইয়ে খুশী করবার চেষ্টা করত। এখন হয়েছে আপিস। আপিসকে ঘুষ দেবার লুকোনো দরজাগুলো কোথায় রে বাবা?

সুজিতকে একবার আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম—আচ্ছা সুজিত, আমাদের লেবার অফিসার দাস সায়েব উপেনবাবুর ব্যাপার জানেন না?

সুজিত বলেছিল—দাস সায়েবের অবস্থাটা বোঝ। তিনি চাকরি করতে এসেছেন, ভদ্রভাবে চাকরি করে যেতে যান। খোলা-খুলিভাবে সর্দাররা আজকাল কমিশন নিয়ে মজুর ভর্তি করছে না এইটে জেনেই তিনি সন্তুষ্ট। ঐ অবধিই তাঁর কর্তব্যের সীমানা। চোখের আড়ালে গোপনে কি কারবার চলেছে এসব খুঁটিয়ে বার করা দাস সায়েবের কাজ নয়। সে জন্যে তাঁকে চাকরিতে আনা হয়নি। তা ছাড়া তাঁর ভয় আছে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়তে পারে। তাই তিনি উপেনবাবুর ব্যাপার নিয়ে কেনই বা মাথা ঘামাবেন?

ফগুয়াকে ভর্তি করতে কোন বেগ পেতে হয়নি ; তার টার্ন প্রায় এসেই গিয়েছিল। খাতা সাজিয়ে লেবার অফিসারের সামনে ধরতেই তার ছ-মাসের বদলি চাকরি হয়ে গেল। উপেনবাবু অবশ্যই তাঁর কমিশন পেলেন। তাঁর লোক গোপনে ফগুয়ার কাছ থেকে টাকা আদায় করে নিয়ে চলে গেল।

॥ সাত ॥

তারপর শুনলুম ফগুয়ার ইতিহাস। উত্তর বিহারের এক গণ্ডগ্রামের চাষীর ছেলে। বছরের পর বছর বন্যায় ভেসে যায় গ্রাম। এই বন্যা যদি ঠিক সময় আসে তাহলে উপযুক্ত পলিমাটি পড়ে গ্রামকে গ্রাম সোনার ফসলে ভরিয়ে দিয়ে যায়। গ্রামের চাষীরা হাসিতে ডগমগ হয়ে ওঠে। ঘরে ঘরে নতুন কাপড় নতুন গহনা কেনার ধুম পড়ে যায়। ভাঙা ঘর সারানো হতে থাকে ঘরের চালে নতুন খড় উঠতে থাকে। বুড়ো বাপ-মার হাতে পয়সা দিয়ে জোয়ান ছেলেরা তাদের তীর্থ করতে পাঠিয়ে দেয়। বেহিসবী খরচ করতে থাকে সবাই। এমনি সুখের স্রোত চলবে এইটেই সবাই ধরে নেয়। মনেই করতে পারে না যে দুঃখের দিনও আবার আসতে পারে। দিন এবং রাত্রের মতো সুখের পর দুঃখের বৎসর সত্যিই আসে। পরের বছরই বন্যার জল রুদ্র মূর্তি নিয়ে গ্রামে এসে ঢোকে। ঘরবাড়ি গরু ছাগল ক্ষেতের ফসল ভাসিয়ে নিয়ে যায়। হাহাকার ওঠে চারিদিকে। করাল মূর্তি নিয়ে হাজির হয় দারিদ্র্য, অভাব, অনশন, মহামারী, মৃত্যু। এই চলছে ফগুয়াদের গ্রামে ফগুয়া যতদিন থেকে জন্মেছে ততদিন। সুখের বছরের চেয়ে দুঃখের বছরই বেশী। সুখের স্নেহস্পর্শের চেয়ে দুঃখের কাটা বেঁধে বেশী। ফগুয়ার যখন ছ বছর বয়েস একবার গভীর রাত্রে বন্যার জলে সে ভেসে গিয়েছিল। সন্ধ্যার

সময় যখন গ্রামে জল ঢুকতে আরম্ভ করে তখন তার বাপ-মা তাকে আর তার ছোট বোনকে খড়ের চালের উপর তুলে দিয়ে গ্রামের ধারে নদীর পারে ছুটে গিয়েছিল বাঁধের ফাটল মেরামত করতে। সারা গ্রামের মানুষ সেখানে ছুটে গেছে মাটি ফেলে বাঁধ উঁচু করতে। গ্রামের দুই সীমানার নদীর পাড় উঁচু, শুধু গ্রামের সামনেটাই নিচু—ঐখান দিয়েই জল ঢোকার ভয়। সবাই মিলে প্রাণপণে চেষ্টা করছিল ঐ ফাঁকটুকু উঁচু করে সেবারকার মতো গ্রামটাকে বাঁচাতে। কিন্তু পারেনি। পাহাড় অঞ্চলে তখন প্রবল বৃষ্টিপাত হয়ে চলেছে। তার কোনো বিরাম নেই, কমতি নেই। ঝরনা বেয়ে, ফাটল দিয়ে, নালা দিয়ে সেই বারিস্রোত অবারিত এসে মিলছে নদীর জলে। তার গতি রুধবে কে? রাত বারোটার সময় গর্জন করতে করতে পাহাড়ী জলের ঢল নেমে এল। গ্রামের মুখে নদীর পাড়ে ফাটল ধরল। সবাই দৌড়ে গিয়ে উঠল উঁচু পাড়ের উপর আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল নদীর জল উপচে পড়ে পাড় ভেঙে দিয়ে পাক খেতে খেতে গ্রামের মধ্যে গিয়ে ঢুকছে। সেবার প্রায় সব ভেসে গিয়েছিল—গরু, ছাগল, বাড়ি, ঘর কিছু বাকি ছিল না। কচি কাঁচা ছিল সব ঘরের চালায়। তাদের মধ্যে যারা চালা ধরে ভাসতে পেরেছিল তারা গিয়েছিল টিঁকে। ফগুয়ার বোনটা জলের প্রায় প্রথম ধাক্কাতেই ছিটকে পড়েছিল ঘোলা জলে। কালির মত কালো অন্ধকারে প্রাণপণে চোখ মেলেও ফগুয়া তার টিকিটিও দেখতে পায়নি। সে নিজে খড় জাপটে বৃষ্টির ছাঁটে ভিজতে ভিজতে বারো মাইল ভেসে গিয়েছিল। পরের দিন দুপুরবেলায় তাকে এবং নানা গ্রামের আরো অনেক ছেলেমেয়েকে পাওয়া যায় এক জলার ধারে। ধানের ক্ষেতে জল জমে বিরাট এক জলার সৃষ্টি হয়েছে। তারই মধ্যে এখানে ওখানে খড়ের চালার উপর মানুষের শিশু ভেসে বেড়াচ্ছে। বন্যার জল যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেছে। খড়ের চাল, কাঠ কুটো আর গরু-মোষের মৃতদেহ আটকা পড়েছে জলায়

সুর্বছর আর দুর্বৎসরের এমনি বেহিসেবী দোলার মধ্যে পড়ে ফগুয়ার বাপ তার চার বিঘে জমির সম্বলটুকু একটু একটু করে বেচে দিতে বাধ্য হয়। যখন আর কিছুই রইল না, তখন বুড়ো তার ভাঙা মন নিয়ে পেটের জ্বালায় পরের জমিতে দিন মজুরী শুরু করল আর তার জোয়ান ছেলে ফগুয়া বিহারের সুদূর গ্রামে বসে কলকাতা শহরের কারখানা জীবনের। অদ্ভুত রোমাঞ্চকর সব গল্প শুনতে শুনতে একদিন স্বপ্ন-ভরা রঙিন মন নিয়ে বেরিয়ে পড়ল চট-কল ফেরত এক দলের সঙ্গে। সে জানলে শুধু মনে সাহস নিয়ে একবার যদি সেই অজানা ভয়ঙ্কর শহরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারা যায় তাহলে সব স্বপ্নই সফল হয়। পেটের ভাবনা ঘুচে যায়, হারানো জমি উদ্ধার হয়, নরম নরম ছোট্ট একটি বউ আনা যায় ঘরে। তাই সে বেরিয়ে পড়ল সাহস করে। কিন্তু দেশোয়ালী যারা তাকে ভরসা দিয়ে এনেছিল তারা তার কোনো চাহিদাই মেটাতে পারলে না। তারা শুধু তাকে কারখানা দেখিয়ে দিলে আর ধার ধোরের বন্দোবস্ত করে দিলে। এবার তাকে নিজেই চাকরি খুঁজে নিতে হবে। শহরে এসে প্রথমটা দিশেহারা হয়ে পড়লেও কিছুদিনের মধ্যেই সে নিজেকে সামলে নিলে। অনেকেই তাকে ভরসা দিলে চাকরি সে পাবেই, শুধু একটু অপেক্ষা করা, এই যা। ধার বেড়ে চললো ফগুয়ার। পাকে পাকে জড়িয়ে পড়ল সে। প্রথম যেদিন ক্যাজুয়াল লেবারের কাজ পেল সে, সেদিন আনন্দের চোটে ভেবে বসেছিল, এইবার সে দেনা মিটিয়ে ফেলবে এবং একবার দেনা মিটিয়ে ফেলতে পারলে তারপর টাকা জমিয়ে ফেলতে আর কতক্ষণ? ক্যাজুয়াল কাজ শেষ হয়ে গেলে আনন্দের রেশ যখন মিলিয়ে গেল, তখন ফগুয়া বুঝলে যে যতক্ষণ না মোটামুটি পাকা কাজ পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ দেনার দায় তার মিটবে না। তারপর সে ঘুষ দিয়ে বদলির খাতায় নাম ওঠালো। রোজ হাজিরা দিতে লাগল বদলির আপিসে। ছুটকি-ছাটকা যা কাজ পেতে লাগল তাতে করে

কিন্তু তার কোনো সমস্যাই মিটল না। শেষে এল ফাল্গুন মাস। প্রথম দক্ষিণ হাওয়ার পরশে জগদ্দলের বস্তির ধুলোমাখা রাস্তার ধারের ঘোড়ানিম গাছের নতুন কচি পাতাগুলির দিকে চেয়ে তার মন যখন তার উত্তর বিহারের গ্রামে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, তখনই লেগে গেল বদলির কাজের হিড়িক। বদলি-মজুর যারা, তারা সবাই একে একে কাজ পেয়ে যেতে লাগল। কেউ পেল দু-মাসের, কেউ তিন-মাসের কেউ চার-মাসের। এখন কি আর এই প্রায়-পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে দিয়ে দেশে ফেরা চলে? মন যতই উতলা হোক না ঘরের জন্যে, এতদিন-পরের এই সুযোগ অবহেলা করা উচিত নয়। ফগুয়া অধীর হয়ে, অস্থির, অধৈর্য্য হয়ে, অশান্ত হৃদয় নিয়ে, ট্যাকে উপেনবাবুর জন্যে ত্রিশটা টাকা গুঁজে ঘুরে বেড়াতে লাগল—কখন তিনি চান, কখন তাঁর হাতে টাকা কটা গুঁজে দিয়ে বুক ভরে একটা নিঃশ্বাস নিতে পারে। কিন্তু উপেনবাবু টাকাও চান না, কিছু বলেনও না। চাকরিও যে কবে হবে বোঝা যায় না। এই সময় তার এক সহৃদয় বন্ধু আমাকে দেখিয়ে দেয়। বলে, একে খুশী কর আগে, তা হলেই একটা হিল্লে হয়ে যাবে। চাকরি কি অত সহজে মেলে? ফগুয়া ততদিনে বেশ ভালভাবেই জেনে নিয়েছে, চাকরি সহজে মেলে না, তার জন্যে বহু কাঠ খড় পোড়াতে হয়। ফগুয়া প্রচুর কাঠ খড় পোড়াবার জন্যেই প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছিল—মরিয়া তার অবস্থা—যত টাকা লাগে লাগুক, সে ধার করে আনবে—কিন্তু চাকরি তার চাই-ই—একখানা যা-হোক বদলির কাজ—দু-মাস কি তিন-মাস। অবশেষে চাকরি তার হল—দু-মাসের গ্যারান্টি দিলেন উপেনবাবু। পকেটে গুঁজলেন ত্রিশটি টাকা। দেশোয়ালিরা দেশে যাচ্ছে বলে তখন জগদ্দলের বস্তিতে বস্তিতে এমনই টাকার টানাটানি যে ঐ ত্রিশটি টাকার প্রতিটি টাকার জন্যে মাসে চার আনা সুদ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবে টাকাটা আদায় হল।

দেনা করা তখন ফগুয়ার অভ্যেস হয়ে গেছে। বেপরোয়া টাকা ধার করতে এবং তা শোধ করবার কথা ভাবতে সে ভয়ও পায় না। সামনে অত বড় একটা কারখানা রয়েছে, কাজ ওখানে সে পাবেই, রোজকারও করবে ঢের। আজ না-হোক কাল দেনা শোধ হবেই, আর তার পর উদ্ধার করবে সে তার বাপের হারানো জমি এবং সব শেষে ঘরে আনবে নরম নরম ছোট্ট একখানি বউ। তারপরে আর কারখানার সঙ্গে তার সম্পর্ক কি? এখানে এই শহরতলিতে নোংরার মধ্যে পড়ে থাকতে কি আর কারো ভালো লাগে? এখনই তো হাঁপ ধরে গেছে। সন্ধ্যের সময় বস্তির ধোঁয়া-ভরা লণ্ঠনগুলো যখন জ্বলে ওঠে আর চারিদিক তেল-পোড়া গন্ধে ভরে যায়, তখন বুকের মধ্যে থেকে তার কান্নার মতো কি যেন একটা বেরতে থাকে। যত শীঘ্র পারে সে গ্রামে ফিরে যাবেই। দেনা চুকিয়ে বাপের হারানো জমিটা উদ্ধার করে নরম ছোট্ট একখানা বউ ঘরে এনে আর সে কারখানায় ঢুকবে না। এই সমস্ত স্বপ্ন দেখতে দেখতে ফগুয়া ছু-মাসের বদলির কাজে মনে প্রাণে লেগে গেল।

—হুজুর!

—কে? ফগুয়া? কি চাই?

গরাদের ধারে বসে খাতা লিখছিলুম। ফগুয়া এসে উবু হয়ে আমার পায়ের কাছে বসল।

—আপনারা ছু-জনে বহত্ ভালো আদমি বাবু।

—কেন রে, আবার কি হল?

একটু উস্‌খুস্ করে ফগুয়া বললে—হুজুর, আমি মানত করেছিলুম, বদলি কাম হলে পীরের দরগায় সিন্নি বাতাসা দেব। হুজুর, আপনার পাত্তা বলুন—আপনার বাড়িতে কিছু সিন্নি বাতাসা পৌঁছে দেব।

—এর জন্যে বাড়ি যাবার দরকার কি ? এখানেই নিয়ে আসিস্, নিয়ে যাবো।

—না, হুজুর তা হবে না। আপনার বাড়ি আমি পৌঁছে দেব। কাল ফজিরে চলে যাব। আর সুজিতবাবুর পাত্তা ভি বলে দিন। ওখানে ভি যাবো।

—বেশ তবে তাই আসিস্। সুজিতবাবুর বাড়ি তোকে যেতেও হবে না। সে বাবু আমার বাড়িতে আসছে কাল সকালে। সারাদিন থাকবে।

এই বলে ফগুয়াকে আমার ঠিকানা দিয়ে দিলুম। পরের দিন ছিল রবিবার। সুজিতকে বলেছিলুম সারাদিনের জন্যে এসে আমাদের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করতে।

আমাদের কারখানার গলি পশ্চিম দিকে যেখানে কুলি-বস্তি পার হয়ে গঙ্গার ধারে এসে বেঁকে গেছে সেখানে বুড়ো বট-গাছ তলায় এক পীরের দরগা। জাগ্রত পীর। কারখানার মজুরদের মধ্যে প্রচুর তাঁর প্রতিপত্তি। পীরের সুনজর না হলে কারুর চাকরি হয় না। কাঁচা চাকরি পাকা হয় না। এই পীরের কাছে সবাই মানত করে। অসুখ বিসুখ হলে তো করেই। সবচেয়ে বেশী করে চাকরির জন্যে। ফগুয়াও তাই করেছিল।

পরের দিন এল ফগুয়া। হাতে দুই চাঙাড়ি বাতাসা আর পীরের শুকনো সিন্নি। আমিও ছাড়লুম না ফগুয়াকে। বললুম— এয়েছিস, খেয়ে যা। অত বড় চেহারা হলে হবে কি ? ভারি লাজুক। একেবারে মেয়েছেলের মত। রাজী হতে যেন মাথা কাটা যায়। শেষটা সুজিত আর আমি দু-জনে খুব পীড়াপীড়ি করায় থেকে গেল সারা বেলাটা, আর আমরাও দুপুর বেলা মাদুরে শুয়ে হাত-পা ছড়িয়ে শুনে নিলুম তার গ্রাম্য জীবনের অন্তরঙ্গ কাহিনী— যা এইমাত্র বলেছি।

—ফগুয়া চাকরি তো পেলি। কোথায় থাকবি তুই ? ঘর-টর

পেয়েছিস? বউ আনতে হবে তো আজ বাদে কাল? ঘর না হলে বউ আনবি কি করে?

—হুজুর আপনাদের মতো বহত্ ভালো একঠো আদমি বস্তিতে আছে। ওর ঘরে থাকতে দেবে। পয়সা নেবে না।

—সে কি রে? পয়সা নেবে না?

—না হুজুর। বলেছে এখন বিনি পয়সায় থাকবো। চাকরি পাকা হলে চার আনা কিরায়া নেবে।

—কি নাম রে?

—সমাদ্দার।

॥ আট ॥

লেবার বিভাগে গিয়ে বসব বলে আমি যখন তৈরী হচ্ছি ঠিক সেই সময় এক মস্ত ঘটনা ঘটে গেল। দীর্ঘ ছ-বছরের বিশ্বযুদ্ধ হঠাৎ একদিন শেষ হয়ে গেল। দুর্ধর্ষ হিটলারের বাহিনী আত্মসমর্পণ করল মিত্রশক্তির কাছে। জার্মানীর আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। আমাদের সায়েবরা চুরচুরে মাতাল হয়ে বিজয়-উৎসব পালন করলেন। নাচলেন, গাইলেন আর ভাব দেখালেন—এবার আর তাঁদের পায় কে? তখনও অবশ্য জাপানের পতন হয়নি, কাজেই লড়াই শেষ হয়েও শেষ হল না। সেই সময় আমি লেবার বিভাগে বদলি হয়ে এলুম। লেবার আপিসের স্যাঁতসেতে ঘরে গরাদ দেওয়া জানলার ধারে সুজিতের টেবিলের একপাশে খোলা খাতা নিয়ে বসে থাকতুম। বিশেষ কাজের চাপ ছিল না। গরাদের মধ্যে দিয়ে দেখতুম কারখানার বড় ফটক আধখানা ফাঁক করে দু-জন দরোয়ান সব সময় পাহারা দিচ্ছে। মজুরদের ঢোকবার বেরবার ফটক এটা নয়—তাদের জন্যে কারখানার অপর পাঁচিলে ছোট ফটক, যেখানে চাকতি দেখিয়ে মজুরদের দল সারি সারি

পিঁপড়ের মতো প্রবেশ করে। বড় ফটক দিয়ে সায়েবদের গাড়ি যেত আসত, লরি যেত মেশিনের পার্টস বোঝাই হয়ে। মাঝে মাঝে দেখতুম কয়লা লোহালক্কড় যন্ত্র আর সায়েবদের বাংলোর আসবাব-ভরা লরি আনাগোনা করছে। দেখতুম বসে-বসে এই সব। দরোয়ানদের সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেল আমার। দুজনের মধ্যে প্রায়ই একজন গরাদের বাইরে দাঁড়িয়ে গল্প করতে আসত আমার সঙ্গে। মোটরের ভেঁপু শুনলেই ছুটত আবার গেটের কাছে। তখন দু-জন দরোয়ান ফটকের ভারি পাল্লা দুটো দু-দিক থেকে ধরে ঝাঁ করে খুলে দাঁড়াত আর বড় সায়েবদের দেখলেই ঘাড় সোজা করে ঠুকে দিত একটা সেলাম, তারপর ফটক ভেজিয়ে দিয়ে আবার আমার গরাদের সামনে ফিরে এসে আমাকে শোনাতে থাকত ঐ সব বড়-সায়েবদেরই নানা কেচ্ছা। সায়েবদের হাঁড়ির খবর ফটকের এই দরোয়ানদের কাছে।

—ঐ যে লরি গেল বাবু কয়লা বোঝাই হয়ে, ওর কেবল উপর থাকেই কয়লা। নীচে সিরেফ লোহা ভর্তি। হামি দরোয়ান আছি, সাহেবকা সই করা গেট পাস্ দেখে ছেড়ে দিব। হামি আর কি করতে পারি? গিয়া মাহিনা থেকে এমনি চলেছে। পুর-মিল-এ বহুত পুরানো লোহালক্কড় জমা ছিল। সাফ সাফাই করবার জন্যে হেড আপিস থেকে হুকুম এল। বড় সাব লিখে দিল, পচাশ টন ভাঙ্গা লোহা আছে। সব লরি বোঝাই করে কলকাত্তা পাঠিয়ে দিচ্ছি। পচাত্তর হাজার রূপেয়া দাম পেয়ে হেড আপিস খুব খুশ হল। আর এদিকে এক-শ পচাশ টন মাল এই ফটক দিয়ে বেরিয়ে গেল। বড় সায়েবের সঙ্গে বন্দোবস্ত, বিক্রিতে সায়েব দু-লাখ রূপেয়া পাবে। এ ছাড়া আরো বিশ পঁচিশ টন ভাঙ্গা লোহা ইধার উধার ছিপানো আছে। এখন কয়লা চাপা হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

প্রমথবাবু চেয়ার থেকে উঠে আমার গরাদের ধারে এসে দাঁড়ালেন। বললেন—কি বলছিল দরোয়ান জী?

আমি ভাবলুম সেরেছে। প্রমথবাবু নিশ্চয় শুনেছেন সাহেব-নিন্দা। দরোয়ানের আর কি? সে তো প্রমথবাবুর খপ্পরের বাইরে। আমিই পড়লুম ধরা। এইবার জবাবদিহি করতে আমার প্রাণ যাবে—চাকরিই না যায়।

ফটকের বাইরে একখানা মোটর গাড়ির ভেঁপুর পীঁ শব্দ। কোনো সায়েবের গাড়ি আসছে বুঝে দরোয়ানজী ছুটলেন ফটক খুলতে।

আমি বললুম—আজ্ঞে দরোয়ানেরা আবোল-তাবোল কত কী বকে, শুনে যাই। কি আর করব?

—কি, বলছিল কি?

—আজ্ঞে বলছিল ঐ যে কয়লার লরিটা গেল ওতে নাকি কয়লার নীচে লোহা ভর্তি।

—আর তুমি শুনে একেবারে ভয়ে জড়সড় হয়ে গেলে, এই তো? শোনো হে সুকুমার। চটকলে এয়েছ, এখানে তোমার অনেক অভিজ্ঞতা হবে। এ বড় নোংরা জায়গা। পাপে ভরা।

কি জবাব দেব মাথায় এল না। বলে ফেললুম পাপ তো সার সব জায়গাতেই।

—হ্যাঁ কিন্তু এখানকার মতো কোথাও নয়। এ এক ছিষ্টি-ছাড়া রাজ্য। রাজার আইন, পুলিসের আইন, সমাজের বিধি কিছুই এখানে খাটে না। বুঝবে, বুঝবে। বিয়ে থাওয়া করেছ?

আমি ঘাড় নাড়তে বললেন—করোনি? করে ফেল হে তাড়াতাড়ি। চটকলে এয়েছ, কবে কার খপ্পরে পড়ে যাও তার ঠিক কি?

যে গাড়িটার ভেঁপু ফটকের বাইরে শোনা গিয়েছিল সেটা এসে ঢুকল। প্রমথবাবু এক লহমা দেখে নিয়ে বললেন—এই যে এলেন তালেবর ছুটি। চেনো হে ঐ ছোকরা সায়েব ছুটিকে?

আমি বললুম—আজ্ঞে হ্যাঁ, ওঁরা তো নতুন এসেছেন [illegible] রোভিং শেড-এ।

—হ্যাঁ নতুন এসেই তৈরী। বলি, সাহসও তেমনি। বিয়ে-থাওয়া তো করে নি—এই তোমারই মত আর কি—ছুটোতে একই সঙ্গে মাগীকলের পার্বৌতির ঘরে যায়। একটা মর্দ ঘরে ঢোকে আরেকটা বাইরে দাঁড়িয়ে সিগ্রেট ফোঁকে। তবে হ্যাঁ, একা যাবার সাহস ছোকরাদের নেই। পার্বৌতির ছু-তিনটে আদমি আছে, তারা সায়েবদের একা পেলে ছেড়ে কথা কইবে না।

সায়েব-স্নবোদের হাঁড়ির খবর দরোয়ানেরা যত জানে প্রমথবাবু দেখলুম তাদের চেয়েও আরো অনেক বেশী জানেন। আশ্চর্য তাঁর খবর সংগ্রহ করবার ক্ষমতা। এঁদের মুখ থেকে শুনলুম কোন সায়েবকে কে রেফ্রিজারেটার ঘুষ দিয়েছে। কোন ম্যানেজার মাতাল হয়ে ড্রাইভারকে মুখ-খিস্তি করেছিল বলে তার ড্রাইভার রুখে দাঁড়িয়ে গাড়ির স্টার্টিং হ্যাণ্ডেল দিয়ে সায়েবকে ক-ঘা কশিয়ে দিয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রমথবাবু যে-রকম খোলাখুলিভাবে এই সব আমার সামনে বলতে শুরু করলেন তাতে আমি জড়সড় হয়ে যেতুম। কিন্তু প্রমথবাবুর কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই। তাঁর মতে, চটকলে যখন ঢুকেছ, সবাই সমবয়সী!

এই সব শুনি আর চোখের সামনে দেখতে পাই, চটকলের মধ্যে ছুটো বিভিন্ন জগত। ছু-জগতের মানুষগুলো ভিন্ন। কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই। কেউ কারুর জন্মে তোয়াক্কা করে না। ঘৃণাই করে। একদল হচ্ছে চটকলের অধিকার যাদের তারা, আর অন্যদল হচ্ছে যারা অধিকৃত। অধিকৃতের দল অধিকর্তাদের ভয় করে, কিন্তু ভালো চোখে দেখে না। তাই আমার গরাদের ধারে বসে বসে যত ভাবতুম বিভূতিবাবুর মত লোকের পক্ষ নিয়ে সারা কারখানার মজুররা স্ট্রাইক করল কেন, ততই আমার আশ্চর্য লাগত।

স্ট্রাইক জিনিসটাও আমি এর আগে কখনও এত কাছ থেকে দেখিনি। ট্রামের স্ট্রাইক, বাস্-এর স্ট্রাইক দেখেছি। সে ক্ষেত্রে যারা হরতাল করে, সে লোকগুলোকে দেখা যায় না। তারা

কোম্পানীর দরজা পর্যন্তই এসে পৌঁছয় না। কিন্তু কাজ করতে এসে তারপর হাতিয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ানো, যাকে বলে 'সিট ডাউন' স্ট্রাইক, এর চেহারা কেমন যেন বাঁকা, কেমন অস্বস্তিকর। মনে হয়, হঠাৎ যেন কারখানার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। ছুটির দিনে কারখানা যেমন খাঁ-খাঁ করে তেমন তো নয়। লোকজনে রীতিমত গম্‌গম্‌ করছে কারখানা কিন্তু তার আত্মা যেন নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে। কেউ কারুর মুখের দিকে স্পষ্ট করে তাকাতে পারছে না। কে যেন কোথায় একটা দোষ করে ফেলেছে, অথচ কার দোষ কেউ সেটা স্পষ্ট করে বলছে না।

ফিস্‌ ফাস্‌ শব্দে খবর আসতে থাকে। খবরের পর খবর। হেড আপিসে টেলিফোন করা হয়েছে। হেড আপিস বেঙ্গল চেম্বারের সঙ্গে কথাবার্তা কইছে। পুলিস আসবে কি না আসবে, এখনও ঠিক হয়নি।

লেবার অফিসার, সুপারভাইজার উঁকি মেরে চলে গেছেন। ভিতরে ঢোকেন নি—কারুর মুখের দিকে তাকাতেও পারেন নি। মিল ক্লার্ককে সেলস্‌-মাস্টারের ঘরে যেতে দেখা গেছে। সেলস্‌-মাস্টারকে ম্যানেজারের ঘরে ঢুকতে দেখা গেছে। স্বস্তি যেন কোথাও নেই। অথচ এ সবই হচ্ছে কেন? না, বিভূতিবাবুর পিছনে ম্যানেজার সায়েব লেগেছেন। তাতে কার কি? বিভূতিবাবু প্রচুর টাকা করেছেন, তার কতটা সদুপায়ে, কতটা অসদুপায়ে, কেউ জানে না। শুধু জানে সদুপায়ে অত তাড়াতাড়ি অত টাকা হয় না। সুতরাং বিভূতিবাবুর অপদস্থ হবার সম্ভাবনা ঘটলে মজুরদের সহানুভূতি জাগবার কথা নয়। অথচ তাই হ'ল। এটাই আমাকে অবাক করত। কি গুণে বিভূতি-বাবু মজুরদের বশ করেছিলেন, বুঝতে পারতুম না।

আর একটা স্ট্রাইক—তাঁতীদের স্ট্রাইক—সুজিত খুব কাছ থেকে দেখেছিল। সুজিত তখন সবে লেবার দপ্তরে এসে ভর্তি হয়েছে। তাঁতীরা একজোট হয়ে কাজ বন্ধ করে দিল। সায়েব সুপারভাইজার

এসে হুকুম চালাতে যাওয়ায় তাঁতীরা ক্ষেপে গিয়ে ডাণ্ডা মেরে তার মাথা ফাটিয়ে দিল। সেই রক্তাক্ত ব্যাপার, তারপর তাঁতীদের উপর পুলিসের আক্রমণ, ধর-পাকড় এবং তারপর মারধোর করে স্ট্রাইক ভেঙে দেওয়া; এ সব সুজিত নিজ চক্ষে দেখেছে।

সে সব স্ট্রাইকের একটা মানে পাওয়া যায়। নিজেদের পেটের ভাতের জন্যে স্ট্রাইক। কিন্তু এ যে পেট-মোটা স্বার্থপর এক চতুর পিচ্ছিল সরীসৃপের জন্যে স্ট্রাইক। বিভূতিবাবুকে তো আমি হাড়ে-হাড়ে জানি, না-হয় হলেনই আমার চাকুরিদাতা।

চটকলের তাঁতীরা 'পীস্ রেট'-এ মাইনে পায়। মাস-মাইনে নয়, হপ্তা-রোজ নয়, এক-শ ত্রিশ গজ কাপড় বোনো, এক টাকা আট আনা নিয়ে যাও। এক-শ ত্রিশ গজে এক-এক টুকরো। কম বোনো তো, সেই অনুপাতে কম পাবে, বেশী বোনো তো, বেশী পাবে। তাঁতীরা কত গজ কাপড় বুনবে, তা অনেকটাই নির্ভর করবে সুতোর গুণাগুণের উপর। সুতো ভাল হল তো, বোনাও ভাল হল। আর সুতো যদি ছিঁড়তে আরম্ভ করল তো, কাপড়ের গজ কমতে আরম্ভ করল। তাঁতীরা তখন হয়ে ওঠে বিরক্ত। তাদের হপ্তার রোজগারে কম পড়তে থাকে। সুতো ছেঁড়ে কেন? সুতো ছেঁড়ে পাট খারাপ হলে। পাট খারাপ মানে কি? ভাল পাটের সঙ্গে খারাপ পাট মেশানো থাকে অনেক সময়, অথবা পাট হয় ভিজে, অর্থাৎ পাটে জলের পরিমাণ বেশী। ভিজে পাট বড় গণ্ডগোল বাধায়। বাইরে থেকে বোঝবার যো নেই, কিন্তু যারা চেনে, তারা ঠিক চেনে। আর যারা চিনেও চেনে না, তারা নীরব ধূর্ততায় ভিজে পাট মিলের গুদমে এনে জমা করে।

শুকনো পাটের যখন বাইশ টাকা দর, ভিজে পাট মিলবে আঠারো টাকায়। কোম্পানীর হয়ে যিনি কিনবেন, তিনি কোম্পানীকে বাইশ টাকা দরেই কেনাবেন, মাঝখানের চার টাকা ধুরন্ধরের পকেটে আসবে। লক্ষ লক্ষ মণ পাটের কারবারের মধ্যে কত সহস্র মণ ভিজে পাট নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে মিল-গুদমে এসে প্রবেশ করে, তার কোনো

হিসেব নেই। ধরা-ছোঁওয়া যায় না। পাট কখনই শুকনো খড়ের মতো খড়খড় করে না। কিছু জল তাতে থাকবেই। কত বেশী জল থাকলে মিল-এর কাজের পক্ষে গ্রহণীয় হবে না, সেইটেই হচ্ছে আসল। যারা দক্ষ, তারা সবাই সেটা জানে।

আর যারা জেনেও জানে না, যারা ভান করে, পাট শুকনোই আছে, তাদেরই উপর নির্ভর করে গরীব তাঁতী আর গরীব স্পীনারদের হপ্তার রোজগার। এরা ঠিক যে কোন লোক, নাম করে বলা শক্ত, তবে সবাই জানে, উপর থেকে নীচে অবধি অনেকে এর মধ্যে আছে—মাল কেনে যারা, হোমরা-চোমরা চুনো পুঁটি ; মাল বেচার দালাল যারা, হোমরা-চোমরা চুনো পুঁটি।

পাট কেনার মরসুমে সায়েবদের মধ্যে এক ধরণের রহস্যালাপ প্রায়ই শোনা যায়—

—জিমি, হাউ মেনি মওস্ অফ ওয়াটার ইন্ হাউ মেনি সীয়র্স অফ জুট ?—এবার কত সের পাটে কত মণ জল ?

তারপর পাট গুদমজাত হবার কিছুকাল পরেই বোঝা যায়, দরিদ্র পীস্-রেট-এর চট-মজুরদের কপাল পুড়েছে। পটাং পটাং করে সুতো ছিঁড়তে আরম্ভ করে। প্রথমে মনে হয়, স্পিনিং ফ্রেমে কোথাও দোষ হয়েছে। ঠুকঠাক করে মিস্ত্রি সারিয়ে দিয়ে যায়। তারপরও দেখা যায় যথা-পূর্বং। অন্যান্য স্পিনিং ফ্রেম থেকেও অনুযোগ এসে পৌঁছতে থাকে। কথাটা স্পিনিং শেড-এ জানাজানি হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি কিছু ভাল পাট এনে ব্যাপারটা চাপা দেবার চেষ্টা হয়। ততক্ষণে কম-জোরি সুতো তাঁতীদের কাছে পৌঁছে গেছে। তাঁতেও সুতো ছিঁড়তে থাকে। স্পীনারদের চেয়ে স্বভাবত তাঁতীদের মেজাজ একটু রুক্ষ। তাঁতীরা হল চট-মজুরদের মধ্যে আমীরস্থানীয়। তারা গোলমাল শুরু করতে থাকে। হপ্তার রোজগার কমে গেলে কারই বা মেজাজ ভালো থাকে ! এইভাবে শুরু হয় গণ্ডগোল। এইভাবে শুরু হয় ধমক-ধামক। এইভাবে শুরু হয় স্ট্রাইক।

সুজিত বললে—তাঁতীদের স্ট্রাইক এই-ভাবেই হয়েছিল।

আমি বললুম—বুঝলুম। কিন্তু বিভূতিবাবুর ব্যাপারটা? বিভূতি-বাবুর জন্যে মজুররা বিক্ষোভ জানাল কেন?

সুজিত বললে—আমার কি মনে হয় বলব? মিলের মধ্যে যে বড় বড় গলদ আছে, তার জন্যে প্রধানত দায়ী সাহেব বড় কর্তারা, এটা মজুররা আজকাল বুঝতে শিখেছে। লরি-কন্ট্রাকটের মধ্যে যদি কিছু গলদ থাকে তার দায়িত্ব হারিচ সায়েবের। হারিচ সায়েবই বিভূতি-বাবুকে ঐ পদে বসিয়েছেন। ম্যানেজারের আসল অনুযোগ লরির কন্ট্রাক্ট নিয়ে। সেখানে হারিচ সায়েবকে বাদ দিয়ে ম্যানেজারের রাগ পড়ল বিভূতিবাবুর উপর। রাগ করলেও লরি-কন্ট্রাক্ট নিয়ে তিনি বিভূতিবাবুকে কিছু করতে পারলেন না। কারণ আঁটঘাট বেঁধে সমস্ত কারবারটা ফাঁদা হয়েছে। আঁটঘাট বেঁধেছেন হারিচ সায়েব নিজেই। তারপর লরি-কন্ট্রাক্ট ছেড়ে ম্যানেজার ধরলেন রেশনিং-এর চুরি। সেখানেও আসল দোষীকে বাদ দিয়ে বিভূতি-বাবুকে করলেন 'মুক্তি ছাগ'। হারিচ সায়েবের [illegible] নীরব অনুমোদন তো এর পিছনে রয়েছে—না হলে বিভূতিবাবু কি দাঁড়াতে পারেন?

কাজেই এই সমস্ত ঘোরালো এবং নোংরা ব্যাপারটাই মজুরদের কাছে ন্যক্কারজনক লেগেছে। বিভূতিবাবু ঘুরে ঘুরে একদিনের মধ্যেই ব্যাপারটা সকলকে বেশ পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। কিছুই তিনি গোপন রাখেন নি। নিজের রোজগারের কথা বলেছেন। নিজের অর্থাগমের পিছনে প্রধানত কার শক্তি কার্যকরী হয়ে আছে, তা-ও বুঝিয়ে দিয়েছেন। বোঝাতে কিছু বাকি রাখেন নি। তাঁর কৃপায় ওয়ার্কস কমিটির সভ্যদের যে সব আত্মীয় বন্ধুরা কারখানায় চাকরি পেয়েছিল, তারাও খুব সুন্দর করে সবটা সকলকে জানিয়ে দিয়েছে। ফলে বিভূতিবাবু সকলের চোখে ঘৃণ্য জীব হয়েও আজ আর নেহাত ঘৃণিত নন। সকলে যেন এক নতুন চোখ দিয়ে দেখছে

তারা হঠাৎ কারখানার-উপর-তলাকার পাঁক—আর মলিনতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে।

আমি বললুম—বুঝেছি। আসলে সমস্ত ব্যাপারটার নোংরামির বিরুদ্ধে স্ট্রাইক। নিজেদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে নয়।

সুজিত বললে—ঠিক তাই।

তারপর খানিকটা থেমে বললে—এটা নতুন নয়। আগেও হয়েছে। আসল দোষী যেখানে বড়কর্তারা, শাস্তি দেবার বেলা চুনোপুঁটিগুলোকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। উপায়ই বা কি? বড়দের সব সময় সব রকম ত্রুটি-বিচ্যুতির ঊর্ধ্বে না রাখলে কারখানার ভিত্ নড়ে যাবে যে। সাধারণের চোখে কি বড়দের হেয় করা যায়? তুমি আসবার কিছুদিন আগে হয়েছিল—প্রমথবাবুর কাছে শুনেছি। এখনকার যে সেলস্-মাস্টার দেখছ, তিনি তখনও এসে পৌঁছন নি। পুরোনো সেলস্-মাস্টার শোনা গেল, লম্বা ছুটি নিয়ে বিলেত যাবে। বাড়ি ফেরবার আগে লোকটার লোভ আর চৌর্যবৃত্তি শয়তানের মত বেড়ে উঠল। কত রকম কত বিচিত্র দালাল যে সায়েবের বাংলোয় যাওয়া আসা করতে লাগল তার আর ঠিক নেই। বাঙালী, মাড়োয়ারী, ফিরিঙ্গী, সব কিছু।

একজন বাঙালী দালাল ভদ্রলোককে সায়েব বলছেন শোনা গেল—লুক্ বাবু তুমি বহুদিন আমার মেম-সায়েবের সঙ্গে দেখা করতে যাওনি।

বাঙালী ভদ্রলোক সেইদিনই মেম-সায়েবের সঙ্গে দেখা করে এলেন। এবং তার পরদিন দেখা গেল তিনি বগলে একটা প্যাকেট নিয়ে সায়েবের বাংলোয় ঢুকছেন।

দরোয়ান বেহারারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলে, মেম-সাহেব দালালবাবুকে একখানা সিল্কের শাড়ি এনে দিতে বলেছিলেন, তিনি কেটে গাউন করবেন বলে, কিন্তু দালালবাবু যে শাড়ি এনে দিয়েছেন তার রং মেম-সায়েবের পছন্দ হয়নি।

তার দু-দিন পরে দালালবাবুকে আবার দেখা গেল বগলে আরো একটা প্যাকেট নিয়ে সেল্‌স্‌ মাস্টারের বাংলোয় ঢুকতে। এবারে যখন বেরিয়ে এলেন, দরোয়ানের কাছ থেকে শোনা গেল এবারকার শিফনের শাড়ির রং মেম-সায়েবের বহুত্‌ পসন্‌ হয়েছে বটে কিন্তু তাই বলে তিনি তাঁর পছন্দ-না হওয়া আগেকার শাড়িটা ফেরত দেননি।

যাই হোক, এই ভাবে অনেক কিছু বাগিয়ে নিয়ে সেল্‌স্‌-মাস্টার তো বিদায় হলেন। তার জায়গায় এলেন নতুন সেলস্‌ মাস্টার।

ছিলেন আগে জুট ক্লার্ক তার থেকে মিল ক্লার্ক। এইবার সেলস্‌ মাস্টার। ছুঁদে সায়েব। এ দেশে আছেন অনেক দিন। চারিদিকে কড়া নজর। বিশেষ করে নেটিভগুলোর উপর। নেটিভগুলো সব চোর, ঘুষখোর ভাল রকমই জানেন।

পাট গুদমের দরজা খুলে মাল পরীক্ষা করতে ঢুকলেন। মাল দেখে তো চক্ষুস্থির। রদ্দি পাটে গুদমের আধখানাই ভর্তি। রীতিমত জলো পাট, এ পাট কলে ফেললে কলই চলবে না— মিস্ত্রিরা তো ক্ষেপেই যাবে। অনেক হাজার টাকা খেয়েছে যারা এ পাট গুদমে ঢুকিয়েছে—লক্ষ টাকা হলেও আশ্চর্য নয়। অভিজ্ঞ জুট ক্লার্ক তিনি, সবই বোঝেন। সঙ্গে সঙ্গে গুদম ঘরের মালবাবুদের নামে চার্জ-শীট করলেন। তিনজন মালবাবু, তাঁরা এই চক্রান্তের মধ্যে ছিলেন সন্দেহ নেই—টাকাও খেয়েছেন প্রত্যেকেই, কিন্তু আসল ঘুঘু যে সেই তো উধাও। আগেকার সেলস্‌ মাস্টার— তিনি বিলেতে গিয়ে বসে আছেন। শোনা গেল তিনি বোধহয় আর ফিরবেন না। যা বাগিয়ে গেছেন তাতে করে ফিরে এসে আরও কিছু বাড়িয়ে নেবার প্রয়োজন হবে না।

মালবাবুরা কিন্তু চার্জ শীট পেয়ে ঘাবড়ালেন না। তাঁরা 'রেসপেক্‌-টেড সার্‌' বলে মস্ত এক চিঠি দিলেন সেলস্‌ মাস্টারের নামে— তলায় তিনজনই সই করলেন। ভুল-তাল ইংরিজী লিখলেও তাতে যে-সমস্ত ইঙ্গিত দিলেন এবং যে সমস্ত সই-করা কাগজপত্র তাঁদের

কাছে আছে বলে জানালেন তাতে করে বোঝা গেল রশি ধরে টানলে চুনোপুঁটি থেকে রাঘব বোয়াল অনেকেই এতে জড়িয়ে পড়বেন। এবং এই নাট্যের প্রধান নায়ক যিনি, তিনি স্পষ্টতই কোম্পানীর খপ্পরের বাইরে বিলিতী ঠাণ্ডা হাওয়া খেয়ে বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

চার্জ শীট ফিরিয়ে নেওয়া হল। নতুন সেলস্ মাস্টার ধীরে ধীরে চটকলের আইনকানুন রীতি-নীতির সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হতে থাকলেন। বুঝতে শুরু করলেন যে, তিনি যত বড় শক্তিশালী, যত বুদ্ধিমান, যত দুর্ধর্ষ উপরওয়ালা হন না কেন, চটকলে সুখে এবং স্বস্তিতে থাকতে গেলে মানিয়ে চলতে হবে এমন অনেকের সঙ্গে যাদের হয়তো তিনি কোনদিন চর্মচক্ষে দেখেননি। যাদের অদৃশ্য প্রভাব চটকলের দেয়ালে, কড়িকাঠে, দরজায়, চৌকাঠে চটচটে হয়ে লেগে আছে। এরা সব চটকলের পূর্বপুরুষ—পাটের আঁশ থেকে সোনার চাদর বুনে নিয়ে চলে গেছে কবে স্কটল্যাণ্ডে, ডাণ্ডিতে, গ্লাসগোয়, কিন্তু তাদের অদ্ভুত করিৎকর্মতা, টাকার উপর টাকা, ধনের উপর ধনকে শুষে নিয়ে যাবার অবিশ্বাস্য ক্ষমতার ইতিহাস চটকলের বাতাসকে যাদু করে রেখে দিয়ে গেছে। এর বন্ধন কেটে বেরিয়ে আসা একরকম প্রায় অসম্ভব।

॥ নয় ॥

হিরোশিমা আর নাগাসাকির উপর এটম বোমা ফেলে সারা দুনিয়াকে সচকিত করে দিয়ে হঠাৎ একদিন মহাযুদ্ধের অবসান ঘটল। এতদিন পরে মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। সায়েবরা আর এক দফা নাচলেন, গাইলেন আর মদ্যপান করলেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন মানুষ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল অন্যদিকে যুদ্ধের মরসুমে যাঁরা দু-পয়সা কামাচ্ছিলেন তাঁদের সুদিন

রইল না। এর মধ্যে পড়লেন বিভূতিবাবু। দেশে বিরাট কারবার করেছিলেন ভাইপোদের নামে। পর পর পাঁচ মেয়ে বিভূতিবাবুর। ছেলে চেয়েছিলেন, কত মানত আত্তি করেছিলেন, হয়নি। ভাই-পোরাই ছিল ভরসা। ভাইপোরাই দেখত কারবার। কারবার থেকে টাকা সরানো আর রেস খেলে ওড়ানো অভ্যেস ছিল ভাই-পোদের। কারবারের আয়ের প্রধান উৎস ছিল যুদ্ধের অর্ডার। যুদ্ধের অবসানে যখন হঠাৎ ফাট ধরল কারবারে তখন দেখা গেল কোনো দিক দিয়েই কিছু সামলাবার উপায় নেই। যাদের উপর নির্ভর করেছিলেন তারাই ঠকিয়ে এসেছে এটা এতদিনে বুঝলেন বিভূতিবাবু। ভাঙা মন নিয়ে দেশে ফিরে গেলেন। কারবারের ঋণ শোধ করতে প্রায় সর্বস্বান্ত হলেন। তারপর আর সে মন তাঁর জোড়া লাগল না। চটকলে আর তিনি ফিরলেন না।

যাই হোক, বিভূতিবাবু রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নেবার আগে আমার জন্যে যে ব্যবস্থা করে দিয়ে গেলেন তার জন্য আমি তাঁর কাছে চিরদিনের মত ঋণী রয়ে গেলুম। আমি তাঁর কে? কেউই তো নই, অথচ আমার হয়ে দু-দুবার তিনি যে উপকার করে দিয়ে গেলেন তা আমার কোনো পরমাত্মীয়ও করেনি। এর কোনো সদ্‌যুক্তি আমার মাথায় আসেনি। যা মনে হয়েছে তা হচ্ছে মনুষ্য-চরিত্রই এমনি বিচিত্র! বিভূতিবাবুকে শেষ দেখেছি একদিন যখন তাঁর দেশে গিয়েছিলুম দেখা করতে। তিনি তখন তাঁর বাড়ির পুকুরধারে পালং শাক আর বেগুন চারা লাগাচ্ছেন। ঐ নিয়ে আছেন তখন।

চটকলের রীতিনীতি আইনকানুনের সঙ্গে আমার ঘটতে থাকল নিবিড়তর পরিচয়। চটকলের জগতকে চিনতে শিখলুম। শুধু জগদ্দল শ্যামনগরেই বড় বড় এগারোখানা চটকল। চল্লিশ হাজার

মজুর তাতে কাজ করে। আট হাজার তাঁত চলে। এই আট হাজার তাঁতের আট হাজার তাঁতী কোন দূর দূরান্তরের দেশ থেকে এই জগদ্দল-শ্যামনগরে এসে বাসা বেঁধেছে। তারপর শুধু জগদ্দল-শ্যামনগরেই তো নয়, উত্তরে ভাটপাড়া, নৈহাটি, দক্ষিণে টিটাগড়, আগরপাড়া, কামারহাটি, বরানগর, নারকেলডাঙ্গা, আরো দক্ষিণে গার্ডেনরীচ, বজবজ পর্যন্ত সারি সারি চলেছে চটকলের পর চটকল। গঙ্গার ওপারেও একই দৃশ্য। চন্দননগর গোঁদলপাড়া থেকে শুরু করে ভদ্রেশ্বর, হুগলী, বৈদ্যবাটি, শ্রীরামপুর, রিষড়ে, বালী, বেলুড়, ঘুষুড়ি, হাওড়া, শিবপুর, সাঁকরেল, উলুবেড়ে পর্যন্ত গঙ্গার বিস্তৃতি ধরে কিছু কিছু দূর অন্তর শুধু চটের কল আর তাদের বড় বড় চিমনি। কলকাতাকে কেন্দ্র করে গঙ্গার দু-ধারে চল্লিশ মাইল এই ছবি। এক-শ খানা কল গঙ্গার দু-পারে যেন মালার মত একসূত্রে গাঁথা। ধৃতরাষ্ট্রের এক-শ ছেলে। তিন লক্ষ মানুষ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পাট থেকে তন্তু, তন্তু থেকে চটের কাপড় করে চলেছে দিনের পর দিন মাসের পর মাস। এর কোনো বিরতি নেই। বারো মাসে এরা তৈরী করে তিন-শ কোটি গজ কাপড়। দু লক্ষ মাইল লম্বা। সমান করে পেতে দিলে আটবার পৃথিবীকে এ-পিঠ ও-পিঠ বেড়ে ফেলা যায়। এই এক-শ চটকল এক-শ কৌরবের মত একই পরিবারের—একই তাদের রূপ; অদ্ভুত তাদের মিল। তাদের জঠরের মধ্যে যেমন গাঁট-বাঁধা হাজার হাজার মণ পাট প্রতিনিয়তই ঢুকছে আর চটের থলি, চটের থান হয়ে বেরিয়ে আসছে, তেমনি মানুষগুলোও সকালে নরম পাটের মত ঢুকে সন্ধ্যায় চেপ্টা চেপ্টা চটের থলির মতো ঝাঁঝরা হয়ে বেরিয়ে আসে। এদের এক ধারায় চালাবার জন্যে আছে এদের সংঘ—বিখ্যাত চট-সংস্থা। আমাদের মত কেরানীরা, আমাদের বড়বাবুরা এবং তাঁদের উপরের দেশী অফিসাররা এই সংস্থাকে যেমন ভয় করে তেমনি ভক্তিও করে। মনে মনে

আমরা জানি যে এই সংস্থা আর যেখানে এই সংস্থা স্থাপিত, সেই -তারাই ছ আমাদের দণ্ডমুণ্ডের অসীম ক্ষমতা এই সংস্থার আর এই বেঙ্গল চেম্বারের। স্বয়ং সরকার বাহাদুরের সঙ্গে, গভর্ণর, ভাইসরয়ের সঙ্গে এরা কথা বলে, আলোচনা করে। এদের পরামর্শ না নিয়ে দেশে নতুন কোনো আইনই প্রবর্তন হয় না। পাটের উপর, চটের উপর শুল্ক বেঁধে দেবার দায়িত্ব সরকারের হলেও এরাই ভিতর থেকে অনেক কিছু নির্ধারণ করে দেয়। মিল পুরো চলবে, কি আধা চলবে, কি সিকি চলবে এরাই ঠিক করে। কাঁচা পাটের দাম বেশী চড়লে বা মজুরেরা বেশী মাইনের দাবি জানালে কি করে তা কমাতে হবে তার ব্যবস্থা এরাই করে। এই যে আমরা মাসে-মাসে মাগ্‌গিভাতা পেয়ে সংসারের অকুলান কোনো রকমে মেটাতে পারছি এ-ও তো বেঙ্গল চেম্বারেরই দয়ায়।

দূর থেকে শুনি এই বেঙ্গল চেম্বারের দাপটের কথা, তাদের অদ্ভুত কর্মতৎপরতার কথা, তাদের অবারিত ক্ষমতার লুক্কায়িত আধারের কথা আর ভয়ে কাঁপি। সুজিত বিশ্বাস করে না, কিন্তু আমাদের এই জগদ্দলের চটকলের অধিকাংশ বাবুই বলে থাকেন— সরকার বাহাদুর বাইরে যতই ভড়ং করুক, দেশ শাসনের ভার, দেশ চালানোর ভার, দেশ গঠন এবং দরকার হলে নিষ্পেষণের ভার আসলে এই বেঙ্গল চেম্বারের আর এদের মতো আর যত চেম্বার আছে তাদের উপর। মোট কথা চটকলের বাবু আমরা— আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেই চট-সংস্থাকে আমাদের ভাগ্য-বিধাতা বলে মানি। সংস্থা থেকে সায়েব হোক দেশী হোক যে-কোন প্রতিনিধি যে-কোন কর্মচারী আমাদের চটকলে যে-কোন কারণেই আসুন না কেন, আমরা ভয়ে ভক্তিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াই, তাঁদের খাতির করতে পথ পাই না।

চট-সংস্থার দৃষ্টি প্রখর। কিছু তার চোখ এড়িয়ে যাবার যো

নেই। এক-শ খানা চটকল দৈনিক ক-ঘণ্টা ক-মিনিট কাজ করবে তা বেঁধে দিয়ে সে চুপ করে বসে থাকে না। থেকে থেকে হঠাৎ ইন্সপেক্টার পাঠায় দেখে আসতে কল ঠিক সময় চালু ঠিক সময় বন্ধ হচ্ছে কি না। সংস্থার যে-সব লেবার অফিসার তাঁরাই এই ইনস্‌পেকশানের কাজ করেন। কোনো বিশেষ কার-কারখানা নিজে বেশীক্ষণ কল চালিয়ে নিজে লাভবান হলে সেই অনুপাতে অন্য কারখানার ক্ষতি। তাই এই সাবধানতা। দেখতে হয় বেশী কাজ করে সংস্থার এক সভ্য আরেক সভ্যকে ঠকাচ্ছে কি না। সংস্থার ইনসপেক্টার খবর না দিয়েই সকাল বেলা হঠাৎ এসে হাজির হলেন ঝকঝকে গাড়ি করে। মোটা মাইনের ইনস্‌-পেক্‌টার—হাতে তার বহুমূল্য ঘড়ি রেডিওর টাইমের সঙ্গে মেলানো। কাঁটায় কাঁটায় আটটা বাজতে পনের মিনিটে এসে তিনি উপস্থিত হয়েছেন—যে সময় কল চালু হবার কথা। এসে যদি দেখেন কল এক মিনিট কি দু-মিনিট আগেই চালিয়ে দেওয়া হয়েছে তা হলে রিপোর্ট চলে যাবে। প্রতি মিনিটে প্রতি তাঁতের জন্যে আট আনা এক টাকা করে জরিমানা।

সংস্থার আরো কাজ আছে। সজাগ তার দৃষ্টি। সব সময় সে খবর নিয়ে চলেছে বিশ্বের বাজারে চটের চাহিদা বাড়ছে না কমছে। বাড়লে কত বাড়ছে কমলেই বা কত। কারখানায় কত চট উৎপাদন হলে বিক্রির বাজারে চটের দামটা লাভজনক দাঁড়াবে, হেশিয়ানের বাজার খারাপ হলে স্যাকিং বেচে সেটা পুষিয়ে নেওয়া যায় কি না আর স্যাকিং এর চাহিদা কমে গেলে হেশিয়ান উৎপন্ন করে বাজারকে কতখানি আয়ত্তে রাখা যায় এই সব সুক্ষ্ম হিসেব করা চলেছে সর্বক্ষণ। এক-শ খানা চটকলের গুদমে কত মাল মজুদ আছে, কতখানি তার বিক্রি হয়ে গেছে, কোন কোন মাসে কতখানি বিক্রি মাল রপ্তানি করতে হবে, কি রকম দামে কোন মাল 'ফর-ওয়ার্ড সেল' হয়েছে এই সব খবর সংস্থাকে রাখতে হয়। দেশে

কত পাট উৎপন্ন হচ্ছে, কলকাতার বাজারে কত পাট এসে পড়ল, মফঃস্বলেই বা কত রয়ে গেল। কত পাট কাঁচা গাঁটে বাঁধা হচ্ছে, কত পাট পাকা গাঁটে বাঁধা হয়ে রপ্তানি হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, সব খবর সংস্থার আপিসে এসে জমা হয়।

আমেরিকা, ইংলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া বড় বড় চটের খরিদ্দার। সেখান থেকে প্রতিনিয়ত তারে বেতারে খবর আসছে তাদের বাজার উঠছে কি নামছে। এইসব খবর গুছিয়ে গাছিয়ে রাখবার জন্যে বিরাট স্ট্যাটিসটিকাল দপ্তর আছে সংস্থার। এই দপ্তরই সংস্থার কর্তাদের নির্ভুল পথ দেখিয়ে দেয়। মন্ত্রণা দিয়ে দেয় কখন কি করতে হবে। প্রত্যেক চটের কারখানার কাছ থেকে কত রকম স্ট্যাকিস-টিকস আর হিসাবই যে এরা চেয়ে পাঠায় তার ইয়ত্তা নেই। মজুদ চটের হিসাব, মজুদ পাটের হিসাব, ফরওয়ার্ড সেল-এর হিসাব, উৎপাদনের হিসাব, তৈরী মাল রপ্তানির হিসাব, কাঁচা মাল আমদানির হিসাব, মজুরদের মাইনের হিসাব, কোন বিভাগ কতখানি কাজ করল তার হিসাব, সমস্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। কতখানি মিহি চট, কতখানি হেশিয়ান, কতখানি মোটা চট, কতখানি স্যাকিং, ওয়েবিং, কার্পেট, সব জানা চাই। কারখানার ম্যানেজার থেকে বাবুরা পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে হিমসিম খেয়ে ওঠে। এত হিসেব, এত স্ট্যাটিস-টিকস কেন রে বাপু? কিন্তু না বলবার সাহস নেই কারুর, বেঁকে দাঁড়াবার উপায় নেই। চট সংস্থার হুকুম মানতেই হবে।

এইসব হিসেব নিয়ে সূক্ষ্ম বিচার করে সংস্থা প্রতি দু-মাস, তিন-মাস, ছ-মাস অন্তর চট উৎপাদনের হার বেঁধে দেয়। হুকুম আসে হপ্তা এয়ত ঘণ্টা এত মিনিট কারখানা চালু থাকবে— তার একরত্তি বেশী চালাবার যো নেই।

আরো আছে। হঠাৎ শোনা গেল আমেরিকা থেকে গত কয়েক মাস হেশিয়ানের সন্তোষজনক অর্ডার আসে নি আর অষ্ট্রে-লিয়া থেকে স্যাকিং-এর অর্ডারও কম আসবে বলে মনে হচ্ছে।

কারখানার গুদমে গুদমে মজুত হেশিয়ান, মজুত স্যাকিং এমনিতেই বেশী, তার উপর চটের দর বাজারে পড়তে আরম্ভ করেছে। এর পর চাহিদা কমেছে জানাজানি হলে আরো পড়বে। তবে কে জানে, হয়তো আমেরিকান বুদ্ধি—সস্তায় হেশিয়ান স্যাকিং কেনবার এই এক ফিকির। কিন্তু ভারতের চট সংস্থাই বা ছাড়বে কেন? বাজারে চটের দাম পড়ে গিয়ে যাতে লোকসানে না দাঁড়ায়, মজুত চট শেষে পড়তার চেয়েও কম দামে না বেচে ফেলতে হয়, এইসব ভেবে চলতে হয় সংস্থাকে আগে থেকেই। তাই থেকে থেকে সংস্থাকে ঠিক করতে হয়, কি করে উৎপাদন কমানো যায়। সংস্থার প্রধান সভ্যেরা দ্রুত নোটিসে মিটিং ডাকেন। মিটিং করে ঠিক করে নেন যার যেখানে যত হেশিয়ান তাঁত আছে তার হয়তো শতকরা পনেরটা বন্ধ করে দিতে হবে। স্যাকিং তাঁতও বন্ধ করে দিতে হবে শতকরা দশ ভাগ। অমনি চট সংস্থার ইন্সপেক্টররা ছুটলেন কারখানায় কারখানায় দেখে আসতে হুকুম তামিল হয়েছে কিনা—ঠিক গোনা গুনতি শতকরা পনেরখানা করে হেশিয়ান, দশখানা করে স্যাকিং তাঁত বন্ধ হয়েছে কি না। একটি তাঁত এদিক ওদিক হবার উপায় নেই। বন্ধ হওয়া প্রত্যেকটি তাঁত লোহার তারে বেঁধে মোহর করে দেওয়া হবে। ইন্সপেক্টর এসে দেখে যাবেন শীলমোহর ঠিক পড়েছে কি না।

থেকে থেকে হঠাৎ এইভাবে যখন কারখানার উৎপাদন স্রোত কমিয়ে দেওয়া হয়, সেই সঙ্গে মজুর মিস্ত্রীদের চাকরিও যায় চলে। দলে দলে মজুর বেকার হয়ে বসে থাকে, আধপেটা খেয়ে, ধার করে, পরের খেয়ে দিন চালায়, আবার কবে পুরো মিল চালু হবে এই আশায়। এসব মজুরদের অভ্যেস হয়ে গেছে। চটকলের চাকরির হালই এই। আজ আছে, কাল নেই। দুনিয়ারই এই রীতি, কাজেই ক্ষোভ করে হবে কি?

তবু আশ্চর্য, বদলির খাতায় নাম লেখাবার জন্যে প্রতিদিন

কুলিদের যা ভিড় হয় তা দেখবার মতো। চটকলে দু-ধরণের মজুর একদলকে বলা হয় স্থায়ী। স্থায়ী বলতে মনুষ্য ভাষায় যা বোঝায় এদের চাকরি অবশ্যই তা নয়, শুধু বদলিওয়ালাদের চেয়ে এদের চাকরিটা সামান্য একটু পাকা, এই যা তফাত। স্থায়ী মজুরদের সংখ্যা যতদূর সম্ভব কম রাখলে চলে তাই রাখা হয়। তারপরই হচ্ছে বদলি দলের অপার বাহিনী।

চটকলের মজুররা দেশ ছেড়ে এতদূরে গতর খাটাতে যে এসেছে, কিছু পাবে বলেই তো এসেছে? অনেক দুঃখে দেশ ছেড়ে আসে তারা। গ্রামে যারা তাঁত চালিয়ে খেত তাদের তৈরী মালের বাজার গেছে মন্দা হয়ে। যে সুতো কিনে তাদের কাপড় বুনতে হয় তার দাম গেছে চড়ে। কাপড় বুনে বাজারে ছাড়তে গেলে পড়তাই পোষায় না। হাতে-বোনা কাপড়ের ব্যবসা তাই বন্ধ। পেট চলা দায়। জাত-ব্যবসা বন্ধ করে তাঁত গুটিয়ে মাচায় তুলে রেখে চলে এসেছে এরা চটকলে চাকরির ধান্ধায়। এমনি করে এসেছে ক্ষেতমজুর। যে বছর সুবৃষ্টি হল, ক্ষেতে ফসল ধরল, সে বছর ক্ষেত খামারে কাজ পাওয়া গেল। যে বছর অনাবৃষ্টি সে বছর কাজ নেই, রোজগার নেই, অনাহারে কাটাতে হল হয়ত দিনের পর দিন। গ্রামে থেকে করবে কি এরা? তাই চলে এসেছে। যত রকম গরিব দুঃখী আছে গ্রামে সবাই এসে জুটেছে এখানে। হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে এরা। জন্তু জানোয়ারের মত গাদাগাদি করে পড়ে থাকে টিটাগড়, জগদ্দল, মেটেবুরুজ, আন্দুল, সাঁকরেল-এর বস্তির খুপরি খুপরি ঘরগুলোর মধ্যে। গ্রামের যে-জীবনে এরা অভ্যস্ত ছিল তার সঙ্গে তুলনাই হয় না। গ্রামের অবস্থা ক্রমে খারাপ হয়েছে বলে এসেছে সব। লোভে পড়ে এসেছে—ভয়-মিশ্রিত লোভ—শহরে যাবার লোভ, নতুন জীবনের লোভ, কিছু সাশ্রয়ের লোভ। কুলি-সর্দাররা এই সব লোভ দেখিয়ে তাদের নিয়ে এসেছে। কিন্তু দেশের টান এদের সবারই আছে। কিছুদিন কারখানায় কাজ

করেই দেশে ফেরবার জন্যে এদের মন ব্যাকুল হয়। ছ সাত আট মাস কাজ করলেই কিছু রসদ এদের জমে। তখন ছটফট করে দেশে যাবার জন্য। বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ দূর তো বড় কম নয়! তবু চলে যায় তারা দলে দলে। কারখানা খালি করে দিয়ে চলে যায়। সেই সময় চটকল চালু রাখবার জন্যে দরকার হয় বদলি মজুরের। কিন্তু যত যায়, যতই যাক না কেন, তাদের স্থান পূরণ করবার জন্যে বদলি মজুরের অভাব কোনোদিন হয়নি। সর্দারেরা সব সময় চটকলের চতুস্পার্শ্ব বেকার বদলি মজুরের অবারিত স্রোতে ভরে রাখতে পেরেছে। এ অভাগা দেশে আধপেটা ভাতের জন্যেও গতর খাটাবার লোক চিরকালই এত আছে যে, চটের কলের সংখ্যা গঙ্গার দু-ধারে যত বেড়েছে সেই সঙ্গে বাংলা আর বাংলার বাইরের যত কটা প্রদেশ আছে সব জায়গা থেকে বুভুক্ষু মানুষের দল বৃহত্তর কলকাতায় ভিড় করে এসেছে।

প্রথম প্রথম বদলি মজুরের দরকার পড়লেই কুলি-সর্দাররা যোগান দিত। কালক্রমে প্রচুর বদলি কুলি যখন এসে পড়ল কলকাতার আশে পাশে এবং এতগুলো অসহায় লোকের ভাগ্য কুলি-সর্দারদের হাতেই থাকুক এটা যুক্তিযুক্ত মনে হল না; জানা গেল শুধু বদলিওয়ালাদের চাকরি জুটিয়ে দিয়ে, অন্যায় কমিশন খেয়ে এবং ঐ অভাগাদের আধপেটা আহারের উপর ভাগ বসিয়ে সর্দারেরা প্রচুর বিত্তের অধিকারি হচ্ছে, তখন ক্রমে সর্দারি প্রথার বদলে বদলির খাতা চালু হল। বদলিরা এসে কারখানার খাতায় নাম রেজেষ্টি করাতে লাগল। একটা নিয়ম আর শৃঙ্খলা আনবার চেষ্টা হল যাতে করে বদলিরা নিজের দাবিতে কাজ পায়, সর্দারের ইচ্ছার পুতুল হয়ে না থাকে। তারপর এই বিরাট বেকার বাহিনী প্রতিদিন হাজিরা দিতে লাগল বদলি বাবুর খাতার সামনে কাজ আছে কিনা তারই খোঁজে। কোনো নিশ্চয়তা নেই কাজের, একটু ক্ষীণ আশা মাত্র। এই আশায়

ভর করে দিনের পর দিন হাজিরা দেওয়া। এই আশাটুকুর উপর নির্ভর করে দূর দেশ ছেড়ে দেনা করে কারখানার আশপাশের মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকে এরা।

আমাদের কারখানায় এমনি দেখতুম কত যে লোক আসত! বেশীর ভাগই বিহারী। কিছু কিছু উত্তর প্রদেশ থেকে। দীন তাদের বেশ, বিহ্বল অসহায় তাদের দৃষ্টি। দূর গ্রাম ছেড়ে, ক্ষুধার তাড়নায়, যেন ভিক্ষে করতে বেরিয়েছে। কে তাদের এ পথ দেখিয়ে দিত, কে তাদের প্ররোচিত করত কে জানে? কুলি সর্দারেরা কত লোককে এইভাবে মিছে কথা বলে, মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে এখানে এনে ফেলেছে। তারপর একবার এখানে এসে পড়লে আর ফেরবার পথ নেই। মায়া-টানে সব আটকা পড়ে যায়। অদ্ভুত এখানকার আবহাওয়া, এখানকার পরিগঠন। এক অদৃশ্য আকর্ষণ টেনে ধরে এদের। বার বার দেশে ফিরে গিয়েও আবার বারবার এরা ফিরে আসে। গঙ্গার কোলে চটের কারখানা এমনি করে প্রায় চার লাখ মানুষকে ভুলিয়ে রেখেছে। এই চার লাখের মধ্যে তিন লাখ মানুষ কলে খাটে আর বাকি যারা তারা অভিভূতের মত—ভূতের মত বললেই আরো উপযুক্ত হয়—চট কারখানার চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়।

বদলি মজুর হল যাদের নাম খাতায় উঠেছে। যারা অপরের জায়গা সাময়িকভাবে খালি হলে সেই জায়গায় হপ্তা-খাটবার দাবি রাখে। মজুরদের মাইনে হপ্তা হিসেবে, সেই অনুসারে বদলিরাও হপ্তা হিসেবে মজুরি পায়। হপ্তা হিসেবে মজুরি পাওয়া মানে মজুর বলে গণ্য হওয়া—ধাপে ওঠা। চটকলের মজুর সমাজেও ধাপ আছে। স্থায়ী যারা তারা হল উপরের ধাপের। বদলী যারা তারা নীচের ধাপের। কিন্তু কোনো ধাপেরই নয়, এমন মজুরত্বকামী বহু আছে। হাজারে হাজারে তারা মধুকে ঘিরে মৌমাছির মত কারখানার আনাচে কানাচে হন্যে হয়ে ঘোরে কাজের চেষ্টায়। এদের মধ্যে হঠাৎ যারা একদিন কি দু'দিন কি তিন দিন কাজ পেয়ে যায় তাদের বলা হয়

ক্যাজুয়াল লেবার। কাজ পাক আর নাই পাক কাজের তৃষ্ণা নিয়ে এই আর এক বিরাট বাহিনী ভেসে বেড়ায় চটকলের অন্তরীক্ষে। প্রত্যেকেই চায় ধাপে উঠতে। নির্জলা বেকার যারা তারা হতে চায় ক্যাজুয়াল লেবার। ক্যাজুয়াল লেবার হেঁটে হেঁটে পায়ের পাতা ক্ষইয়ে ফেলে একটা ক্ষণিক বদলির কাজ পেতে। আর বদলির কাজ যে একবার করেছে যতদিন না সে স্থায়ী মজুর হয়ে মজুর সমাজের শীর্ষে উঠছে ততদিন তার ঘুম নেই।

মজুরের ভাবনা চটকলের নেই। গুড় ছড়ালেই গন্ধে এসে পড়বে মৌমাছি। চিরদিন এই হয়ে এসেছে। হয়তো যতকাল চটকল থাকবে কোনোদিন তাদের সস্তা দরের মজুরের অভাব হবে না। গঙ্গার তীরে কলকাতার উত্তরে প্রথম যুগে যখন চটকলগুলো তৈরী হচ্ছে ঠিক সেই সময় ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে লোহার লাইন্ন পেতে কলকাতাকে জুড়ে দিল বিহারের সঙ্গে। সেই লাইন ধরে দলে দলে পিঁপড়ের মত বিহারী মজুর ভিড় করে এল চটকলে। কেন এল কেউ জানে না। শুধু এইটুকু জানা আছে যে, চটশিল্প-জগতের প্রথম বাঁধা পথে প্রথম যাত্রী বিহারী মজুর। রেল লাইনের ইস্পাতের জোড়া সাঁড়াশি দিয়ে সেই যে প্রথম টানে চটের কারখানা উপড়ে এনেছিল বিহারের মাটি থেকে মানুষগুলোকে, আজও তাই চটকলে চটকলে, বিশেষত কলকাতার উত্তরে যে সব কারখানা তাতে সবচেয়ে বেশী বিহারী কুলির ভিড়। বাংলাদেশের এই শিল্প এতে বাঙালী মজুর কম। ইষ্ট-বেঙ্গল রেলওয়ে যা দিয়ে বাঙ্গলার গ্রাম থেকে গরিব তাঁতিরা গরিব চাষী মজুররা পেটের দায়ে এসে পড়তে পারত চটকলের ঘূর্ণিপাকের মধ্যে তা খোলা হল অনেক পরে। এসেছে কিছু কিছু। বাঙালী এসেছে, উত্তর প্রদেশ থেকে, পাঞ্জাব থেকে, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, অন্ধ্র থেকে, মধ্যপ্রদেশ, রাজপুতানা থেকে গ্রামের ধূলোমাখা পথ ধরে ছোট ছোট দলের সঙ্গে প্রথমে রেলের স্টেশনে তারপর থার্ড ক্লাস কামরায় ভীত চকিত পশুর মতো গাদাগাদি করে চলে এসেছে

কলকাতায়। এসেছে আর থেকে গেছে। চটশিল্প, ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্প গড়ে উঠেছে এদেরই রক্তমাংসের উপর, এদেরই শিরদাঁড়ার উপর।

॥ দশ ॥

টিফিনের পর একদিন সবে আমার খাতাগুলো টেনে টেবিলের উপর সাজিয়েছি, সেই সময় প্রমথবাবু এসে বললেন—শুনেছ আমাদের উত্তর মিলের বড়সায়েবের কেচ্ছা?

আমি বললুম—কই না তো?

প্রমথবাবু বললেন—সে কি হে! ঢি ঢি পড়ে গেল। উত্তর মিল, পূব মিল সবাই এই নিয়ে কথা বলছে, তুমি আর সুজিতই দেখছি একেবারে যাকে বলে গুড বয়!

আমি বললুম—বলুন না, আপনার মুখেই শুনি।

—চেয়ারটা এগিয়ে নিয়ে এসো সুজিত।

সুজিত সরে আসতে প্রমথবাবু জমিয়ে বসলেন। সাহেব সুবোর কেচ্ছা করতে অমনটি আর কাউকে দেখিনি। রিটায়ার করবার সময় হয়ে এসেছিল বলে প্রমথবাবু বিশেষ কাজ করতেন না। গল্প গুজব করতেন। যখন আমাদের সময় নষ্ট করতেন আমরা ভয়ে ভয়ে থাকতুম, দাস সায়েব এসে দেখে না ফেলেন!

—উত্তর মিলের বড়সায়েবের স্ত্রী আর মেয়ে বিলেত থেকে এল। যুদ্ধের মধ্যে তো আর আসতে পারেনি—এই প্রথম এল এদেশে। ভালো লাগে তো থাকবে, নইলে দেশে ফিরে যাবে। শহরতলীতে থাকে, নাচ নেই, গান নেই। বড়সায়েবেরও কোথাও নিয়ে যাবার সময় নেই। মেম সায়েব ঘ্যান ঘ্যান করে। শেষে বড়সায়েব একদিন মিল-মাষ্টার জোয়ার্দার সায়েবকে ডেকে বললেন

—জুয়ারডার, তুমি আজ আমার মেমকে ফিরপোয় নিয়ে গিয়ে ডিনার খাইয়ে আর বাজনা শুনিয়ে আনলে আমি বড়ই কৃতজ্ঞ হব। ও বেচারা এখানে বসে থেকে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছে। জোয়ার্দার সায়েব 'জো হুকুম' বলে বললেন—আপনার গাড়ি করে কলকাতায় যাবো সায়েব? সায়েব বললেন—না আমার গাড়ি হেড অপিসে আটকা থাকবে কতক্ষণ জানি না। আমি কৃশ্‌নো বাবুকে বলে রেখেছি তার একখানা প্রাইভেট ট্যাক্সি আছে সেটা দিতে। গাড়িটা ভালো। তোমারা তাইতে করে যেয়ো। জানো ভায়া, কেষ্ট ঐ রকম ছেঁড়া ধুতি পরে আপিসে আসে, ওর দুখানা প্রাইভেট ট্যাক্সি আছে? বড়সায়েবের পেয়ারের লোক কেষ্ট, প্রায়ই সন্ধ্যাবেলা সিল্কের জামা আর পরিষ্কার ধুতিটি পরে এসেন্স মেখে বড় সায়েবের বাংলোয় যায়; ওর মারফত বড়সায়েব অনেক বড় বড় কারবার চালায় বলেই লোকের বিশ্বাস। কেষ্ট যা পায় তা শুধু হাতের ময়লা। তাইতেই দু-খানা ট্যাক্সি করেছে। পাঁচখানা করলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কৃশ্‌নোবাবুর ট্যাক্সি চেপে জুয়ারডার সায়েব মেম সায়েবের পাশে বসে ফিরপোয় গেলেন। সেখানে বসে মেম সায়েব ডিনার খেলেন, বাজনা শুনলেন, নাচলেন তারপর খুব খুশি হয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। বড়সায়েব ভেবেছিলেন মেমকে একদিন কলকাতা ঘুরিয়ে আনলেই সে চুপ থাকবে। কিন্তু মেমসায়েব বললেন—না, আমি রোজ যাবো।—আরে, কে নিয়ে যাবে তোমায়? —কেন, ঐ তো জুয়ারডার রয়েছে। মানুষ ভালো, নাচতেও পারে। রোজ হল না কিন্তু প্রায়ই জোয়ার্দার উত্তর মিল-এর বড় সায়েবের মেমকে ফিরপোয় নিয়ে যেতে শুরু করলেন কেষ্টর ট্যাক্সিতে করে। এদিকে জোয়ার্দারের গিন্নি, সুন্দরী মহিলা, লেখাপড়া জানা, গান জানা, তিনি মহা ফাঁপরে পড়লেন। স্বামীর হাবভাব বুঝতে পারেন না। বললে বলেন, বড়সায়েবের হুকুম ফিরপোয় নিয়ে যেতে হবে মেমসায়েবকে, এর উপর আর কথা কি? কিন্তু গিন্নীর নানারকম

সন্দেহ হয় মনে। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটিও হয়। বুঝতে পারেন স্বামীর মন কেমন যেন উড়ু উড়ু। শেষে রাগ করেই হোক বা ক্ষোভেই হোক একদিন সন্ধ্যাবেলায় বড়সায়েবের কুঠিতে গিয়ে হাজির একটা বোঝাপড়া করবার জন্যে। কুঠিতে তখন বড়সায়েব একা—মেমও কলকাতায়, মেয়েও কলকাতায়। বড়সায়েবের সঙ্গে জোয়ার্দার গিন্নীর কি কথা হল কেউ জানে না কিন্তু পরদিন সারা মিল-এ ঢি ঢি পড়ে গেল যে জোয়ার্দারের বৌ বড়সায়েবের কুঠিতে ভর-সন্ধেবেলায় গিয়েছিল। এই আর কি বিবাহ বিচ্ছেদ হয়-হয়।

আমরা বাধা দিয়ে বললুম—কার বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রমথ-দা? সায়েবের না বাঙালীর?

—আচ্ছা বোকা তো? সায়েবের ঘরে আবার কেলেঙ্কারি হল কখন? হল তো জোয়ার্দারের ঘরে। যাই হোক বড়সায়েব নিজেই মাঝে পড়ে বিচ্ছেদটা মেটালেন জোয়ার্দারকে অন্য চটকলে বদলি করে দিয়ে। তারপর প্রমথবাবু চোখ পিট্ পিট্ করে মুচকি হেসে বললেন—কিন্তু জিতলো কেষ্ট।

আমরা সমস্বরে বললুম—কি রকম?

প্রমথবাবু বললেন বড়সায়েবের মেম ঠাণ্ডা হয়ে এখন ঘরে ঢুকেছে। উড়ছে বাইশ বছরের মেয়েটা।

—কার সঙ্গে?

—কার সঙ্গে আবার? ফিন-ফিনে ধুতি পরা সিল্কের জামায় এসেন্স মাখা আমাদের কেষ্টর সঙ্গে। কেষ্ট তো রোজই ওর অন্য ট্যাক্সিটায় করে ছুকরীকে নিয়ে কলকাতায় ঘুরতে যায়।

সমারু অতি ভাল লোক। ফগুয়ার মতে আমাদের চটকলে সুজিত আর আমি দোঠো ভালো আদমি আছি—ভালবাসে বলেই বলে এ কথা—আর আছে সমারু। উত্তরপ্রদেশ থেকে জগদ্দল অঞ্চলে এসেছে সমারু আট বছর হল। ঠিক ফগুয়ার মতই এসেছিল

—একেবার আনকোরা। ভেবে এসেছিল শহরতলীর চটের কারখানায় এসে পৌঁছলেই একটা কাজের হিল্লে হয়ে যাবে। তারপর ঠিক ফগুয়ারই মত হা-কাজ যো-কাজ করে ঘুরে ঘুরে মরেছিল। তবে তার ভাগ্যটা ওরই মধ্যে একটু ভাল। চটকলের সীমানার পুবে বিঘে দশেক জমির মাটি কিনে একজন ইঁটখোলা করেছিল। সেই ইঁটখোলায় সমারু মাটি কাটার কাজ পেয়ে যায়। সে ইঁটখোলা এখন আর নেই। ঐ দশ বিঘে জমির কালো মাটি টুকরো টুকরো আকারে পুড়ে লাল হয়ে কোথায় কত দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। দশ বিঘে জমির বিরাট হাঁ গুলো জলে ভরে আজকাল টলটল করে। চটকলের বাবুরা টিকিট কিনে তাতে মাছ ধরেন প্রতি রবিবার। ইঁটখোলার মালিক মাটির বদলে সোনা করে নিয়ে কোথায় চলে গেছেন কেউ জানে না। তবে যতদিন তিনি ছিলেন ততদিন চটকলের চারিদিকে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াত যে সব বুভুক্ষু বিদেশী বেকারগুলো তাদের তিনি অন্ন দিয়েছিলেন। মজুরগুলো চটকলে কাজ করলে যা পেত তার সিকি ভাগ দিয়েই তিনি রাশি রাশি মাটি কাটা, মাটি বওয়া, মাটি ঢালার মজুর পেয়ে যেতেন অতি সহজে। এত সস্তায় মজুর পাওয়ায় তাঁর স্বর্ণাগমের পথ সহজ হয়েছিল। তা ছাড়া মজুরদেরও পরম উপকার হয়েছিল—কারণ নির্জলা উপোসের বদলে আধপেটা সিকিপেটা খাবার অন্তত তারা পেত। সমারু এইভাবে কিছুদিন মাটি কেটে দিন গুজরান করবার পর তার এক দোস্তের মারফত চটকলের ব্যাচিং বিভাগে কাজ পেয়ে যায়। প্রথমে অস্থায়ী কুলি। তারপর কাজ শিখে নিয়ে এখন সে সেখানকার পারমানেন্ট কর্মী। সমারু এই আট বছর দেশে যায়নি। বস্তিতেই থাকে, সঙ্গে থাকে তার বউ আর তার বছর তিনেকের ছেলে। আর সব পারমানেন্ট মজুরদের দেশে যাবার হিড়িক পড়ে গেলে লোকে যখন তাকে জিজ্ঞেস করে—কি সমারু দেশে যাবে না? সে হেসে বলে—কেন, বউ আছে, ছেলে আছে এখানে.

দেশে গিয়ে কি করব ? এইখানেই অন্য মজুরদের সঙ্গে তার তফাত। অন্য মজুররা দেশে যায় বিয়ে করতে, বউ আনতে, পোয়াতি বৌ নিয়ে দেশে যায় রাখতে, ছেলে হলে আবার যায় আনতে, সংসার বেশী বড় হয়ে গেলে ফের সবাইকে রেখে দিয়ে আসে। কিন্তু সমারু কোনোদিন কোথাও যায় না। সমারু বিয়ে করেছে বস্তিতেই। কোথাকার মেয়ে, কি জাত, কোথায় তার ঘর, কে তার বাপ-মা, এসব কোনো প্রশ্নই ওঠেনি। বস্তির মেয়ের বস্তির মজুরের সঙ্গে হয়েছে ভাব। দুজনের চোখে দুজনকে লেগেছে ভাল। হয়েছে বিয়ে। বাস, তারপরে আর এ নিয়ে কোনো কথা ওঠেনি। সমারু হয়েছে সুখী, তার বউ-এর জীবন হয়েছে পরিপূর্ণ। তারা বস্তিতেই ঘর বেঁধেছে। অন্য কোথাও তাদের যাবার দরকার নেই। এই সমারুর ঘরে ফগুয়া স্থান পেল।

সমারু বড় ভালো লোক। চাকরি পাবার আগে ফগুয়া আর একজনের দাওয়ায় শুয়ে রাত কাটাতো। ঘুমের মধ্যে বৃষ্টি এলে উবু হয়ে বসে বৃষ্টির ছাঁটে ভিজতে ভিজতে বাকি রাতটা কোনো রকমে কাটিয়ে দিত। ফগুয়া যখন কাজ পেল, সমারু বললে তার ঘরে এসে থাকতে। এখন কিছুই দিতে হবে না—ফগুয়া যদি কোনদিন পারমানেণ্ট হয় তাহলে তখন মাসে চার আনা করে দিলেই হবে।

ফগুয়া বলেছিল—সে কি ? তোমার তো মোটে একখানা ঘর। ঘরে তোমার বউ। আবার আমায় ডাকো কেন ?

সমারু বললে—ও আবার একটা কথা হল ? আট বছরের পুরোনো বউ—থাকাও যা, না থাকাও তা।

ফগুয়া ছেলেমানুষ, এসবের বোঝেই বা কি ? সে ধরে নিল, আট বছর পুরোনো হয়ে গেলে বউ আর বউই থাকে না। সে রয়ে গেল সমারুর ঘরে।

ফগুয়ার ভাগ্যক্রমে তার বদলি কাজটা দু-মাস গড়িয়ে তিন মাস, তিন মাস গড়িয়ে চার মাসে ঠেকল।

একদিন সন্ধ্যায় কারখানা থেকে ফিরে বস্তির কলে হাত-পায়ের তেল-কালিগুলো সে ঘষে-ঘষে তুলছিল, সেই সময় সমারুর বউ এল জল নিতে।

বললে—ফগুয়া এবার তোর পাঁচ মাস চাকরি হবে।

ফগুয়া বললে—কেমন জানলে ?

সমারুর বউ বললে—আমাদের ঘরে ক-জন মানুষ ছিল বল তো ?

—কেন, চারজন।

আজ থেকে পাঁচজন হয়েছে। তাই বলছি চাকরি তোর পাঁচ মাস হবে।

ফগুয়া লাফিয়ে উঠল। বললে--সে কি ? তোমার আর একটা ছেলে হয়েছে না কি ? কখন হল ?

সমারুর বউ বললে—দূর, ছেলে হবে কেন ? আচ্ছা বোকা তো। ছেলে হলে অমনি উঠে পড়ে জল নিতে আসতে পারতুম ? এ দেখি কিছুই জানে না। চল ঘরে চল দেখবি।

এই বলে তারা দুজনে বস্তির এঁদো ঘরে ফিরে এল। এসে দেখে ঘরের মেঝেয় মাদুরে শুয়ে একজন রুগী ধুঁকছে। সমারু তার মাথার কাছে বসে বাতাস করছে। শুনলে, এই একটু আগে সমারুর কাঁধে ভর দিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে এই উড়িয়া মজুরটি সমারুর ঘরে ঢুকেছে। ছত্রধর তার নাম।

সমারুর বউ বললে—দেখলি তো ?

জ্বরে বেহুঁশ হয়ে ছত্রধর তার কুপির মধ্যে পড়ে ছিল দু-দিন। কেউ তার দেখা শোনা করেনি—এক ঘটি জলও কেউ তার মুখে এগিয়ে ধরেনি। ছত্রধর পুরোনো ভাল মিস্ত্রী, বুড়ো হয়েছে, নিজের সম্বন্ধে তার উঁচু ধারণা, তাই মেজাজ তার তিরিক্ষী। দেশের লোকের সঙ্গে এই জন্যেই তার বনিবনা নেই। এরই ফলে তার এত অসুখের মধ্যে বস্তির উড়িয়ারা কেউ তার খোঁজও করেনি। সমারু

কেমন করে খবরটা যেন পায়। সমারুর দয়ালু মনের খোঁজ যারা রাখত তারাই বোধ হয় কানে তোলে তার কথাটা। খবর পেয়ে সমারু হাজির হয়। ছত্রধরের কুপির মধ্যে আর তার ঐ অবস্থা দেখে তখনই তাকে কাঁধে করে নিয়ে আসে তার ঘরে। ছোট্ট ঘর—চারজনের জায়গা তাতে হয়েছে, পাঁচজনেরই বা হবে না কেন? বিশেষত রুগী যখন।

বড় ভালো লোক সমারু। নিজের ভাই-এর মত ছত্রধরের চিকিৎসা করাল। ডাক্তার এনে দেখাল, ওষুধ খাওয়াল, সেবা করে তাকে ভাল করে তুলল। প্রায় মরতে বসেছিল ছত্রধর, সমারুর যত্নে উঠল বেঁচে। সমারু না থাকলে যে কি হত বলা যায় না।

একখানা জোড়া-পোষ্টকার্ড হাতে ধরে সমারু বললে—দেশে একটা খবর দিয়ে দি? লিখে দি অসুখ করেছিল, এখন ভাল আছ। যত্ন আত্তি হচ্ছে। না কি লিখব বল।

ছত্রধর বললে—কাকে লিখবে?

—কেন, আপনজন কেউ নেই?

—হায় কপাল! যারা ছিল তাদের কিছু নিয়ে গেল বানের জলে, কিছু মরল খালি পেটে। থাকবে কে? সব খুইয়ে তবে তো চটকলে এসেছি?

বস্তিতে যেমন ছত্রধরের কোনো বন্ধু নেই, দেশেও তার কোনো আত্মীয় নেই। সমারুই হয়ে উঠল তার ভাই, ছেলে, বন্ধু, আত্মীয়, সব। সমারু তাকে পথ্য করাল, ঘরে বসিয়ে খাওয়াল দাওয়াল—ছত্রধর খরচ দিতে গেল, সে এক পয়সা তার কাছে থেকে নিল না।

প্রায় এক মাস ভুগে সেরে উঠল ছত্রধর। এই এক মাসের প্রায় প্রতিদিনই ফগুয়া ভেবেছে এইবার বুঝি তার বদলি কাজ শেষ হওয়ার নোটিস এল। কিন্তু নোটিস আসেনি। সমারুর বউ-এর কথাই সত্যি হয়েছে। পুরো পাঁচ মাস গড়িয়েছে তার চাকরি। ছত্রধর যেদিন

সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে নিজের কুপিতে ফিরে যাবে আর মিস্ত্রিখানায় যোগ দেবে ঠিক সেইদিনই ফগুয়ারও বদলি কাজ শেষ হল। ছত্রধরের পিছনে পিছনে ফগুয়াও তার পুঁটলিটি বগলে নিয়ে বেরতে যাবে, সমারু তার হাত ধরে থামাল। বললে—তুই যাস্ কোথা?

ফগুয়া বললে—যাবো না? কাজ যে শেষ হয়ে গেল।

—শেষ হয়ে গেল তো হয়েছে কি?

—বা ভাই। তুমি তো বলেছিলে যখন আমার কাজ পারমেণ্ট হবে তখন থেকে আমার কাছে চার আনা ভাড়া নেবে।

—তা বলেছিলুম। এ তো আর বলিনি পারমেণ্ট না হলে তোকে তাড়িয়ে দেব। তুই একটা পাগল। পাগলামি করিসনে। থাকবি এখন আমার ঘরে। তোকে তো আর খেতে পরতে দিচ্ছি না—এককোণে পড়ে থাকবি তাতে আমার ক্ষতি কি? এখন এই বর্ষার মধ্যে তুই যাবিই বা কোথায়?

সমারু বড় ভালো লোক। এই বর্ষার দিনে জল-কাদার মধ্যে বেকার বেচারা ফগুয়াকে ঘরের বার করে দিতে তার মন সরে না। কোথায় কার দাওয়ায় পড়ে থাকবে—রাতে মরবে ভিজে, বৃষ্টির তো কামাই নেই—তার চেয়ে থাকুক তার ঘরে।

ফগুয়া রয়ে গেল। আবার হাজিরা দিতে থাকল বদলি আপিসে। মাসের পর মাস কেটে যায়, ফগুয়ার কিন্তু পারমানেণ্ট হবার কোনো সুযোগই আসে না। মাঝে মাঝে বদলির কাজ পায়, দেনার স্ফীত অঙ্কটা একটু কমিয়ে আনে। তারপর আবার যে-কে-সেই। ধীরে ধীরে দেনা তার বেড়েই ওঠে। কোথায় গিয়ে এর শেষ হবে সে ভেবেই পায় না। এমন আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ে যে, কোনোদিন এর কবল থেকে সে উদ্ধার পাবে মনেই হয় না।

বদলি বদলি বদলি! যেদিকে তাকায় ফগুয়া সেইদিকেই বদলি মজুরের দল। জগদ্দলের অগুন্তি হা-ঘরের মধ্যে পারমানেণ্ট কতজন? পাকা কাজ কজনের? বস্তিতে, রাস্তায়, নর্দমার ধারে

দোকানের সামনে, কারখানার আনাচে কানাচে দিনে রাতে সকালে সন্ধ্যায় চোখের সামনে যারা ভেসে বেড়ায় তারা হয় বদলি, নয় ক্যাজুয়েল মজুর। আজ কাজ আছে, কাল নেই। এ হপ্তা পেট ভরে খেলে তো ও হপ্তা উপোস। ফগুয়াদের গ্রামেও ঠিক এমনি। ছেলেবেলা থেকেই ঐ একই জিনিস দেখে এসেছে। এ বছর গ্রামের লোক পেট ভরে খেতে পেল তো ও বছর উপোস যাবে। গ্রামে যেমন বছরের পিঠে বছর আসত এখন হপ্তার পিঠে হপ্তা আসে। শহরে এসে জীবনের ছন্দ দ্রুততর হয়েছে এই যা।

তার পর বছর ঘোরবার আগেই হঠাৎ একদিন সে পারমানেণ্ট হয়ে যায়। কি করে হয় সে নিজেও জানে না। যেন একটা নিয়মের ব্যতিক্রম। এই ব্যতিক্রমের জন্যেই সে এতদিন পথ চেয়ে ধৈর্য ধরে বসেছিল। তার বদলি জীবন শেষ হল। বদলি কাজ করতে করতেই খবর পেলে যে স্থায়ী মজুরদের খাতায় তার নাম উঠে গেছে। সেইদিনই সে যেখান থেকে পারল যোগাড় করে একশটি টাকা গুনে গুনে উপেনবাবুর হাতে তুলে দিলে। গলা অবধি ডুবে গেল দেনায়। হপ্তা ঠিক হল তার সাড়ে পনের টাকা। সুদ গুনতে হল প্রতি সপ্তাহে ন' টাকা করে। বাকি যা রইল তাইতে তাকে খেতে হবে পরতে হবে। ঘর ভাড়া আপাতত সমারুকে দিতে হবে মাসে চার আনা। শুরু হয়ে গেল ফগুয়ার চটকলের মামুলি মজুরজীবন। পারমানেণ্ট চাকরি, অনেকের চোখ টাটানো চাকরি, মজুরসমাজের উপরের ধাপের চাকরি। এর পরে আর কথা কি?

॥ এগার ॥

১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে শোনা গেল এইবার দেশ স্বাধীন হবে। চার শ' বছরের অধীনতার ঘটবে অবসান। এতদিন ধরে

স্বাধীনতার ধুয়ো উঠলেই দেখা যেত সম্প্রদায় আর মুসলমান সম্প্রদায় পরস্পর মারামারি হানাহানি শুরু করে দিত। সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশরাজ বলতেন—ঐ দেখ, তোমরা এখনও খাওয়া-খাওয়ি করছ, স্বাধীনতা নিয়ে কি করবে? এ খেলা বহুদিন ধরে চলেছে। দেশের লোক তিক্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছে। এবার তাই যখন বড়লাট বাহাদুর ওয়েভেল সাহেবকে ভারত থেকে সরিয়ে দিয়ে মাউন্টব্যাটেন নামে নতুন একজন বড়লাটকে আনা হল, লোকে বিশ্বাস করতে শুরু করলে যে, এবার বৃটিশ সত্যিই দেশ ত্যাগ করবে। মোটামুটি যখন ঠিকই হয়ে গেছে ভারত ভেঙে ভারত ও পাকিস্তান করা হবে তখন বাংলাদেশের কি হবে এ-নিয়ে প্রচুর অনুধ্যান চলেছে।

প্রমথবাবু এসে গম্ভীর মুখে বললেন—উর্দু পড়তে আরম্ভ কর ভাই, আর কেন?

—কেন প্রমথ দা?

—এই তো শুনে এলুম বাংলাদেশ পাকিস্তানে যাচ্ছে।

—কেন, এই যে শুনলুম বাংলাকে দু-ভাগে ভাগ করার কথা হচ্ছে?

—ওসব ছেড়ে দাও। বাংলাদেশের চট-শিল্পই হচ্ছে আসল। চটকলের কর্তারা যা বলবে তাই হবে। তারা সব পাকিস্তানে যেতে চায়।

—কেন?

—বুঝছো না, কাঁচামাল আসবে বিদেশ থেকে, তাই দিয়ে চট বুনে বাজারে ছাড়তে হবে, এতে কি আর সস্তা হয়? তাই ভয় পেয়ে গেছে এরা। ঘন ঘন মিটিং হচ্ছে ভায়া। গোপন মিটিং সব। কি হয় বলা যায় না। তৈরী থেকো।

কথাটা সত্যি। চটশিল্পের অসামান্য সফলতার পিছনে রয়েছে তার সস্তা দাম। অন্য যে-কোনো মোড়কের চেয়ে চটের মোড়ক সস্তা। আলু, গম, ভুট্টা, চাল, চিনি, গুড় এবং যুদ্ধের সময় বালি চটের থলির

মধ্যে পুরে যেমন সস্তায় চালান দেওয়া যায় এমন আর কিছুতে নয়। এই সস্তা হবার দুটো প্রধান কারণ—প্রথমটা পাট থেকে চট বোনবার সময় যে শ্রমিক নিয়োগ করা হয় তার হার এত অবিশ্বাস্য রকমের কম যে আর কোথাওই অমন নেই। ঐতিহাসিক কালে ক্রীতদাস কিনে ও নিয়োগ করে প্রাচীন রোম-এ, আমেরিকায়, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে ব্যবসায়ীরা প্রচুর বিত্তের অধিকারী হয়েছে, তার কারণ ক্রীতদাসের নিয়োগ ছিল অতি সস্তা। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের ক্রীতদাসেরা গড়ে দশ পনের বছর কাজ করে মরে যেত; তাতেই ক্রোড়পতি হয়ে যেত ওখানকার চিনির কলের অধিকারীরা। এখনকার যুগে কলকাতার আশেপাশে যারা চটকলে কাজ করে তারা ক্রীতদাস না হোক তাদের হার নিশ্চয় ক্রীতদাসের হারের চেয়ে খুব বেশী নয়, তা নইলে স্কটল্যাণ্ডের চটপতিরা অমন সোনায় মোড়া অত বাড়ি আর অত সম্পত্তি করবে কি করে? দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে পাট হিসেবে যে কাঁচা মাল চটকলের মালিকরা কেনেন তার মূল্যও এমন অবিশ্বাস্য রকমের কম যে অত সস্তায় অমন কাঁচা মাল পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় না। চাষীরা অতি দরিদ্র, তার উপর ঋণভারে জর্জরিত। তারা অতি সস্তায়, কখনও কখনও খরচের কম দরেও পাট ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। সম্পূর্ণ অসহায় তারা। এই দুই দরিদ্রকুলকে শোষণ করে চটশিল্পের ইমারত দাঁড়িয়ে আছে। পাকিস্তান নামক স্বাধীন রাজ্যের হাতে যদি বারো আনা কাঁচা মাল চলে যায় তাহলে যখন তখন যেমন খুশি দামে পাট কেনার অসুবিধে হবে চটপতিদের। এই জন্যে বাংলা দেশকে ভাগ করতে এদের এত আপত্তি।

কিন্তু বাংলাদেশের [illegible] বাংলা ভাগ করার দিকেই এগিয়ে গেলেন। প্রমথবাবু হঠাৎ একদিন এসে বললেন—শুনেছ হে বাংলা বিভাগ এরা ঠেকাতে পারলে না, তাই কি মতলব করেছে? শুনে এলুম এই মাত্র।

—কি শুনে এলেন ?

—শুনলুম কলকাতাকে পুর্ববঙ্গের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে তাহলে জুট মিলগুলো সব পাকিস্তানে গিয়ে পড়বে।

সুজিত বললে—সেখানে অসুবিধে দাদা। শুধু মিলগুলোকে পাকিস্তানে ঠেলে দিলে কি হবে ? চটের কুলি ? এদেশের সব কুলিগুলো তো আর পাকিস্তানে গিয়ে কাজ করবে না। পাকিস্তানি মজুর তৈরী করিয়ে পাটের কল চালাতে প্রাণ বেরিয়ে যাবে বেটাদের। আর সেটা সম্ভব হলেও আগের মত সস্তা মজুরি আর থাকবে না।

হয়তো সুজিতের যুক্তিটাই ঠিক। শেষ অবধি কলকাতা রয়ে গেল ভারতবর্ষে। পূর্ববঙ্গ চলে গেল পাকিস্তানে। পনেরই অগাষ্ট ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হল। কলকাতার উপর যে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা চলছিল এতদিন, তা একদিনেই মিটে গেল।

কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মিটে যাবার ঠিক আগে আমরা আমাদের প্রমথদাকে হারালুম। বড় শোচনীয়:.:ঘটনা। হঠাৎ একদিন প্রমথদার মৃতদেহ পাওয়া গেল কলকাতার ময়দানের ধারে-পিঠে ছুরিকাবিদ্ধ অবস্থায়। ময়দানে বেড়াতে তিনি কোনোদিন যেতেন না। থাকতেন পাইকপাড়ায় এঁদোপড়া গলিতে। মাঠ-ময়দানের হাওয়া পছন্দ করতেন না কখনও। বাড়ির কাছে যে পাইকপাড়ার পার্ক, সেখানকার হাওয়াও নয়। কেন যে তিনি সেদিন গড়ের মাঠে গিয়েছিলেন কেউ বলতে পারলে না। যাই হোক, সে সময় ঐরকম খুনোখুনি কলকাতার নানা জায়গাতেই হচ্ছিল। কত মুমূর্ষুকে রাস্তার ফুটপাতে পাওয়া গিয়েছে, কত মৃতদেহ খালের জলে, গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। কত শত মৃত ব্যক্তির খোঁজই হয়নি, কত জীবন্ত ব্যক্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তার ঠিক নেই। পুলিস বললে যে, অজানা গুণ্ডার হাতে প্রমথদা নিহত হয়েছেন—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বলি। পুলিসে বললেও

প্রমথদার কোনো কোনো আত্মীয় কিন্তু সে-কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করলেন না। তাঁরা প্রমথবাবু সম্পর্কে যেসব খবর রাখতেন, তাতে করে অন্য কিছু সন্দেহ হওয়াই:স্বাভাবিক। আর কারখানার আমরা, যারা তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশতুম, আমাদেরও ব্যাপারটা একটু অন্য রকম :মনে হল। আমাদের এই কথাই মনে হল যে, প্রমথদা যেরকম বৃহৎ ব্যক্তিদের হাঁড়ির খবর রাখতেন, তাতে করে কোনোদিন লোভে পড়ে কোনো বৃহৎ ব্যক্তিকে ব্ল্যাকমেল করা তাঁর পক্ষে একেবারে অসম্ভব নয়। সেই রকম কিছু করতে গিয়েছিলেন কি না, কে জানে? কিছুদিন আগে তিনি এক নাম-করা এজেন্সী হাউসের এক নাম-করা সাহেবের উল্লেখ করে যে বিরাট চুরির গল্প বলেছিলেন, তা এমনই চমকপ্রদ যে আমাদের পক্ষে বিশ্বাস করাই শক্ত হয়েছিল। এজেন্সীর তাঁবে পাঁচ-সাতটা চটকল। বেশ ভাল লাভ করে চটকলগুলো। বেশ ভাল ডিভিডেণ্ড দেয়। এইসব চটকলের মাধ্যমে কৃত্রিম দরে পাট কিনে এবং কৃত্রিম দরে চট বেচে বড়সায়েব পৌনে এক কোটি টাকা লোকসান খাইয়ে দিলেন তিনখানা চটকলের। প্রমথদার মতে লোকসানের যে প্রকাণ্ড অংশটা খাতায় দেখানো হয়েছে, সেটা সমস্তই বড়সায়েবের পকেটে এসেছে। হাজার নয়, লাখ নয়, কোটি!

আমরা হেসে উঠে বলেছিলুম—প্রমথদা, এত খবরই যদি আপনি রাখেন, তা হলে প্রমাণসহ এগুলি পুলিসের কর্ণগোচর করে দিয়ে সমাজের কিছু উপকার করুন না।

শুনে প্রমথবাবু চটে গিয়েছিলেন। প্রমথদাকে রাগতে কখনও বড় একটা দেখা যেত না। কিন্তু সেদিন আমাদের অবিশ্বাসে তিনি হঠাৎ কেমন যেন অসংযত হয়ে উঠেছিলেন। বললেন—বড়াই করতে চাই না। কিন্তু দুটো কাজের যে-কোনো একটা করতে পারি। এক নম্বর, লোকটাকে ব্ল্যাকমেল করে প্রচুর টাকা আদায় করতে পারি। তা যদি করি, তা হলে তোমরাই চোখের

সামনে দেখবে, আমার ঐ সোদপুরে কেনা জমিটার উপর একটা বড়-সড় বাড়ি হাঁকড়ে ফেলব কয়েক মাসের মধ্যে। এমনিতে তো ওখানে একটা মাটির বাড়ি করবার পয়সাও আমার নেই, তা তোমরা জান। আর দু'নম্বর, পুলিসের হাতে নিশ্চয় এমন কিছু তথ্য এনে দিতে পারি, যার ফলে পুলিস যদি সৎ হয়, তা হলে বড়সায়েব পুঙ্গবকে এখনই চালান দিতে পারে। এই বলে তিনি গুম্ হয়ে গিয়েছিলেন।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর বলেছিলেন—চটের কারবারে এবারে মাড়োয়ারী প্রবেশ করবে, এ হচ্ছে তারই পূর্ব-লক্ষণ।

আমরা বললুম—কি রকম ?

—বুঝছো না, এরা সব পুরোনো আমলের পুরোনো ধারার ইংরেজ। ব্রিটিশ রাজ্যের ঐতিহ্যে পুষ্ট। স্বাধীন ভারতে ব্যবসা করতে এদের ভাল লাগবে না। তাই যা পারে, লুটে পুটে নিয়ে কলগুলোকে পথে বসিয়ে যে যার সরে পড়বে।

আমরা বললুম—সে কি ? চটকলগুলোর তা হলে হবে কি ?

—হবে আর কি ? মিল-এর শেয়ারের দর যাবে পড়ে। মাড়োয়ারী এসে সস্তায় কিনে নেবে ব্যবসাটা। ওরা চালাবে ঠিক দেখে নিয়ো।

—আর মজুরগুলো ?

—ফেল-মার্কা কারখানার আবার মজুর। প্রথমে সকলের চাকরি যাবে। কিছুদিন হা-ভাতের মত ঘুরবে আশেপাশে। তারপর নতুন কর্তা নিজের খুশিমতো শর্তে বিতাড়িত মজুরদের আবার কলে ভর্তি করে নিয়ে কল খুলবেন। এই হবে নতুন ভারতের নতুন চটের যুগ।

প্রমথদার কথা মিথ্যে হয়নি। যেখানে ভারতের শতকরা পঁচানব্বই ভাগ চটকল ছিল বিদেশী বণিকদের হাতে, সেখানে স্বাধীনতা পাবার কয়েক বছরের মধ্যে দেখতে দেখতে অর্ধেকের উপর চটকল মাড়োয়ারীদের হাতে চলে এল।

প্রমথদার হত্যার পর এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামা মিটে যাওয়ার পর যে ঘটনা ঘটল, সেটাও কিন্তু ভারী অদ্ভুত। প্রমথবাবু যে বৃহৎ-ব্যক্তির নাম করেছিলেন, তিনি হঠাৎ এজেন্সী হাউসের বড়সায়েবী ছেড়ে দিয়ে বিলেত চলে গেলেন। অবসর নেবার বয়সে তখনও তিনি এসে পৌঁছান নি। স্বাস্থ্য ভাল ছিল, আরও কয়েক বছর কোম্পানীতে টিঁকে থাকবার কথা, কিন্তু হঠাৎ তিনি ডুব মারলেন। বলে গেলেন, তাঁর শরীরের অবস্থা নাকি সবিশেষ খারাপ—রীতিমত আশঙ্কাজনক। এ-কথাটা অনেকেই বিশ্বাস করলেন না, বরং তাঁর ঐ নাটকীয় অপসরণে অনেকেই ঐ তিনটে চটকল ফেল মারানোর সঙ্গে তাঁর পলায়নকে সংশ্লিষ্ট করতে লাগলেন। কোনো কোনো কাগজে মহাব্যক্তির নাম না করেও এমনভাবে কিছুকিছু লেখা বেরল যাতে করে উপরতলার এই ধরনের ধূর্ত এবং সাফাই অপহরণক্রিয়া সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকদের মন সচেতন হয়ে উঠল। এবং যাঁরা আরও একটু ভিতরের খবর রাখেন, তাঁরা বেশ বুঝতে পারলেন, কাকে ঘিরে আলোচনার ঢেউ। শুধু প্রমথদার হত্যাকে কেউ এর সঙ্গে সংযুক্ত করলে না, একমাত্র আমরা কয়েকজন প্রমথদার সঙ্গী ছাড়া। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, প্রমথদা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত হননি। লোভে পড়েই হোক বা যে-কোন কারণেই হোক, প্রমথদা কোনো বিশেষ চটপতিকে ব্ল্যাকমেল করতে বেরিয়েছিলেন এবং নিজেকে যথেষ্টরূপে সামলে না-চলার ফলে কলকাতার ময়দান অঞ্চলে তাঁর উপস্থিতি এবং পরিণতি ঘটে। এ ছাড়া গড়ের মাঠে ধূলিশয্যার উপরে তাঁর অবসানের আর কোনো সঙ্গত কারণ আমরা খুঁজে পাইনি।

প্রমথদা গেলেন। কারখানায় আমাদের লেবার বিভাগে দাস সায়েবের চোখের অন্তরালে যে সরস আড্ডাটি বসত, সেটি ভেঙে গেল।

॥ বারো ॥

আজকাল পেন্‌শান গ্র্যাচুইটি আর প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের হিসেব আমায় রাখতে হয়। আমাদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড বিভাগ এখন লেবার দপ্তরেরই একটা অংশ। ১৯৪৯ সালে প্রথম 'জুট ট্রাইবিউন্যাল অ্যাওয়ার্ডে' চটকল শ্রমিকদের জন্যে গ্র্যাচুইটি, পেন্‌শান ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ড-এর ব্যবস্থা হয়। এর আগে যে যা খুশি করত। দয়া হলে গ্র্যাচুইটি বা পেন্‌শান দিত, নইলে খালি হাতেই তাড়িয়ে দিত মজুরদের। মজুররাও ধরে নিয়েছিল সেটা :চিরকালের ভগবানের বিধান বলে। এই প্রথম হল তার ব্যতিক্রম শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ আন্দোলনের ফলে। এই সময় থেকে চটশিল্পে 'কনট্রাক্ট লেবার' এরও অবসান ঘটে। শ্রমিক যেদিন থেকে পারমানেন্ট হল সেদিন থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত সে গ্র্যাচুইটি পাবে প্রতি বছরের জন্যে পনের দিনের মূল বেতন আর তার পর থেকে পাবে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের পুরো টাকা। এটা পাবে যদি অন্ততঃ তার পনের বছরের চাকরি হয়। কম হলেই নাকচ।

কুড়ি-পঁচিশ বছর চাকরি করে অবসর গ্রহণ করছে এমন মজুর রোজ পাওয়া যায় না। কত মজুর তার আগেই মরে যায়, না হয় অকাল-বৃদ্ধ হয়ে দেশে গিয়ে আর ফিরে আসে না। চাকরির মাঝখানে হয়তো অসুখে কিংবা অন্য কোনো কারণে লম্বা ছুটি নিয়ে ছ'মাসের উপর দেশে গিয়ে বসে রইল, ফিরে এসে সে নিজের কাজে ঢুকলেও সে চাকরিকে ধরা হবে নতুন চাকরি বলে। ঐ যে ছ'মাসের উপর ছুটি হয়ে গেছে। ছ'মাসের সীমা পার হবার জো নেই। একটু লম্বা ছুটি নিলেই এই ঘটে। চাকরির ক্রমান্বয়তা কাটা পড়ে। পেন্‌শান গ্র্যাচুইটির দাবি চলে যায়। এমনি চাকরির ক্রমান্বয়তার হিসেব ছেঁটে ছোট করে দেবার আরো অনেক উপায় আছে। এইসব

বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে যারা পনের বছর ক্রমান্বয় চাকরি করেছি বলে দাবি করতে পারে তাদের ভাগ্যবান্ বলা চলে।

তাই আমি যেদিন অনেকদিন পরে একখানা গ্র্যাচুইটির কেস পেলুম, অন্য সব কাজ ফেলে সেইটেরই হিসেব নিয়ে বসে গেলুম। রিটায়ারিং গ্র্যাচুইটির হিসেবগুলি বেশ জটিল। কর্মী কবে প্রথম পারমানেণ্ট হল উপযুক্ত প্রমাণসহ সেটাকে সাজানো। তারপর তার দীর্ঘ কর্মজীবনে যতগুলি ছুটি নিয়েছে তার প্রত্যেকটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা। তারপর তার যত বছর ক্রমান্বয় চাকরি ছিল এবং যে-যে হারে সে মাইনে পেয়ে এসেছে এইগুলিকে নিয়ে নির্দিষ্ট ফরমূলা অনুযায়ী গ্র্যাচুইটির অঙ্কটাকে কষে বার করে ফেলা। হিসেব-টিসেব সেরে খাতাটা নিয়ে দাস সায়েবের কাছে যেতে যাবো হঠাৎ নামটার দিকে আর একবার চোখ পড়তে যেন চেনা-চেনা মনে হল। একটু ভাবতেই মনে পড়ল ফগুয়ার মুখে এরই কথা শুনেছি। ছত্রধর মিস্ত্রী—উড়িষ্যাবাসী, মরণাপন্ন অসুখ, সমারু তাকে বাঁচিয়েছে। ফগুয়া এর গল্পই করে গিয়েছিল আমার আর সুজিতের কাছে। ফগুয়ার গৃহকর্তা সমারু—কত তার প্রশংসা ফগুয়ার মুখে। এই ছত্রধর—যার বস্তিতেও কোনো বন্ধু নেই, দেশেও কোন আত্মীয় নেই, আজ অবসর নিচ্ছে চাকরি থেকে।

দাস সায়েবকে হিসেবের খাতাটা দিলুম। দাস সায়েব ছত্রধরকে ডেকে পাঠালেন। বললেন—ছত্রধর, তোমার তো ছুটি হয়ে গেল। বুড়োও হয়েছ। গ্র্যাচুইটি হয়েছে তোমার দু' হাজার তিন শ' টাকা। টাকা কবে নিয়ে যাবে বল।

---আজ্ঞে, আজই দিন।

—বেশ, বোসো তবে।

দাস সায়েব ক্যাশ থেকে টাকা আনালেন। গুনে গুনে টেবিলের উপর রাখলেন। তারপর হঠাৎ কি মনে হওয়ায় বললেন—ছত্রধর, এতগুলো টাকা নিয়ে তুমি এখন যাবে কোথায় ?

—কাল দেশে চলে যাবো আজ্ঞে।

—সেই কথাই বলছিলুম। এতগুলো টাকা একসঙ্গে নিয়ে ঘোরা-ফেরা করা তো ভাল নয়। দেশে তোমার কে আছে বল। বরং তার নামে টাকাটা পাঠিয়ে দিই!

—দেশে আমার কেউ নেই আজ্ঞে। আমি নিজেই টাকাটা নিয়ে যাবো।

দাস সায়েব আবার কি একটু ভাবলেন। ভেবে বললেন—ছত্রধর, তোমার টাকা তুমি নিয়ে যাবে, কি আর বলব? কিন্তু তবু এতগুলো টাকা—দিন-কাল তো খারাপ। বল তো তুমি দেশে পৌঁছবার পর আপিস থেকে ডাকে তোমার নামে টাকাটা পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করতে পারি।

—আজ্ঞে, বলছেন ভালই। তবে এত ভয় পাবার কি আছে? আমি সামলে রাখব ঠিক। ভাববেন না কিছু।

দাস সায়েব টাকার তাড়াগুলো এগিয়ে দিলেন। ছত্রধর খাবলা খাবলা নোটগুলো তুলে নিয়ে কিছু তার বটুয়ায় আর কিছু তার ট্যাঁকে গুঁজতে লাগল।

দাস সায়েব নীরবে চেয়ে চেয়ে তার কার্যকলাপ দেখলেন। তারপর বললেন—তুমি কখন দেশে যাবে বললে ছত্রধর?

—কাল দুপুর বেলা।

—তা হলে দেখ, আজ রাত্রে কিন্তু তুমি তোমার কুপির মধ্যে থেকো না। তুমি বরং আমার বাংলোয় এসে আমার ঘেরা-বারান্দায় শুয়ে থেকো।

পরামর্শটা ছত্রধরের পছন্দ হল। সে ঘাড় নেড়ে জানিয়ে গেল যে, সন্ধ্যাবেলা খাওয়া-দাওয়া সেরে সে দাস সায়েবের বাংলোয় চলে আসবে।

সন্ধ্যার সময় এল ছত্রধর। বটুয়ার মধ্যে তার টাকা, ট্যাঁকেও কিছু—একটুও এদিক-ওদিক হয়নি। দু' হাজার তিন শ' টাকা ঠিক

আছে। রাত্রে দাস সায়েবের ঘেরা-বারান্দায় শুয়ে রইল। দাস সায়েবের বাংলো পাহারা দেবার জন্যে যে লোক মোতায়েন থাকত সেই রইল প্রহরায়। রাতে যে অতর্কিতে কোনো দিক থেকে কিছু হয়ে যাবে তার কোনো সম্ভাবনা রইল না। দাস সায়েব শুতে যাবার আগে সব দেখে-শুনে নিশ্চিন্তঃমনে ঘুমতে গেলেন।

দাস সায়েব একটু দেরি করে উঠতেন। ঘুম থেকে উঠে ছত্রধরের খোঁজ করতে গিয়ে শুনলেন, খুব ভোরে অন্ধকার থাকতে উঠে সে বেরিয়ে গেছে, আর ফেরেনি। ছত্রধরের দেশে যাবার ট্রেন বেলা সাড়ে বারোটায়। তাই দাস সায়েব ভাবলেন, ভোরে উঠে হয়তো সে কারো সঙ্গে দেখা করতে গেছে, ফিরবে আবার। অন্ততপক্ষে যাবার আগে সে দাস সায়েবের সঙ্গে একবার দেখা করে যাবে। কিন্তু সেই যে সে গেল, আর তাকে দেখা গেল না। লোকটা এমনিভাবে যে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাবে, কেউ ভাবেনি। রাত্তিরটা ভালোয় ভালোয় কেটেছে বটে, কিন্তু হাজার হোক, ট্যাঁকে অতগুলো টাকা নিয়ে এমনভাবে কাউকে না জানিয়ে ভোঁ হয়ে যাওয়া—এটা যেন কেমন! দাস সায়েবের মনটা খুঁত খুঁত করতে থাকে। তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন, কিন্তু বুঝে উঠতে পারেন না, কি তাঁর করা উচিত।

দাস সায়েব আপিস করে সন্ধ্যাবেলা নিজের বাংলোয় এসে বসে আছেন, এমন সময় মাথায় এক-মাথা ঘোমটা টেনে ছেলের হাত ধরে সমারুর বউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এল। এসে বললে—ভোর রাত থেকে সমারু নিখোঁজ। দাস সায়েব তার কিছু পাত্তা জানেন নাকি? ছত্রধর—সে-ই বা কোথায়?

দাস সায়েব কিছুই বলতে পারলেন না। তাজ্জব হয়ে গেলেন। সমারু আর ছত্রধর দুজনে হরিহর-আত্মা—একই সঙ্গে উবে গেল, ব্যাপার তো সুবিধে নয়! বললেন—পুলিসে একবার খবর দাও। এসব আমার মোটেই ভাল মনে হচ্ছে না। তুমি যখন তার স্ত্রী,

ছেলেকেও নিয়ে এসেছ, তোমারই এটা করা দরকার। আমি বরং সঙ্গে লোক দিয়ে দিচ্ছি।

ঘোমটা পরিহিত নারী বললে—আমি তো ওর বউ নই।

—তবে কে তুমি?

—রেখেছে আমাকে। খেতে দেয়, ঘর দিয়েছে, এই যা।

—ও, তাই নাকি? বলে দাস সায়েব ঢোঁক গিললেন। তারপর নিজেই পুলিসে খবরটা পাঠিয়ে দিলেন এই বলে যে, দু'জন চটকলের মজুর নিখোঁজ হয়েছে, তার মধ্যে একজন উড়িয়া, যার কাছে দু' হাজারের উপর টাকা ছিল, অপরজন উত্তর-প্রদেশী।

দাস সায়েব নারীকে জিজ্ঞেস করলেন—কতদিন তুমি সমারুর ঘর করছ?

—আট বছর।

—ছেলে ঐ একটি?

—হাঁ হুজুর।

—ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল? তোমার মানুষ তোমায় ফেলে পালাল কেন?

—ঝগড়া হয়নি কোনো দিন।

—তবে?

—জানি না। তবে বস্তিতে ওর মন বসত না।

—কোথায় গেছে বলে মনে হয়?

—ছত্রধরের সঙ্গেই গেছে। দু'জনে খুব ভাব।

—কোথায় গেছে?

—কি করে বলব হুজুর? ছত্রধরের হাতে টাকা আছে। যেখানে খুশি যেতে পারে। কি মতলব করেছে দু'জনে কি করে বলব?

নারী আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল।

ছত্রধর আর সমারুকে সেই থেকে জগদ্দলে কেউ আর দেখেনি।

দেশেও তারা ফেরেনি। ছত্রধরের দেশের লোক কোনোদিন ছত্রধরকে দেশে ফিরতে দেখেনি। সমারুর দেশের লোকও সমারু সম্বন্ধে একই কথা বলে। প্রথম প্রথম এই ঘটনা নিয়ে লোকে কথাবার্তা বলত, আলোচনা করত, কানাঘুষো করত, সমারুর বউকে দূর থেকে আঙুল দিয়ে দেখাতো। তারপর ক্রমে ভুলে গেল লোকে তাদের কথা। কারখানার জীবন-স্রোতের দ্রুত তরঙ্গে এই দু'জনের স্মৃতি কোথায় তলিয়ে গেল তার আর কোনো চিহ্নই রইল না। চটকলকে ঘিরে যে ক্ষেত্র তার জীবনলীলা যেমন চলছিল তেমনি চলতে থাকল আবার। তারপর বহু মাস পরে হঠাৎ আমাদের চটকলের একদল মিস্ত্রী কলকাতায় গিয়ে কালীঘাট অঞ্চলে এক পানের দোকানে বুড়ো ছত্রধরকে আবিষ্কার করে ফেললে। রাস্তার মোড় থেকে হাত দশেক গলির মধ্যে ঢুকে এক দোতলা বাড়ির রোয়াক আর পাশের বাড়ির দেয়ালের মধ্যে যে আড়াই হাত ফাঁক সেইটি ঘিরে দোকান ঘরটাকে খাড়া করা হয়েছে। রাস্তার মোড়ে এলেই দোকানটি চোখে পড়বে। দোকানে একটার উপর একটা কাঠের পাটাতন দেওয়া দুটো খুপরি। নাচের খুপরিতে বসে ছত্রধর পান বেচছে আর উপরের ছোট্ট খুপরির মধ্যে বসে বসে সমারু পাকাচ্ছে বিড়ি। খোঁজ নিয়ে তারা জানলে যে দু'জনে মিলে দোকানটা করেছে। ছত্রধরের টাকা আর সমারুর বুদ্ধি। মোড়ের মাথায় দোকান—জায়গাটা পাবার জন্যে ছত্রধরকে মোটা টাকা সেলামি দিতে হয়েছে। দোকানের দেয়ালে রূপোলী কারুকার্যের পাড় দিয়ে বাঁধানো এক জোড়া আয়না, তার এক পাশে অশ্বপৃষ্ঠে শিবাজী অপর পাশে অশ্বপৃষ্ঠে সুভাষচন্দ্রের ছবি। থরে থরে সাজানো সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই-এর বাক্স, সোডা-লেমনেডের বোতল। দড়ি বেঁধে টাঙ্গানো কাগজের প্যাকেটে ধূপ-কাঠি আর গুঁড়ো চা। গোছা বাঁধা বাঁধা বিড়ি আর কাপড়-কাচা সাবান। লাল ভিজে কাপড়ের উপর কাটা পানের পাতা বিছিয়ে ছত্রধর নিপুন হস্তে পান

সেজে চলেছে। হাতের পাশে একটা পিতলের ঘটিতে গোলা চুন, আর একটাতে খয়ের। আর একটা কাঠের ডাবায় ভর্তি কুঁচো সুপুরি। ছত্রধরকে দেখে মনে হয় বাল্যকাল থেকে এই কাজেই যেন সে সিদ্ধহস্ত। চটকলে মিস্ত্রীর কাজ করে যে এতদিন হাত পাকিয়েছে, তার কোনো চিহ্নই নেই। দোকানে খদ্দেরের ভিড় লেগেই আছে। বেশ চলেছে দোকানখানা।

উত্তর প্রদেশ আর উড়িষ্যা—দুইএর মধ্যে অনেক অমিল। ভাষা, পোষাক, আচার ব্যবহার ভিন্ন। কোথা থেকে হয়ে গেল এদের মিল। দেশের টান ভুলে চটকলের ঘূর্ণিপাকের মধ্যে পড়ল। ঘুরপাক খেয়ে চললো বছরের পর বছর। তারপর যখন তিক্ত হয়ে উঠল চটকলের হাওয়া, বিস্বাদ হয়ে উঠল বস্তির গলি, সেখান থেকে ছিটকে পড়ে পুত্রকলত্র পূর্বাশ্রম সব কিছু ফেলে, পূর্বস্মৃতি ভুলে উঠল এসে এই পানের দোকানের তটে! দুই মরদের এই স্ত্রীহীন সন্তানহীন সংসার —ভারি গোছালো, ভারি স্বচ্ছ, ভারি সুখময়!

॥ তের ॥

সমারুর গৃহত্যাগের ফলে ফগুয়াকে এক নতুন সমস্যার সম্মুখীন হতে হল। যেদিন সমারু চলে যায়, সেদিন সারা রাত ফগুয়া আর সমারুর বউ ঘরের দরজা খুলে সমারুর জন্যে অপেক্ষা করেছিল, মনে একটা ক্ষীণ আশা নিয়ে—যদি ফিরে আসে!

ফগুয়া জিজ্ঞেস করেছিল—তোমার কি মনে হয় ফিরবে?

সমারুর বউ উত্তর দিয়েছিল—আমি কি আর টের পাইনি ওর মন উড়ু উড়ু করছে? অনেক দিন থেকেই করছে। ছত্রধরের সঙ্গে ফিস্‌ফাস্‌ শলা-পরামর্শ হচ্ছে, তারও কিছু কিছু কানে এসেছে আমার। তাই আমার কোনো ভরসা নেই যে ফিরবে। তবে মানুষের মন, কে বুঝবে কোথায় তার তল? যদি ফেরে সমারু

আজই ফিরবে—নইলে আর কোনোদিন নয়। আজ রাতে যদি সে আসে, চোরের মত আসবে। তখন যেন দরজা বন্ধ দেখে ফিরে না যায়! আজ রাত-ভোর আমার দরজা খোলা রইল।

চৌকাঠে ঠেস দিয়ে বসে বসে ভোরের দিকে ফগুয়ার ঝিমুনি এসেছিল। ঘুমিয়েই পড়েছিল খানিকটা। চটকা ভেঙে উঠে দেখে, সমারুর বউ ঘরের বাইরেটা ঝাঁট দিচ্ছে। ফগুয়া চোখ কচ্‌লে উঠে তার পুঁটলিটা বেঁধে নিয়ে বেরতে যাবে, সমারুর বউ তাকে আটকালো। বহুকাল আগে সমারু যেমন একবার তাকে আটকেছিল, অনেকটা সেইরকম।

—যাস্ কোথা?

—এখানে আর আমি থাকি কি করে? সমারু তো ফিরল না।

—বা রে, আমি একা মেয়েমানুষ আমাকে ফেলে তুই চলে যাবি?

সত্যিই তো! ফগুয়া থমকে দাঁড়াল। ভাবলে খানিকটা। এরকম একটা দায়িত্ব আচমকা তার ঘাড়ে এসে পড়বে তার জন্যে ফগুয়া প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু সে বুঝলে যে তাকে থাকতেই হবে। সে পুঁটলি নামিয়ে রেখে বললে—বেশ, তবে চললুম এখন আমি কাজে। বলে সে কারখানায় চলে গেল।

সন্ধ্যার সময় কারখানা থেকে ফিরে হাতমুখ ধুয়ে ঘরে এসে বললে —আমি তবে ঘরের দাওয়াতেই শুই?

সমারুর ঘরের কোনো সত্যিকারের দাওয়া ছিল না। দাওয়া মানে রাস্তা—মাথায় খোলা আকাশ এবং নীচে খোলা ড্রেন। সেখানে শুয়ে রাত কাটাতে ফগুয়ার বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না। কত রাতই তো এমনি কাটিয়েছে। কিন্তু ফগুয়া তার আয়োজন করতেই সমারুর বউ তার হাত ধরে ঘরে নিয়ে এল এবং ভিতর থেকে দরজা দিল দড়াম্ করে বন্ধ করে। পরের দিন থেকে বস্তির সবাই মেনে নিল যে সে ফগুয়ার বউ হয়ে গেছে।

ফগুয়ার অনেকগুলো পয়সা বেঁচে গেল। কোম্পানির লাইন-এ

তার কোনো ঘর পাবার কথা নয়। বস্তির মধ্যে ঘর ভাড়া নিতে গেলে মাসে অন্তত ছ' টাকার ধাক্কা। আর অন্য উপায় হচ্ছে কারুর দাওয়ায় শুয়ে থাকা। সারা দিনের খাটুনির পর এইভাবে রাত কাটালে কতদিন তার স্বাস্থ্য টিঁকত বলা শক্ত। সেদিক থেকে সুবিধেই হল ফগুয়ার। কিন্তু সমারুর বউকে এক রাতের মধ্যে সে নিজের বউ হিসেবে মেনে নিতে পারলে কি না সে কথা কে বলবে?

সমারুর বউ গোদাবরী—বিলাসপুরে তার বাড়ি। জগদ্দলে যখন প্রথম এসেছিল, তখন তার বয়েস আঠারো কি উনিশ। নিখুঁত কালো চেহারা—নিটোল স্বাস্থ্য। তার মত আরো পনের-ষোলটি মেয়ে এসেছিল তার সঙ্গে বিলাসপুর অঞ্চল থেকে। তাদের নিয়ে এসেছিল একজন কুলি-সর্দার। কুলি-সর্দাররা জানে, চটকলে যেমন পুরুষ কুলির প্রয়োজন তেমনি মেয়ে কুলিরও দরকার। সেলাই কলে, ওয়েফ্ট্ ওয়েবিং কলে মেয়েরা কাজ করে। তা ছাড়া সাধারণ কুলির কাজও মেয়েদের দিয়ে করানো হয়। মেয়েরা কাজে কম ফাঁকি দেয়। সেই হিসেবে মজুরানীর চাহিদা আছে চটকলে। বিলাসপুরের এইসব মেয়েদের বাপ-মারা ভারি গরিব। একটা সমর্থ মেয়ে যদি বাপের গলগ্রহ হয়ে না থেকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, গরিব পরিবারের তাতে অনেকটা কষ্টের লাঘব হয়। তার উপর যদি সে মেয়ে রোজগার করে দু-এক পয়সা দেশে বাপ-মার কাছে পাঠাতে পারে, তা হলে তো সোনায় সোহাগা। খরচ-খরচা করে গ্রামের কোথায় কার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে, সেসব হাঙ্গামা না পুইয়ে বাপেরা অনেক সময় এই পথটাই পছন্দ করে। স্বাধীনতা রইল বজায়, রোজগারও হল।

এরা নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে সর্দারের হাতে মেয়েগুলোকে সঁপে দিয়েছিল। দেশে গ্রামে শহর-ফেরত সর্দারদের খাতির খুব।

বিলাসপুরের জঙ্গল-ঘেরা গ্রামের মানুষদের কাছে শহর-মাড়ানো চটকলের সর্দার মহাপুরুষ বিশেষ। তারা যা বলে তাই করতে পারে। সর্দার যদি কোনো মেয়েকে এক-চোখ দেখে নিয়ে বলে—একে আমার হাতে ছেড়ে দাও, আমি এর মাসে পঞ্চান্ন টাকা রোজগারের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি—তা হলে তার বাপ-মা একেবারে গলে পড়ে।

সর্দারের হাতে মেয়েগুলোকে ছেড়ে দেওয়ায় কত সুবিধে! মেয়েরা প্রত্যেকে পাবে পঞ্চাশটা করে টাকা, একখানা করে ন-হাতী শাড়ি। এই থেকেই এখন চলুক রেল-ভাড়া, চলুক খাই-খরচা। কোনো চিন্তাশীল বাপ-মা যদি প্রশ্ন করে বসে যে, দেনা শোধ হবে কি করে? তা হলে সর্দার মিষ্টি হেসে তাকে থামিয়ে দেয় এই বলে যে, ওসব ভাবনা ছেড়ে দাও ভাই। মেয়ে আগে কাজ পেয়ে যাক, তার পর ধার শোধের কথা উঠবে। হপ্তায় পনের টাকা রোজগার হলে কদিনই বা লাগবে শোধ দিতে এই.কটা টাকা? কোনো কোনো বৃদ্ধ বিচক্ষণ পিতা মনে মনে অঙ্ক কষে সুদের পরিমাণটা বার করবার চেষ্টা করে ছেড়ে দেন, কারণ সুদের হারের কোনো ইঙ্গিতই সর্দারের কাছে পাওয়া যায় না। সুদের কথা যেন একটা ঘৃণ্য আলোচনা, তাই সর্দারও বলতে চায় না, বাপ-মারাও ও প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে পারে না।

মেয়েরা এইভাবে অকূলে ভেসে পড়ে। তারা হয়ে যায় সর্দারের কাছে বাঁধা। সর্দার এদের সঙ্গে যথেচ্ছ ব্যবহার করে। কারুর কিছু বলবার নেই। বিলাসপুরী জোয়ান মেয়েদের অবশ্য চটকলে চাকরির অভাব হয় না। গোদাবরী আর গোদাবরীর সঙ্গে যারা এসেছিল তাদের কাউকেই বসে থাকতে হয়নি—এসেই তারা কাজ পেয়ে গিয়েছিল। হপ্তায় তারা যা কাজ তুলত, তাতে পীস্‌রেট-এ তাদের রোজগার দাঁড়াতো তের, চোদ্দ, পনের টাকা। সর্দারের সঙ্গে কড়ার হয়—রোজগারের অর্ধেক টাকা তাকে দিয়ে যেতে হবে যতদিন না সুদ-সুদ্ধ তার দেনা শোধ হয়।

গোদাবরী খাটতে পারত খুব। কোনো কোনো হপ্তায় সে কুড়ি টাকা পর্যন্ত আয় তুলেছিল। তার সাড়ে চার মাস লেগেছিল সর্দারের দেনা শোধ করতে। এই সাড়ে চার মাসের মধ্যে সে তার মনের মানুষ বেছে নিয়েছিল সমারুকে। গোদাবরীর সঙ্গিনীরাও কেউ কেউ নিজেদের সঙ্গী বেছে নিয়েছিল। কিন্তু বেছে নেওয়া শুধু মনে মনে। যতদিন না সর্দারের শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত শোধ হচ্ছে ততদিন তারা সর্দারের সম্পত্তি—সর্দারের হাত ছাড়িয়ে যাবার উপায় নেই। সর্দারের বাঁদী বললেও হয়।

আজকাল সর্দারদের আর সে দোর্দণ্ড প্রতাপ নেই। কিন্তু কিছুদিন আগেও ছিল। কালু সর্দারের এক গল্প এখনও শোনা যায় আমাদের চটকলে। বছর দশেক আগে ঘটেছিল ঘটনাটা। কালু সর্দার একবার দেশ থেকে ফিরল, সঙ্গে তার এক দঙ্গল মেয়ে। দেশে কালুকে সবাই ডাকত 'দেওতা' বলে। সত্যিই তার ব্যবহার ছিল দেবতার মতো। মনে হত যেন পরের উপকার করবার জন্যেই সে জন্মগ্রহণ করেছে—নিজের বলতে তার কিছু নেই। সেই কালু সর্দার চটকলে ফিরে এসেই ধরল আর এক মূর্তি। দানবের মূর্তি। মেয়েগুলোকে রাখল সারি সারি ক'টা ঘরে প্রায় বন্দিনীর মতো। বলে দিল, তার হুকুম ছাড়া এক পা-ও তারা এদিক ওদিক যেতে পারবে না। মেয়েগুলো ভয়ে জড়সড়। কালু সর্দার সারা দিন মদ খেয়ে টং হয়ে ঘুরে বেড়ায়, চেঁচামেচি করে আর রাতে যখন যাকে খুশি ডেকে পাঠায় তার ঘরে। এমনি চললো কিছু দিন, তারপর শখ খানিকটা মিটলে কালু সর্দার তাদের একে একে কাজে লাগিয়ে দিলে। সবাই কাজ পেল, শুধু পেল না একজন—তার নাম ফুলিয়া। ফুলিয়া ছিল ছিপছিপে তন্বী সুন্দরী। অপূর্ব ছিল তার আকর্ষণ। স্থির হয়ে যখন দাঁড়িয়ে থাকত, মনে হত তার মধ্যে এক চঞ্চলা হরিণী স্তব্ধ হয়ে রয়েছে।

হরিণের মতই ছিল তার চোখের চাউনি। অমন মেয়ে বস্তিতে দেখা যায় না। ফুলিয়াকে দূর থেকে উঁকি মেরে মজুরগুলো দেখত আর তাদের চোখগুলো হাঁ হয়ে যেত। কালু তাকে মহামূল্য রত্নের মত রক্ষা করত। শেষে দেখা গেল, ফুলিয়াকে ছেড়ে দেবার ইচ্ছে কালুর নেই। ফুলিয়াকে সে রাখতে চায়। নিয়ে এল একদিন নিজেরই ঘরে। বললে—তোমার তো দেনা শোধ হয়নি। তুমি আমারই হয়ে গেলে। এখানেই থাক।

ততদিনে ফুলিয়ার সখিরা প্রায় সবাই ঋণমুক্ত হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে কারো কারো চটকলের বস্তির আবহাওয়া ভালো লাগেনি একটুও। একে কালুর দুর্ব্যবহার, তার উপর চারিপাশের লোলুপতা, নোংরামি। তারা দেনা শোধ করেই ফিরে গেছে তাদের দেশে বাপ-মায়ের কাছে। সঙ্গে নিয়ে গেছে শহরের মলিন অভিজ্ঞতা। বাকী মেয়েরা কেউ কেউ ঘর বেঁধে ফেলেছে বস্তিতেই কোনো জোয়ান মরদের সঙ্গে আর কেউ কেউ আছে নিজের মনে হয়তো দু'সখী তিন সখী এক একটা অন্ধকার কুপিতে। এদের মধ্যে শুধু ফুলিয়ারই কপাল মন্দ। মাতাল স্বেচ্ছাচারী কালুকে যমের মতো ভয় করে, ঘৃণা করে অথচ তার হাত এড়িয়ে যাবার কোনো আশা, কোনো ভরসা নেই। ফুলিয়ার মনে হয়, অকুল সমুদ্রে পড়ে সে ডুবছে। ডুবতে ডুবতে ফুলিয়া আবার দু দিকে দুই কুলও দেখতে পায়। অত কড়াক্কড়ি, অত পাহারা, ওরই মধ্যে ফুলিয়ার সঙ্গে কথা কয়ে যায় রহমত আর কথা কয়ে যায় শ্রীরামলু। ফুলিয়া যখন ক'লে যায় জল আনতে, চুপটি করে চোখের দৃষ্টি নত করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কলসীর মধ্যে জলের পতন-দৃশ্য দেখে; তখন কালুর ভয়ে কেউ তার কাছে এগিয়ে আসে না, কেউ তার সঙ্গে কথা কয় না, কিন্তু ফুলিয়া বেশ বুঝতে পারে, তার একদিকে দাঁড়িয়ে রহমত আর এক দিকে দাঁড়িয়ে শ্রীরামলু তার অঙ্গে তাদের দৃষ্টি বুলিয়ে দিচ্ছে। ফুলিয়া তার ত্বকের উপর স্পর্শের মত অনুভব করে সেটা।

ফুলিয়া কালুকে বলে—আমায় ছেড়ে দাও কালু। আমি নিজে গিয়ে কাজ যোগাড় করে নিচ্ছি। তোমার সব দেনা আমি শোধ করে দেব। আমায় শুধু রেহাই দাও।

কালু তাকে মিষ্টি কথায় ভোলাবার চেষ্টা করে, মিথ্যে কথায় বিশ্বাস জন্মাবার চেষ্টা করে, তারপর না পেরে চোখ রাঙায়, ধমক দেয় এবং শেষে একদিন শোনা গেল, কালু তার তরুণী বধূ ফুলিয়ার গায়ে হাত তুলেছে।

খবরটা রটে যেতে রহমত এসে হাজির হল কালুর ঘরের দরজায়। ফুলিয়াকে কালু আঘাত করেছে শুনে রহমতের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেল। হাজার হোক কালু হল কুলি-সর্দার, তার মেয়েমানুষের উপর একচ্ছত্র অধিকার। এ নিয়ে রহমতের মতো সাধারণ মজুরের কথা বলতে যাওয়াই বাতুলতা।

তবু রহমত গিয়ে ঝগড়া করল। বললে—ফুলিয়াকে গায়ের জোরে কালু আটকেছে। আজ ছেড়ে দিলে আজই ওকে রহমত কাজ জুটিয়ে দেবে। দরকার হলে কালুর সমস্ত দেনাও রহমত আজ চুকিয়ে দিতে পারে। ফুলিয়াই বরং বলুক, সে কি চায়?

ফুলিয়া কিন্তু নীরব। কালুর মুখের উপর কিছু বলতে তার সাহস হল না।

কালু হিংসায় উন্মত্ত হয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে বললে—বেশ, বলুক তবে ফুলিয়া, ও কার! রহমতের না আমার?

ফুলিয়া কলতলায় যেমন চোখ নীচু করে মনোহর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকত ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে রইল।

ঐটুকুই যথেষ্ট। কালু সর্দার বুঝল, ফুলিয়ার মন টলেছে। সে এক হেঁচকায় ফুলিয়াকে ঘরের মধ্যে টেনে দরজায় খিল এঁটে দিলে।

রহমত ঘাড় হেঁট করে চলে গেল। তারপর সারাদিন আর কিছুই ঘটল না। ঘটল রাত্রে। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা এমন গোলমেলে যে, তার একটা পরিষ্কার ব্যাখ্যা আজ অবধি পাওয়া

যায়নি। কালুকে, রহমতকে, শ্রীরামলুকে—তিনজনকে একই ভাঁটিখানায় মদ খেতে দেখা গিয়েছিল। দু-একটা বক্র কথা হয়তো এ ওকে বলেছিল, কিন্তু তাদের ঝগড়া করতে কেউ দেখেনি। কোথায় তারপর তারা চলে যায় তা-ও কেউ জানে না। ভোর রাতে বস্তির বাইরের মাঠে নালার ধারে কালু সর্দারের আর রহমতের মৃতদেহ পাওয়া যায়। দুজনকেই ছুরির ঘায়ে নিহত করা হয়েছে। আর দেখা যায়, শ্রীরামলু বস্তি থেকে অদৃশ্য হয়েছে, সেই সঙ্গে ফুলিয়া। পুলিস তদন্ত করে কিছুই বার করতে পারেনি।

এই নিয়ে চটকলের বাবুদের মধ্যে প্রায়ই তর্কাতর্কি হয়। অনেকে অনেক রকম মন্তব্য করেন। কেউ বলেন, রহমত আর কালু দুজনেই দুজনকে ছুরি মেরেছে। অন্যেরা বলেন—তা কখনও হতেই পারে না। শ্রীরামলুই দুজনকে খুন করেছে। কেউ কেউ যুক্তি দেখান যে, শ্রীরামলুর মত রোগা-পটকার পক্ষে দু-দুটো গুণ্ডাকে খুন করা অসম্ভব। কালু রহমতকে সাফ করবার পর শ্রীরামলু বোধ হয় ঝাঁপিয়ে পড়ে কালুকে সাবাড় করেছে। সব শুনে বিচক্ষণরা মত দেন যে, আসলে এ সবই ঐ ফুলিয়ার কাজ। শ্রীরামলুই ওর আসল নাগর। ঐ বেটীই মরদগুলোকে মদ খাইয়ে একটাকে দিয়ে আরএকটাকে খুন করিয়ে তারপর নিজের নাগরের হাত ধরে পালিয়েছে। কিন্তু আজ অবধি শ্রীরামলুও ধরা পড়েনি, ফুলিয়াকেও কেউ দেখেনি। তর্ক, যুক্তি আর অনুমানের কোঠাতেই রয়ে গেছে সমস্ত ব্যাপারটা।

কালু সর্দার মারা যাবার পর এ রকম শোচনীয় ঘটনা আমাদের মিল-এ আর ঘটেনি। সর্দাররা একটু সাবধান হয়ে গেছে। কোনো দিক দিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করতে সাহস করে না।

গোদাবরী যেদিন তার দেনা শোধ করে বস্তির দোকান থেকে একখানা লাল-পেড়ে ন-হাত কোরা শাড়ি কিনে পরে মাথায় সিঁদুর

দিয়ে সমারুর ঘরে এল, সেদিন সমারু নিজেকে বস্তির রাজা বলে ভাবতে পেরেছিল। এবং সেই জন্যেই বোধ হয় সমারু আর তার বিলাসপুরী বউকে কারখানার পাটের ফেঁসো-ভরা মেঝেতে বসে চটের থলি কোলে করে সেলাই করার কাজ করতে দেয়নি। গোদাবরীই একমাত্র তার দলের মধ্যে ঘরের বউ হয়ে গেল—আর মজুরনী রইল না। সমারু তাকে বস্তির রানী করে দিলে।

সেই সমারুই আট বছর পরে ফগুয়াকে ডেকে বললে—ও আর বউ নেই। অদ্ভুত উক্তি! বউ নেই, তবে কি? ফগুয়ার মাথায় কথাটা ঢুকলোই না। বউয়েরই মত থাকে, ঘর-সংসার দেখে, সমারুর ছেলেকে কোলে নিয়ে ঘোরে, মানুষ করে—তবে? তবে যে কি তা কেউ বোঝে না। সমারুর আর সমারুর বউয়ের মাঝে যে তারটা কেটে গিয়েছে তা এত সূক্ষ্ম, এত অতল যে কারুরই চোখে পড়ে না। তাই ন' বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বউ-ছেলে সব ছেড়ে সমারু যখন হঠাৎ চলে গেল, কেউই বুঝতে পারল না, কেন এমনটা হল। কেউ কোনদিন জানবেও না।

গোদাবরী এতদিন পরে আবার কারখানায় কাজ নিলে। তার প্রধান কারণ—তার আর রানী হয়ে থাকা সাজে না। যে তাকে রানী করে রেখেছিল সে-ই যখন আর নেই, তখন আবার মজুরনী হতে বাধা কি? তার পরের কারণটাও বড় কম নয়। ঘরটা ভাড়া ছিল সমারুর নামে। সমারু যখন নেই তখন সমারুর বউ সেটা পেতে পারে, কিন্তু তা হলে তাকে কারখানার কর্মী হতে হবে। কাজ করবে না, ঘর পাবে, কারখানায় এ নিয়ম নেই। এইভাবে রয়ে গেল গোদাবরী তার পুরোনো গৃহে, আর রইল তার সঙ্গে তার নতুন মনিব।

॥ চোদ্দ ॥

গোদাবরীর সখী চম্পাকলি। একই গাঁয়ের মেয়ে, ছোটবেলা থেকে বন্ধুত্ব, একই সঙ্গে এসেছে জগদ্দলে। বিলাসপুরী মেয়েদের

মধ্যে চম্পাকলি ছিল চাঁপারই কলি। দীর্ঘ একহারা দেহ, মুখটি আঁট-সাঁট, রঙটি ময়লা হলেও সবার মাঝে জ্বলজ্বল করত। চম্পা-কলির আগমনে যুবক আণ্ডয়ান মজুরদের সমাজ হয়ে উঠেছিল চঞ্চল চনমনে। তাকে পাবার জন্যে যুবক মহলে ছিল প্রচুর রেষারেষি। শুধু আমাদের কারখানায় নয়, পাশের ঢালাই কারখানার মজুররাও ঘোরাঘুরি করত চম্পাকলির ঘরের আনাচে-কানাচে। কিন্তু যতদিন সর্দারের তাঁবেতে ছিল সে, ততদিন খোলাখুলি কেউ তার সঙ্গে কথা কইতে পর্যন্ত পারে নি। সর্দারের টাকা চুকিয়ে দিয়ে তার উপর আরো কিছু চাপিয়ে সর্দারকে খুশী করে অন্য কারখানায় চম্পাকলিকে নিয়ে যাবার একটা চেষ্টা হয়েছিল বটে কিন্তু বিশেষ সুবিধে হয় নি। সর্দাররা এ বিষয়ে বড় কড়া। তাদের সব সময় চেষ্টা যে দলকে একসঙ্গে আনবে তাদের একই জায়গায় রাখতে। দু-চারটে যে শেষ অবধি এদিক-ওদিক ছট্‌কে পড়ে না তা নয়, কিন্তু মোটামুটি তারা এক গোষ্ঠীতেই থাকে। এতে সর্দারের মান, তার সুনাম, তার উপর লোকের আস্থা বাড়ে। সর্দার তাই টাকার লোভ সত্ত্বেও চম্পাকলিকে দলছাড়া করতে রাজী হয় নি।

চম্পাকলির এদিকে ভিতরে ভিতরে ভাব হয়ে গিয়েছিল বির্ধোজের সঙ্গে। বির্ধোজ ছিল ছেলেমানুষ, চম্পাকলিরই বয়সী, ভারি মিষ্টি চেহারা। বিহার আর নেপালের মাঝামাঝি একটা জায়গায় তার বাড়ি। পালিয়ে এসেছে সে বাড়ি থেকে বাপ মাকে না বলে। বাড়ি ফিরতে চায় না, বাড়ির কথা বলতেও চায় না কাউকে। ভাগ্যক্রমে জুটে গেছে তার চাকরি একখানা চটের কারখানায়। চম্পাকলির একেই পছন্দ হয়ে গেল।

সর্দারের দেনা পাওনা অনেক। বির্ধোজ তার হপ্তা থেকে কিছু কিছু টাকা বাঁচিয়ে তুলে দিতে থাকল চম্পাকলির হাতে। তাতেই একটু তাড়াতাড়ি শোধ হল সর্দারের ঋণ। যেদিন শেষ

কড়িটি গুনে দিয়ে চম্পাকলি চুকিয়ে দিল সর্দারের পাওনা, সেইদিনই সন্ধ্যায় গঙ্গামাঈর পুজো করে এসে এরা ঘর বাঁধল। পায়রায় যেমন বাসা বাঁধে ঠিক তেমনি। পায়রার মত গুঞ্জন করল খানিকটা। কি তার মানে তারাই জানে। সারা দিনের খাটুনি। কারখানার পাটের ফেঁসোর মধ্যে দুজনে দুদিকে থাকে, ঝুল-কালি মাখে, দেখা হয় না এক নিমেষেরও তরে। তার পর দিন-ভর কাজের শেষে পাম্পের জলে গা ধুয়ে এসে নিজেদের ছোট্ট নীড়ে ফিরে এসে নিবিড় হয় পরস্পরের কাছে। এইভাবে শুরু হল তাদের জীবন। প্রতিদিন একটি করে নতুন পাতা খোলা হতে থাকল, প্রতি দিনের পুরোনো পাতার মত একটি করে নতুন পাতা। তাদের অনা-ড়ম্বর আলোড়নহীন জীবন এমনি চলছিল বেশ। কিন্তু হঠাৎ চকিত শঙ্কিত হয়ে উঠল বির্ধোজ।

চম্পাকলি একদিন পান খেয়ে ঠোঁট লাল করে বির্ধোজের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ঘাড় কাত করে খবর দিল যে ভগবান তাদের আশীর্বাদ করেছেন। তাদের সংসারে আসছে নতুন অতিথি। চম্পা-কলি এমনভাবে বির্ধোজের কাঁধের নিচে তার মাথা এলিয়ে না দাঁড়িয়ে থাকলে বির্ধোজের মুখ নিশ্চয় দেখতে পেত। ভাগ্যিস পায়নি! দেখলে তার অমন সোহাগভরা, অমন নির্ভরশীল আবেদন এমন সস্তা ঠেকত নিজেরই কাছে যে বেচারা আর মুখই দেখাতে পারত না। বির্ধোজ ভাবতেই পারেনি এতটা হবে এত তাড়া-তাড়ি। সে যে এখনও ছেলেমানুষ! কি এক অভিমান-ভরে বাপ-মার কোল ছেড়ে চলে এসেছে—এখনও সে বাপ-মার কথা ভাবে। নিজে বাপ হবে? এ যে কল্পনাই করা যায় না! খবর পেয়ে আঁতকে উঠল সে। চম্পাকলিকে বাহু দিয়ে আকর্ষণ করলো বটে কিন্তু তার মন যেন কোথায় ছুটে পালাতে চাইল। বির্ধোজ ভারি মনমরা হয়ে গেল। তারপর সে করে বসল এক কাণ্ড। বস্তিতে হাতুড়ে বদ্যির অভাব নেই। ধরে আনল একজনকে। বেশ

কিছু টাকা নিয়ে সে খড়দহের এক পোড়ো বাগান থেকে শিকড় খুঁজে এনে বির্ধোজকে দিলে। বির্ধোজ সেই শিকড় জলে ধুয়ে বেটে হালুয়ার সঙ্গে মেখে আদর করে চম্পাকলিকে খেতে দিলে। হালুয়া তিতো লাগায় চম্পাকলি মুখ সিঁটকোতে বির্ধোজ তাকে আশ্বাস দিলে, প্রথম পোয়াতিকে তিতো হালুয়া খেতে হয়, খেলে সন্তানের পরম উপকার।

উপকার হাতে হাতে ফললো। পেটের যন্ত্রণা নিয়ে মেঝেতে পড়ে ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলো চম্পাকলি। এতটা হবে বির্ধোজ ভাবেনি। ভয়ে সে বদ্যিকে ধরে নিয়ে এল। বদ্যি এসে দেখে শুনে বললে—কোন ভয় নেই, ওষুধ ঠিক লেগেছে। ওষুধ যে মোক্ষম লেগেছে তাতে আর সন্দেহ রইল না। গোদাবরী ছুটে এল, আরো দু-চারজন বিলাসপুরী মেয়ে এল তাকে দেখতে, সেবা করতে। তারপর যমে-মানুষে টানাটানি চললো ক'দিন। চাঁপার কলি ঝরে পড়ে আর কি! যাই হোক, তার সন্তানকে হারালেও শেষ অবধি টিঁকে গেল চম্পাকলি।

সে যখন সেরে উঠল তখন তার মন একেবারে ভেঙে গেছে। স্বামীর উপর হারিয়েছে বিশ্বাস। জেনে ফেলেছে ইতিমধ্যে, কী প্রতারণা করা হয়েছে তার সঙ্গে। ঘরসংসার কিছুই তাকে আর টানে না। চম্পাকলি ত্যাগ করল তার স্বামীকে। বির্ধোজের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক তার ঘুচে গেল।

চটকলের বস্তিতে এমনধারা ঘটনা খুব বেশী ঘটে না। কেউ কারো বিয়ে-করা বউ নয় বা বিয়ে-করা স্বামী নয়, অথচ সুখে শান্তিতে দাম্পত্যজীবন কাটিয়ে দিচ্ছে জীবনের শেষ পর্যন্ত, এইটেই বেশী। ঘর ভেঙে গেল, কলহের মধ্যে দিয়ে দাম্পত্য-জীবনের অবসান ঘটল এই দৃষ্টান্তই বরং বিরল।

এরকম ঘটলে বস্তির সকলেই ভারি দুঃখ পায়। চম্পাকলির মতো কোনো সুন্দরী কচি মেয়ের তরুণ জীবনে যখন অজান্তে অকস্মাৎ

এইরকম বিপর্যয় ঘটে যায় তখন বস্তির জীবনটা ভারি করুণ ঠেকে। মনে হতে থাকে যে জীবনের সামান্য যেটুকু অবলম্বন তাও যেন খসে যাচ্ছে। রিক্ত হয়ে যাচ্ছে সব। মানুষকে টেনে ধরে রাখবার কোনো বিত্তই যে বস্তির নেই এই সত্যটা প্রকট হয়ে উঠছে। সকলে ভেবেছিল, আশাহত চম্পাকলি এর পরে হয়ত চটকল ছেড়ে দেশে ফিরে যাবে। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই সে নিজেকে সামলে নিলে। তার প্রাণের প্রাচুর্য ছিল, সামনে পড়ে ছিল সম্ভাবনাপূর্ণ অনেকখানি জীবন, দেহভরা ছিল স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য। কিছুদিনের মধ্যেই সে বেছে নিল আর একটি নতুন স্বামী।

হারু ছিল বিপত্নীক। সত্যিকারের বিয়ে-করা বউ নিয়ে সে বস্তিতে উঠেছিল। কলেরায় মারা যায় তার বউ হঠাৎ। আশ্চর্যের বিষয়, সেবার বস্তিতে মেয়েরাই মরেছিল বেশী। সতেরজন মেয়ে আর একজন পুরুষ। পুরুষরা কাজে যেত সকালবেলা বউদের ঘরে রেখে, সন্ধ্যায় ফিরে এসে দেখত, সেই বউ মরণাপন্ন হয়ে ঘরে পড়ে রয়েছে। রাত পোয়াতেই সব ফরসা হয়ে যেত। এমনি ছিল সেবার কলেরার দাপট। হারুর বউও ঠিক এমনি করে মরে। বড় ভালোবাসত হারু তার বউকে। সেই বউকে হারিয়ে কেমন যেন হয়ে পড়েছিল। সেই সময় নোঙর-ছেঁড়া চম্পাকলির সঙ্গে হঠাৎ কি করে যেন সুর গেল মিলে। আগে পরিচয় ছিল অবশ্য, যেমন বস্তির আর পাঁচটা মানুষের সঙ্গে পরিচয় থাকে। কিন্তু হঠাৎ একদিন কারখানায় দুজনে দুজনের মুখোমুখি পড়ে গেল। পড়ে গিয়ে মনে হল, পরস্পরকে বলবার অনেক কথা আছে। দুজনরেই দুঃখের কথা। মনের কথা। আশাভঙ্গের কথা। তারা নিজের কথা বলল। অপরের কথা শুনল। বলে আর শুনে মনে হল আরো অনেক কথা বলবার আছে, অনেক কথা শোনবার আছে। মনে হল, হয়তো কোনো দিন বলা আর শোনা শেষ হবে না।

আবার চম্পাকলি ঘর বাঁধল। হারুর সঙ্গে ঘর বেঁধে চম্পাকলির মনে হল, এর আগের স্বামী বির্ধোজ তাকে সত্যি করে ভালবাসেনি।

সে ভালবাসতে জানতই না। নিতান্ত শিশু ছিল সে। কিন্তু এবারকার এই পুরুষ শালপ্রাংশুর মত পূর্ণাঙ্গ পরিণত। ভরা এর প্রাণের পাত্র। জানে সে ভালবাসতে। একবার যখন একজন মেয়ে-মানুষকে বিলিয়ে দিয়েছে তার হৃদয়, তাকেও দেবে

তাই দিল চম্পাকলি হারুকে নিয়ে সুখী হল এইভাবে কেটে গেল দু' বছর। দু' বছরের প্রায় প্রতি মাসে চম্পাকলি ভেবে এসেছে, এইবার সে পেটে ছেলে ধরবে। কিন্তু দু' বছরেও তার বন্ধ্যাত্ব ঘুচল না। তারপর কি ভেবে হঠাৎ একদিন চম্পাকলি হারুকে ত্যাগ করে চলে গেল।

চম্পাকলির আকর্ষণের অভাব ছিল না। পড়ে থাকবার মেয়ে সে নয়। অনেক পুরুষই তার পায়ে দিল্ বিকিয়ে দিতে প্রস্তুত থাকত সব সময়। ক'দিনের মধ্যেই সে ঘর বাঁধল আর একজনকে নিয়ে। এইবার বস্তিতে চম্পাকলির নাম খারাপ হল। তৃতীয় স্বামীকে নিয়ে সে ছিল প্রায় এক বছর। কিন্তু সে যা চায় তা পেল না—কোল তার রইল শূন্য। মন তার হয়ে উঠল উদাস। স্বামীকে শুনতে হল গঞ্জনা। শেষে আবার ঘটল একটা বিচ্ছেদ। তার স্বামীই তাকে ত্যাগ করে একদিন চলে গেল।

চম্পাকলি যখন পর পর আরো দুজন স্বামীকে নিয়ে ঘর করে যথারীতি দুজনকেই ত্যাগ করেছে, তখন একদিন তার সখী গোদাবরী এসে তাকে বললে—চম্পাকলি, তুই করছিস্ কি? তোর নাম শুনে যে কানে আঙুল দিতে হয়, লোকে যে তোকে বস্তির বেশ্যা বলতে আরম্ভ করেছে।

চম্পাকলি আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে বললে—ঐ মাতালটার সঙ্গে কি ঘর করা যায় নাকি?

—আর আগেরটা? ওটাই বা কি দোষ করল?

—ওটাও তো মদ খেয়ে আসত। যেবার আমার হাত ধরে হ্যাঁচকা

টান মেরে উঠোনে ফেলে দিয়েছিল, বস্তির পাঁচজনে কি দেখেনি ? আমার কি মান-সম্মান নেই ?

—ওসব কথা ছাড়। পুরুষ মানুষ মদ খাবে না তো খাবে কি ? আর শুনি তো ওরা তোকে যথেষ্ট আদর করে। তোকে গয়না গড়ে দিয়েছে। রেশমী শাড়ি কিনে দিয়েছে। কি ব্যাপার তোর বল দেখি ? এমনি করেই উড়নচণ্ডী হয়ে থাকবি নাকি ?

—তা কেন হবে ? আবার চম্পাকলি চোখের জল মুছলে।—আমার দোষ কোথায় ? পুরুষগুলোকে বিচার কর—ওদের কাউকে বিশ্বাস করা যায় ? তারপর ফিক করে একটু হেসে বললে—নটবরকে দেখেছিস্ ?

—দেখেছি তোর সঙ্গে দু' দিন। ওরই সঙ্গে এবার সংসার পাতবি বুঝি ?

—নটবর বলেছে আমায় বিয়ে করে, এবার যখন ওর দেনা শোধ হয়ে যাবে, দেশে নিয়ে যাবে।

—ওসব তো কতই শুনেছি ভাই। আচ্ছা, সত্যি করে বল্ দেখি চম্পাকলি, তোর ছেলে হয় না কেন ?

চম্পাকলির মুখ কালো হয়ে গেল। সে কোনো উত্তর দিলে না।

গোদাবরী বললে—বলি শোন। নটবরের সঙ্গে তুই ঘর করবি কর। কিন্তু মাটিয়া কলেজে একবার যা। গিয়ে নিজেকে দেখিয়ে আয়। জেনে আয় ওরা কি বলে।

—মাটিয়া কলেজে ? ওরা কি বলবে ?

—যা তবু। বলছি শোন। আর নিজেকে এমন করে নষ্ট করিস্‌নে।

চম্পাকলি ক'দিন ধরে ভাবল। তারপর গোদাবরীকে নিয়ে সত্যিই গেল একদিন মেডিক্যাল কলেজে।

মেডিক্যাল কলেজে তার পরীক্ষা হল। আর শেষ পর্যন্ত জানা গেল, চম্পাকলির আর কোনোদিন ছেলে হবে না। সেই যে

তার প্রথম স্বামী বির্ধোজ তাকে শিকড় বাঁটা খাইয়ে দিয়েছিল, কতখানি খাইয়েছিল কে জানে, মরে যাবারই কথা, ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছে বটে, কিন্তু গর্ভাধারণের ক্ষমতা তার চিরতরে নষ্ট হয়ে গেছে।

চম্পাকলি কাঁদল ক'দিন ধরে খুব। তারপর একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে নটবরের ঘরে গিয়ে উঠল। এবং তারপর থেকে শান্ত শিষ্ট হয়ে তার ঘর করতে লাগল। সেই থেকে চম্পাকলির জীবনে আর গৃহবিচ্ছেদ ঘটেনি।

॥ পনের ॥

দাস সায়েব সেদিন বড় উত্তেজিত হয়ে তাঁর আপিসে এসে ঢুকলেন। সকাল বেলা গিয়েছিলেন কলকাতায়। সেখানে কাজ সেরে বাস্-এ করে ফিরছিলেন চটকলে। আজকাল কয়েকদিন ধরে রোজই তাঁকে কলকাতায় যেতে হচ্ছে। কলের শ্রমিকদের সঙ্গে একটা বিরোধ ঘটেছে কোম্পানীর। লেবার কমিশনার সেটা মেটাবার চেষ্টা করছেন। এই কারণে দাস সায়েবকে কোম্পানীর প্রতিনিধি হিসেবে লেবার কমিশনারের আপিসে হাজিরা দিতে হচ্ছে। কারখানার মোটরে যান, বাস্-এ ফেরেন। ফিরতে বেলা হয়ে যায়। বেলা করে ফিরে মাথায় কয়েক ঘড়া জল ঢেলে চট্ করে খাওয়া সেরে দেরি করে আপিসে গিয়ে আধ বেলা আপিস করেন। সেদিনও তাই ফিরছিলেন। বাস্-এ খুব ভিড়। যখন নামতে হবে, পা-দানিতে এসে দাঁড়িয়েছেন, দেখলেন, পা-দানির উপর দাঁড়িয়ে তাঁরই কারখানার একজন মজুর তাঁকে সেলাম করছে। দশ-বারোজন একসঙ্গে হুড়মুড় করে নেমে পড়তেই সে লোকটাও নামল এবং একটা সিগারেটের প্যাকেট দাস সায়েবের দিকে এগিয়ে ধরল। তার মধ্যে থেকে একটা সিগারেটের মাথা উঁকি মারছে। সারা

বাস-এ দাস সায়েবের সিগারেট খাওয়া হয়নি, কাজেই ওটার আকর্ষণ ছিল। তিনি কিছু না ভেবেই সিগারেটটা টেনে তুলে নিতে যাচ্ছেন, লোকটা কিন্তু প্যাকেটটা সুদ্ধ তাঁর হাতে গুঁজে দিয়ে সেই নামা-যাত্রী আর ওঠা-যাত্রীর ভিড় আর ধাক্কাধাক্কির মধ্যে পাশ কাটিয়ে মুহূর্তে চোখের বাইরে চলে গেল। দাস সায়েব ভিড় কাটিয়ে এসে সিগারেটটা ধরালেন। তাতে একটা টান দিয়ে লোকটার হঠাৎ পালিয়ে যাওয়ার ভঙ্গিটার কথা ভাবতে ভাবতে প্যাকেটটা খুললেন। খুলে দেখেন, অতি যত্নে ভাঁজ করা একটার পর একটা এক শ' টাকার নোট—সবসুদ্ধ আটখানা—আট শ' টাকা।

এই হচ্ছে তাঁর উত্তেজনার কারণ। কোনরকমে স্নান সেরে নাকে মুখে ভাত গুঁজে আপিসে এসে বসলেন। যে লোকটা তাঁকে প্যাকেট দিয়েছিল তার নাম তিনি জানতেন না, কিন্তু মুখটা এতই চেনা যে তাকে খুঁজে বার করা শক্ত হবে না। কিন্তু তিনি তাকে ডেকে না পাঠিয়ে সোজা এগোলেন মিল-ম্যানেজারের আপিসে। ম্যানেজারকে সেই আটখানা নোট আর সিগারেটের খোলটা দেখিয়ে বলে গেলেন যা যা ঘটেছিল।

—কি করা উচিত বলুন।

—আমাকে জিজ্ঞেস করছ ডাস্? তুমি নিজে জানো না কি করা উচিত?

—জানি আমি। তবু আপনাকে জানিয়েই একটা কিছু করতে চাই।

—বেশ, বল তবে কি করতে চাও।

—ওর নামে একটা চার্জশীট দেওয়াই হয়ত উচিত এবং ওকে বলা উচিত ওর নির্দোষিতা প্রমাণ করতে। কিন্তু আমি তা করতে চাই না। এবারকার মত আমি ওকে ধমক দিয়ে ছেড়ে

দিতে চাই। আমার মনে হয় এতেই কাজ হবে, আর ভবিষ্যতে এরকম ঘটনা ঘটবে না।

—বেশ আমি মত দিচ্ছি। তা হলে এ টাকাগুলোর কী হবে?

দাস সায়েব ম্যানেজারের টেবিল থেকে নোট ক'খানা তুলে নিতে নিতে বললেন—এগুলো বাজেয়াপ্ত করা যায় নিশ্চয়ই, কিন্তু ফিরিয়ে দেওয়াই বোধ হয় ঠিক হবে।

ম্যানেজার বললেন—গুড্, তাই দিও।

দাস সায়েব উঠে দাঁড়ালেন। হঠাৎ নিজেকে কেমন যেন তাঁর অসহায় মনে হল। চটকলের সংসারে ঘুষ নেওয়া-দেওয়া ডাল-ভাতের মতো। এখানকার সুরই আলাদা। এখানে তিনিই বেসুরো। ম্যানেজার কথা শেষ করে দাস সায়েবের দিকে কেমন ধারা চোখে তাকিয়ে ছিলেন। মনে হল যেন, তিনি হাসছেন —কি একটা বলতে চান। দাস সায়েব মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন একটু। ম্যানেজার তাঁর গলা থেকে টাইটা খুলে দেয়ালের হুক-এ ঝুলিয়ে রাখতে উঠেছিলেন। টাইটা হাতে ধরেই হঠাৎ বলে উঠলেন—ডা:স্, আই মাস্ট সে ইউ আর এ সিলি অ্যাস্! বলে হোঃ হোঃ করে ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন।

প্র্যাপ্‌স্ আই অ্যাম! বলে দাস দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেলেন।

তারপর নিজের আপিসে ফিরে গিয়ে লোকটাকে ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞেস করলেন—তার আজকের এই ব্যবহারের তাৎপর্য কি?

লোকটা অনেকক্ষণ গাঁইগুঁই করল। সহজে কিছু বলতে চাইল না। দাস সায়েবের সোজাসুজি প্রশ্নে একটু ঘাবড়ে গেল। তার পর অনেক কষ্টে কথাটা প্রকাশ হল। কোম্পানির কুলি লাইনে যে চারখানা ঘর খালি হয়েছে সেই চারখানা ঘর ভাড়া চায়। ঘর পিছু দু-শ টাকা সে সেলামি দিচ্ছে।

—সেলামি ? সেলামি কাকে ?

—আপনারই হাতে তো হুজুর ঘর বিলি করার ভার। আপনাকেই দিচ্ছি। আর কাকে ?

কারখানার কুলি লাইনে দু'দশ পঁচাত্তরখানা ঘর কারখানার মালিক করে দিয়েছিলেন কারখানা তৈরির সময়ে। তখনকার দিনে গঙ্গার ধারে খোলা জায়গা বেছে কারখানা বসানো হয়েছিল নতুন। তাকে ঘিরে কোনো বস্তি ছিল না। তাই প্রজা বসানোর মত মফঃস্বল থেকে কুলি এনে তাদের বসিয়ে দেওয়া একটা অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার ছিল। টিনের ছাদ, ইঁটের দেয়াল, কাঁচা মাটির মেঝে, মানুষের মাথার চেয়ে নীচু দরজা, জানলার কোনো বালাই নেই। দু'শ পঁচাত্তর খানার ঘরের এই ছিল রূপ। দু' শ' পঁচাত্তর জন কুলি তাতে থাকত। ভাড়া নেওয়া হত না। এখন কারখানায় সাড়ে তিন হাজার মানুষ কাজ করে। ঐ দু শ' পঁচাত্তরখানা ঘর এখনও আছে—তাদের সংখ্যা বাড়েনি—কিন্তু ঘরের বাসিন্দার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে এক হাজার। কোনো কোনো ঘরের কিছু সংস্কার হয়েছে। যাদের টিনের ছাদগুলো ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল তার বদলে বসেছে অ্যাজবেস্টস্‌-এর ছাউনি। কাঁচা মেঝের বদলে সিমেণ্টের পাকা মেঝে কোথাও কোথাও হয়েছে। সেই সঙ্গে মজুর কোয়ার্টারের সমস্ত ঘরের ভাড়া ধার্য হয়েছে মাসে বারো আনা করে। এই হল এক হাজার মজুরের মাথা গোঁজবার ঠাঁই। বাকি আড়াই হাজার যে যেখানে খুশি থাকে। বস্তি হয়েছে আজকাল। বস্তির মধ্যে দীনতম ঘর ছ'টাকা থেকে আট টাকায় ভাড়া পাওয়া যায়। বস্তিওয়ালা পরোপকার করবার জন্যে জন্মায়নি—ঘর যেমনই হোক, ঘরের ছাদ যেমনই হোক, দেয়াল যেমনই হোক, বস্তিওয়ালা দর-কষাকষি না করে, যার কাছে যতটা পারে ততটা আদায় না করে কাউকে ঘর ভাড়া দিতে রাজী নয়। তাতে ভাড়া দাঁড়ায় ঐরকম—ছ' টাকা সাত টাকা থেকে

এগার বার টাকা পর্য্যন্ত। এই কারণে কারখানার কোয়ার্টারের জন্যে মজুরদের বড় লোভ। পুরোনো ভাঙা হোক, মেরামত করা হোক, অ্যাজবেস্টাসের ছাদ হোক, মরচে পড়া টিনের ফুটো ছাদ হোক, শুকনো ঘর হোক আর বৃষ্টি-ভেজা স্যাঁতসেঁতে মেঝে হোক, ভাড়া তো মাত্র বারো আনা। মাসে বারো আনার বেশী খরচ নেই মাথা গোঁজবার জন্যে। পারলে একটা ঘরে চারজনও থাকা যায়।

দাস সায়েবের উপর ভার এই ঘর খালি হলেই মজুরদের মধ্যে বিলি করা। কার কখন পালা পড়বে এর বাঁধা-ধরা নিয়ম হয়েছে আজকাল। আগেকার দিনে সর্দাররা, কারখানার বাবুরা প্রচুর টাকা ঘুষ নিয়ে ঘর বিলি করতেন। যারা ঘুষ দিত তারা বলত, সেলামি দিচ্ছে। যারা এই উপায়ে ঘরের দখল পেত তারা যে সব সময় ঘরের বাসিন্দা বা কারখানার মজুর তাও নয়। তারা হয়তো একেবারেই বাইরের লোক কিংবা কারো দালাল—নিজের নামে ঘরের দখল নিয়ে তারপর পাঁচজন, ছজন, সাতজন করে ভাড়াটে বসিয়ে প্রত্যেকের কাছ থেকে মোটা ভাড়া আদায় করত। এই নিয়ে ভারি গোলমাল হয়, মারামারি হয়, খুনোখুনিও হয়েছিল। কোম্পানী তাই আজকাল ঘর বিলি করবার নিয়মকানুন বেঁধে দিয়েছেন। লেবার অফিসার দাস সায়েবের উপর ভার দিয়েছেন, ঘর খালি হলে সেই নিয়ম অনুযায়ী ঘর বিলি করতে।

দাস সায়েব এতক্ষণে বুঝলেন ব্যাপারখানা। বললেন—তোমায় কে বলেছে সেলামি দিলে ঘর পাওয়া যায় ?

—পাওয়া যেত হুজুর।

—যেত, এখন আর যায় না। এটা জেনেও সেলামি দিতে এসেছিলে এই তো ?

লোকটা চুপ করে রইল।

দাস সায়েব তাকে ধমকধামক দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে, এখন সময় অন্যরকম পড়েছে।

বস্তির সবাই জানে যে, পাশের ছুটো চটকলে আজও সেলামি গুঁজে ঘরের দখল পাওয়া যায়। লেবার অফিসার এসেও সেখানে বিশেষ কিছু তফাত হয়নি। তাই এ কারখানায় যে কিছু অন্যরকম হয়েছে, চিরাচরিত নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছে, এটা উপলব্ধি করাই মুশকিল।

টাকাগুলো ফেরত দিয়ে দাস তাকে জিজ্ঞেস করলেন—এসব টাকাই কি তোমার? না, আরও অংশীদার আছে?

—সবই আমার হুজুর।

—এত টাকা তুমি জমিয়েছ?

—জমাবো কোথা থেকে হুজুর? আপনি তো সবই জানেন। ধার নিয়েছি।

তোমার মুখ দেখে এতটাকা ধার দিল?

বস্তিকে আপনারা ঘৃণা করেন। কিন্তু হুজুর টাকায় ছ আনা আট আনা সুদ দিলে এই বস্তি থেকে আট শ' কেন আট হাজার টাকা এক রাত্তিরে আমরা যোগাড় করতে পারি। আর বস্তির মজুররা হুজুর পাওনাদারের টাকা মেরে পালাতে জানে না।

॥ ষোলো ॥

কথাটা ঠিক। বস্তির মজুররা যতই গরীব হোক, অভাগা হোক, যতই ছেঁড়া নেংটি পরুক, পাওনাদারদের টাকা মেরে পালাতে জানে না। এমন খুব কমই দেখা যায় যে মজুর সত্যিই পাওনাদারকে ঠকিয়েছে। দাস সায়েবের মনে পড়ে আমাদের মিলের এক সুদখোর দরোয়ানের কথা। চড়া হারে টাকা ধার দিত, কিন্তু কোনো রকম সই সাবুদ লেখা-পড়া ছিলনা। দেনদাররা সুদে বাঁধা হয়ে থাকত দরোয়ানের কাছে। আসলের দুগুণ, চার গুণ, দশ গুণ,

বিশ গুণ সুদেই উঠে আসত, তবু দেনা শোধ হত না। সবাই সুদ-সুদ্ধ আসল শোধ করে দেবার চেষ্টা করে চলত বলেই তার পক্ষে প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল। নাম ছিল তার হাজারি দরোয়ান। লোকে তাকে ডাকত লাখো হাজারি বলে। অনেকেরই বিশ্বাস, সে লক্ষপতি ছিল। একেবারে কেউ যে তাকে ঠকায়নি তা অবশ্য ঠিক নয়। হাজার দেনদারের মধ্যে দু-একজন টাকা না দিয়েই সরে পড়ত। লাখো হাজারি সেটা গায়ে মাখত না; ধরেই নিয়েছিল, হাজার জন সৎলোকের মধ্যে এক-আধটা অসৎ পুরুষ থাকবেই। প্রতি হপ্তায় মাইনের দিন হাজারিকে দেখা যেত একটা তেল-চিট্‌চিটে খাতা নিয়ে মাথায় একখানা লাল গামছা বেঁধে ঘাসের উপর বসে আছে তার প্রকাণ্ড ভুঁড়ি ঝুলিয়ে। এই তেল-চিট্‌চিটে খাতায় তার সমস্ত দেনদারের নামধাম ও আসল ও সুদের হিসেব। লোকজন একের পর এক হাজারির কাছে আসছে যাচ্ছে আর হাজারি তার খাতায় দাগ কেটে চলেছে। ওখানে হাতে-হাতে টাকা-আনার কোনো লেনদেন হচ্ছে না। শুধু একটু ফিস্‌ফাস্ আর দাগ কাটা। একটা কথা পর্যন্ত শোনা যায় না। কার সাধ্য বোঝে যে, ঐ ঘাসের উপর এক বিরাট কারবার জমে উঠেছে। সব থেকে আশ্চর্য এই যে, হাজারি এক বর্ণ লেখাপড়া জানত না; সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিল। সে তার তেলচিটে খাতায় যে-সমস্ত দাগ টানত তার অর্থ তার কাছে অতি সহজে বোধগম্য হলেও আর কারুর পক্ষে তা বোঝা সম্ভব ছিল না। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ডিটেকটিভ এলেও সে খাতার রেখাগুলির অর্থোদ্ধার করতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

লাখো হাজারির গুণ ছিল—অনেক। কোনোদিন সে কখনো কোনো দেনদারের গায়ে হাত তোলেনি কিংবা সামান্য গালাগালি পর্যন্ত করেনি। সেদিক দিয়ে সাধারণ সুদখোরের সঙ্গে হাজারির ছিল মস্ত পার্থক্য। একবার একজন মজুর তার প্রায় পাঁচ হাজার টাকা

মেরে পালিয়ে যায়। অন্য কেউ হলে এই নিয়ে একটা হইচই লাগিয়ে দিত। হাজারির কিন্তু ভ্রুক্ষেপ নেই। শুধু বললে—জমা ছিল আমার কাছে হয়তো আগের জন্মে তাই নিয়ে গেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে যে, মজুর সুদ দিয়ে দিয়ে হন্যে হয়ে গিয়ে কোনোমতেই আসল উসুল করতে পারছে না। হাতে-পায়ে ধরলে লাখো হাজারি তাকে ছেড়ে দিত। এইসব কারণে সুদখোর হলেও দেনদাররা তাকে মহাত্মার মত দেখত।

এই হাজারি চাকরি থেকে যেদিন অবসর নিল তখন তার কত যে টাকা তার লেখাজোকা নেই। সকলেই ভেবেছিল, হাজারি এবার দেশে গিয়ে দালান তুলে আরামে বাস করবে। কিন্তু চটকলের নোংরা আবহাওয়া আর তার তেলচিটে খাতার মোহ লাখো হাজারিকে আটকে রেখে দিলে। অবশ্য চটকলের মধ্যে আর সে থাকতে পেল না। চাকরি শেষ হয়ে গিয়েছিল বলে দরোয়ানের কোয়ার্টার ছেড়ে তাকে মিল-এর বাইরে যেতে হল।

কিছুদিন যায়, দাস সায়েব একদিন তাঁর বাংলোয় বসে কি একটা জরুরী কাজে ব্যস্ত, সেই সময় লাখো হাজারি এসে দাঁড়ালো সেলাম ঠুকে। দাস সায়েব তো চমকে উঠলেন। লক্ষপতি সে। না-হয় আগে দরোয়ানই ছিল, আজ তো আর নেই! ইচ্ছে করলে দাস সায়েবকে আজ সে কিনে নিতে পারে। তিনি মহা ব্যস্ত হয়ে বললেন —কি ব্যাপার হাজারি? ব'সো, ব'সো। হাজারি দাঁড়িয়েই রইল। তারপর কুশল প্রশ্ন, এটা ওটা বাজে কথা খানিক বলে এদিক ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ বলে বসল—হুজুর, আমায় বাঁচান।

—সে কি হাজারি, আমি বাঁচাবো কি?

হাজারি করুণ মুখ করে বললে—আমাকে একখানা কুলি-লাইনে ঘর দিন হুজুর। যেমন হোক ঘর। এই বলে টেবিলের উপর এক একখানা করে দশখানা এক শ' টাকার নোট রাখল। রেখে বললে—ওটা হুজুর আমার নজরানা। ঘর পেলে আরো চার হাজার টাকা

দেব। দাস সায়েব আবার চমকে উঠলেন। একটু সামলে নিয়ে বললেন—লাখো হাজারি তুমি তো লক্ষপতি। যেখানে তোমার খুশি সেখানে একটা দালান তুলে থাকতে পার। তুমি থাকতে চাইছ কুলি-লাইনে? তা-ও এত টাকা ঘুষ দিয়ে?

—আমি তো ভাল কুঠি নিয়ে আছি হুজুর। কিন্তু চটকলের বাইরে, কুলি-লাইনের বাইরে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে। আমি ফিরে আসতে চাই।

দাস সায়েব বললেন—কেমন করে তুমি ফিরবে? তোমার তো আর চাকরি নেই। তুমি রিটায়ার করেছ।

—যেমন করে হোক আমায় একটা মাথা গোঁজবার ঠাঁই করে দিন হুজুর চটকলের ভিতরে। কুলি-লাইনে তো সব সময় ঘর খালি হচ্ছে। আমি না হয় হুজুর আরো কিছু টাকা বাড়িয়ে দিচ্ছি।

—কুলি-লাইনে বাইরের লোককে ঘর দিই কি করে? আগেকার দিন তো আর নেই। এখনকার আইন-কানুন সব অন্যরকম, তুমি তো জানো লাখো হাজারি।

লাখো হাজারি আশা করে এসেছিল। দাস সায়েবের কথার ধরন শুনে ভেঙে পড়ল। সে কাঁদো কাঁদো হয়ে দাস সায়েবকে অনেক কথা বলল। সারাজীবন সে দরোয়ানি করেছে, কিন্তু সে দরোয়ানিও বোঝে না, পাহারাদারিও বোঝে না। বোঝে একমাত্র তার সুদের ব্যবসা। সেই সুদের ব্যবসা আজ তার হাতছাড়া হতে চলেছে। বেচারার সেই যে পুরোনো তেলচিটে খাতা তার রেখাঙ্ক আজ তার নিজের কাছেই থেকে থেকে দুর্বোধ্য ঠেকে। থেকে থেকে সে ভুলে যায় তার জটিল রেখার প্রকৃত অর্থ কি? নতুন কুঠিতে বসে তার মন উদাস হয়ে যায়। মাঝে মাঝে ভয় হয়, দেনাদাররা তাকে হয়তো খুনই করে যাবে। ভয়ে সে দরজায় খিল এঁটে বসে থাকে। তার সেই ঘাসের উপরে বসে সুদের হিসেব কষা পুরোনো

দিনগুলির কথা ভাবে আর নিঃশ্বাস ফেলে। থেকে থেকে মনে হয়, মিল-এর আবহাওয়ার মধ্যে ফিরে গেলেই হয়তো আবার সে স্বাভাবিক হবে। আর নইলে—তার ধ্বংস অনিবার্য। কুলি-লাইনে নোংরা স্যাঁতসেঁতে গন্ধওয়ালা খোলা ড্রেনের পাশে শুধু একটু মাথা গোঁজবার ঠাঁই—এই হলেই তার চলে যায়।

দাস সায়েব বললেন—শোনো লাখো হাজারি, তুমি অন্য কিছুতে মন দাও। চটকলে সুদের ব্যবসা তো অনেক দিন করলে আর কিছু কর না, হয়তো তাতেই তোমার ভালো হবে।

—তাও করেছি হুজুর। মন বসতে চায় না। পুরোনো কার-বারের কথা মনে পড়ে আর বুকটা কেমন করে ওঠে।

লাখো হাজারির আর কোনো গতি নেই—সুদখোরের দৈত্য এসে তার ঘাড়ে চেপে বসেছে। এখন আর ছেড়ে দেবার নাম করে না।

হাজারি মাথা হেঁট করে বসে ছিল অনেকক্ষণ।—যা কপালে আছে হবে। বলে উঠে দাঁড়িয়ে দাস সায়েবকে সেলাম করে বিদায় নিলে।

এর বেশ কিছুদিন পরে দাস সায়েব একদিন শেয়ালদা স্টেশান দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন, হঠাৎ লাখো হাজারির সঙ্গে দেখা। নর্থ স্টেশানে ঢোকবার মুখে সিঁড়ির উপর এক কোণে লাখো হাজারি চুপটি করে বসে রয়েছে। মাথায় তার একটা লাল গামছা বাঁধা। মুখটা বড় শুকনো। ভারি অন্যমনস্ক, ভারি অবসন্ন মনে হয়। মাথায় লাল গামছা দেখেই দাস সায়েব চিনেছিলেন। অমনভাবে স্টেশানের সিঁড়ির উপর হাজারিকে বসে থাকতে দেখে দাস সায়েব একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কি খবর হাজারি? কেমন আছ?

দাস সায়েবকে দেখে হাজারি হাউহাউ করে কেঁদে উঠল।

দাস সায়েব কি বলবেন ভাবছেন, লাখো হাজারি বলে উঠল— আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে হুজুর। আমার আর কিচ্ছু নেই। আমি আজ পথের ভিখারী।

তারপর দাস সায়েব আস্তে আস্তে শুনলেন তার সব কথা। চটকলে সুদের ব্যবসায় আর যখন সুবিধে হল না তখন সে ভাবলে দেশে ফিরে যাবে। আজ যায়, কাল যায়, দেশে ফেরা হয় না। মন চায় না একেবারেই। দেশে তার কি আছে? কে-ই বা আছে? শহরেই তার সব। সুদের ব্যবসা যদি না হয়, অন্য কিছুর ব্যবসা করবে সে। দাস সায়েবের সঙ্গে যখন শেষ দেখা হয় তখন সে কিছু কিছু কাপড়ের ব্যবসা করছিল। বড়বাজার থেকে কাপড়ের গাঁট কিনে এনে মিল-এর বাইরে মাটির উপর চট পেতে তার উপর বিছিয়ে বেচত। কিন্তু সবাই বলত, তার মত লোকের পক্ষে ও বড় নীচু কাজ। হাজারিরও তাই মনে হত। কে যেন পরামর্শ দিল লরি কিনে লরি খাটানোর ব্যবসা করতে। হাজারির পছন্দ হল পরামর্শটা। দু-তিনজন লেখাপড়া জানা বিশ্বাসী লোকও জুটে গেল যারা তাকে কাজে সাহায্য করবে। পাঁচখানা লরি কিনে সে কারবার শুরু করে দিলে। দু-তিন মাস বেশ চললো আর তার পরেই ঐ দু-তিনজন বিশ্বাসী লোক টাকার গন্ধ পেয়ে তাকে ঠকাতে আরম্ভ করলে। হাজারি এ ব্যবসায়ে নতুন নেমেছে, ভালো বোঝে না। যে যা বলে তাই শোনে। শেষে কারবারের কোথায় যে কি হচ্ছে, সে নিজে তার কিছু হদিস পেলে না। লেখাপড়া তো জানেই না, তার উপর কারবারের তার যে প্রধান সহায়, হিজিবিজি লেখা তেলচিটে খাতা এ ব্যবসায় তা-ই নেই। গলা অবধি ডুবে গেল সে দেনায়। আদায়পত্র যা ছিল তা নিয়ে কোথায় সরে পড়ল সেই লেখাপড়া জানা তিনজন বিশ্বাসী লোক, তাদের কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না। শেষে তিনখানা লরি একের পর এক করে বসল অ্যাক্সিডেন্টে।

আর তার ফলে থার্ড পার্টি ইনসিওরেন্স আর উকিলের খরচ দিয়ে লাখো হাজারি আজ সর্বস্বান্ত।

দাস সায়েব কি বলে তাকে সান্ত্বনা দেবেন, ভেবে পেলেন না। তাঁর গাড়ির সময় হয়ে গিয়েছিল। বললেন—হাজারি, মিল-এর বাইরে তুমি যদি কোনো কারবার করবার কথা ভাবো, কাপড়ের কি বাসনের দোকান, তাহলে আমার কাছে একবার এসো। জানো তো ভালো জায়গা পেলেই তবে দোকান জমে। আমি এদিক দিয়ে হয়তো তোমায় কিছু সাহায্য করতে পারি।

হাজারি বললে—আপনার অনেক মেহেরবানি।

তারপর লাখো হাজারির যে কি হল, কেউ জানে না। আমাদের মিল-এর আশেপাশে আর তাকে দেখা যায়নি। দাস সায়েবের সঙ্গে সে কোনোদিন দেখা করতে আসেনি।

॥ সতের ॥

আবার এক ফাল্গুনের গোড়ায় ফগুয়া আমাদের আপিস ঘরে ঢুকে সুজিতের আর আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

—কি রে ফগুয়া, কি হল আবার?

—দেশে যাচ্ছি হুজুর।

—ভালো ভালো, বুড়ো বাপকে দেখে আয়। কতদিন পরে যাচ্ছিস?

—সাত বছর হয়ে গেল হুজুর।

—সে কি রে? দেখতে দেখতে এতদিন কেটে গেল? এতদিন দেশে যাস্ নি?

—ফি বছর ভেবেছি হুজুর ধার-দেনা মিটিয়ে তবে দেশে যাবো। দেনা মেটেনি, তাই যাইনি। আপনারা এখানকার সুদের হার সবই

জানেন। এই সাত বছরে হুজুর শুধু সুদই গুনেছি—আসল শোধ করেছি আর কতটুকু ?

—তাই বুঝি আর অপেক্ষা করতে চাস্ না ? বুঝেই নিয়েছিস্ যে ও আর কোনোদিন শোধ হবার নয়। তা বেশ, ঘুরেই আয়। মনটা অন্তত: চাঙ্গা হবে।

ফগুয়া দাঁড়িয়েই থাকে। আরো কি যেন বলবার আছে।

সুজিত বললে—বল্ কি বলবি।

ফগুয়া একটু ইতস্তত: করে বললে—পাঁচ মাসের জায়গায় যদি ছ মাস হয়ে যায়, দয়া করে নামটা কেটে দেবেন না।

—সে কি রে ? এতদিন কি করবি দেশে ? বুঝেছি, সাদি করতে যাচ্ছিস্ তাহলে ?

ফগুয়া লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। তারপর লাজুক মুখে হেসে বললে—সাদি তো হুজুর আমাদের দেশে সকলকেই করতে হয়।

—নতুন করে কত ধার করে নিয়ে যাচ্ছিস রে ফগুয়া ?

—তিন শ টাকা।

—কত দেনা আছে তোর এখনও ?

—সাড়ে চার শ টাকা। বাবা বিমারি। মাঝে মাঝে কিছু কিছু পাঠাতেও হয় আজকাল দেশে।

—ফিরে এসে থাকবি কোথায় ? গোদাবরীর সঙ্গে ?

—হাঁ হুজুর। নইলে কোথায় আবার ঘর পাবো ? নতুন ঘর অনেক টাকা লাগবে। গোদাবরী রাজিও হবে না। গোদাবরী বড় ভালো জেনানা হুজুর।

ভালো জেনানা ! সবাই বলে সে তার বউ। শুধু ফগুয়া বলে —ভালো জেনানা। কারখানার লাইন-এ একই ঘরে বাস করে এক পুরুষ আর এক স্ত্রী।

ফাল্গুনের প্রথম ছোঁয়ায় গাছে গাছে জেগে ওঠে যখন পাতার কুঁড়ি, চোখ কাকে যেন খুঁজে বেড়ায়, প্রাণ চায় কাকে পেতে, সেই

সময় বস্তির স্ত্রী তাঁর নিজের ঘরের পুরুষকে হাত ধরে দেশে পাঠিয়ে দিলে বিয়ে করে আসবার জন্যে। বিয়ে করে বউকে রেখে আবার ফিরে আসবে সে কারখানায়। উঠবে এসে বস্তির সেই স্ত্রীলোকেরই ঘরে—একমাত্র যেখানে তার আস্তানা।

ফগুয়া চলে গেল দেশে। সাড়ে সাত শ টাকা দেনা মাথায় করে গেল। যে ছ-মাসের জন্যে গেল, সে ছ-মাস তার কোনো রোজগার নেই। কিন্তু সুদের অঙ্ক বাড়বে। কত হারে সুদ কে জানে? দেশে গিয়ে বিয়েই করুক আর নাই করুক, নরম নরম ছোট্ট বউটি নিয়ে নতুন সংসার পাতবার যতই ইচ্ছে থাক, বুড়ো বাপের কাছে বউকে একা রেখে তাকে ফিরতে হবে দেনা শোধ করবার জন্যে। আসতে হবে কারখানার ঐ নোংরা পাঁচিলের গণ্ডির মধ্যে তার সেই দুরন্ত নদীর ধারের ঢেউ-খেলানো ধানের ক্ষেতের আশ্রয় ছেড়ে। তবু তো সে গোদাবরীর মত সঙ্গিনী পেয়েছে—যে তাকে আশ্রয় দিয়েছে, যে তার সত্যিকারের স্ত্রী নয় অথচ তার দেখা শোনা করে, যার উপর নির্ভর করা যায়, যে না থাকলে বস্তীর জীবন কত নিরানন্দ হত কে জানে?

ছ-মাসের মত ফগুয়া চলে গেল দেশে।

দেশ স্বাধীন হবার পর অনেকে বলেছিল, এইবার ইংরেজদের পাততাড়ি গুটোতে হবে। চটকল বেচে দিয়ে চলে যেতে হবে দেশে। বাঙ্গালীর তো আর টাকা নেই, চটকল কিনে নেবে সব মাড়োয়ারীরাই। অনেকে বলেছিল পাটই যখন রয়ে গেল পাকিস্তানে, তখন দেখো ইংরেজরা এখানকার কলগুলো সব তুলে নিয়ে গিয়ে পাকিস্তানে বসাবে। আরো অনেকে অনেক রকম ভবিষ্যৎবাণী করেছিল ভারতবর্ষের এই চটশিল্পের কি হবে নিয়ে। চটের প্রথম কল স্থাপিত হয়েছিল রিষড়ের ওয়ারেন হেষ্টিংসের বাগানবাড়িতে

১৮৫৫ সালে। অকল্যাণ্ড নামে এক সায়েব আর বিশ্বম্ভর সেন নামে এক বাঙালী দুজনে মিলে দাঁড় করান রিষড়া মিলকে। সিপাহী বিদ্রোহে সে চটকল পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তারপর তার জায়গায় আবার এক চটকল খাড়া করা হয়। তখনও পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বেশীর ভাগ লোকই অনিশ্চিত। তা ছাড়া অনেকেই জল্পনা কল্পনা করত ভবিষ্যৎ চটশিল্প প্রতিষ্ঠিত হবে স্কটল্যাণ্ডে না বাংলাদেশে? শেষে যখন দেখা গেল স্কটল্যাণ্ডের তুলনায় বাংলায় নামমাত্র হারে চট শ্রমিক পাওয়া যাবে, আর তার ফলে চটের থলিরই মত স্ফীত হবে লাভের কড়ি তখন কোনো সন্দেহ রইল না যে, বাংলা দেশই হবে উক্ত শিল্পের প্রধানতম আস্তানা। তারপর ১৮৮৪ সালে যেদিন প্রথম পনেরটি পাটকল নিজেদের যৌথ স্বার্থ রক্ষা ও বৃদ্ধির খাতিরে ইণ্ডিয়ান জুট ম্যানুফ্যাক্চারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সৃষ্টি করল, সেই দিন থেকে শিল্প হিসেবে পাটশিল্প পৃথিবীর বাজারে তার স্থান করে নিল। প্রায় এক-শ বছর হতে চললো এই শিল্প। ১৯৪৭ সালে চটকল আর কাঁচা পাটের প্রধান অংশ দুই বিভিন্ন স্বাধীন এবং অল্পবিস্তর কলহমান দেশে পড়ায় অনেকের মনেই সন্দেহ ছিল এবার কি হয়, কি হয়? কিন্তু অতি শীঘ্রই দেখা গেল, ভারতীয় চটসংস্থা তথা ভারতের চটশিল্পের এখনও যথেষ্ট জীবনীশক্তি আছে। প্রথমেই তারা দেশের সরকারকে বোঝালো যে, ভারতবর্ষের পাটের উৎপাদন বাড়িয়ে চটকলগুলিকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে হবে। পাটের জন্য বিদেশের দিকে তাকালে চলবে না। তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল তারই। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধের সময় কাঁচা টাকার বাজারে কোনো কোনো চটকলের উপরতলার কর্তাদের পরিচালনা ও চুরি বেড়ে গিয়েছিল। যুদ্ধের পরে তাই কিছু কিছু মিল অচল হবার মতো হয়ে এল। সেগুলি এবার হাত বদলাতে শুরু করল। ভালো করে ব্যবসা চালিয়ে এসেছে যে-সব কোম্পানী তাদের হাতে গিয়ে পড়তে লাগল ঐ সব মিল। এইভাবে শিল্পের সঙ্কট রক্ষা

পেল। তৃতীয়ত, এরা ধুয়ো তুলল যে, এইবার চটকলগুলিকে আধুনিক করে তুলতে হবে—সরকার বাহাদুর টাকা ধার দিন। সে কথা পরে বলছি। আমাদের কোম্পানী কয়েকটি হাবুডুবু খাওয়া চটকল এই সময় কিনে ফেলল। তার মধ্যে একটি কার্লাইল মিল। কার্লাইল মিল-এর ইতিহাস যেমনই রোমাঞ্চকর তেমনই করুণ।

কার্লাইল মিল ছিল চালু মিল। বড় কোম্পানির মিল। লাভ হত প্রচুর। শেয়ার হোল্ডাররা মোটা ডিভিডেণ্ড পেত।

কলকব্জা চালু রাখেন ইঞ্জিনীয়াররা। কাঁচা মাল কেনেন আর তৈরী মাল বেচেন ঝুনো ঝুনো সায়েবরা। কিন্তু চটকলের নানা বিভাগের যে মানুষগুলো, যারা তাদের নিজের ভাষায় চটকলের বিভিন্ন বিভাগকে বলে—হাথীকল, ঘড়িকল, গিরান, রোবিং, মাগীকল, ফুকা নলী আর তাঁত কল তারা কিন্তু চালিত হয় নরোত্তম নামে নিরক্ষর সর্দারের ইঙ্গিতে। নরোত্তম সর্বেসর্বা। কলকব্জার আসল যে উৎপাদন শক্তি, আসল যা প্রাণ, অর্থাৎ ঐ জীবন্ত মজুরগুলো, তাদের ভাগ্য-নিয়ন্তা নরোত্তম সর্দার। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে অন্যান্য কারখানার মতো এখানেও অবশ্য সম্প্রতি লেবার দপ্তর খোলা হয়েছে। কিন্তু নরোত্তম যেখানে, সেখানে লেবার দপ্তর করবে কি? নরোত্তম সর্দারের দাপট অক্ষুণ্ণ। নরোত্তমকে জিজ্ঞেস করলে সে বলে যে, সে একজন সাধারণ লাইন সর্দার—কয়েকটা স্পিনিং ফ্রেম তার তাঁবে। কিন্তু যারা তাকে চেনে তারা জানে যে, সে সারা কারখানার মজুরদের হর্তা-কর্তা। তাকে বাদ দিয়ে শুধু লেবার আপিসের সাহায্যে কারখানা চালানো, কারখানার কুলিদের নিয়ন্ত্রিত করা এবং উৎপাদন বজায় রাখা, কারখানার কর্তারা কল্পনাই করতে পারেন না।

এই যখন অবস্থা তখন কলকাতার আকাশে এসে পড়ল একদিন

জাপানী বোমারু উড়োজাহাজ। কলকাতার উপর শুরু হল বোমারু আক্রমণ। কার্লাইল মিল-এর কুলি-বস্তির আধমাইল দক্ষিণে পঁচিশ পাউণ্ড ওজনের একটা বোমা এসে পড়ল। দু'চার জন লোক জখম হল। মারা অবশ্য গেল না কেউ কিন্তু আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল আগুনের মত চারদিকে। কার্লাইল মিল-এর সমস্ত মজুর ভীরু খরগোশের মত পালাতে শুরু করলে কলকাতা ছেড়ে। লোকের অভাবে মিল বন্ধ হয় হয়।

ব্যাপারের গুরুত্ব বুঝে হেড-আপিসের বড়সায়েব কলকাতা থেকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। যুদ্ধের মাঝখানে কারখানা বন্ধ হলে কি চলে? চটের থলি, চটের কাপড়, চটের ফিতে তো সাক্ষাৎ যুদ্ধের রসদ। আর তা ছাড়া এই হচ্ছে লাভের মরসুম আর ঠিক এই সময়েই কি-না কুলিগুলো বিগড়ে গেল? শুয়োরের বাচ্চা কুলি মজুরগুলোর প্রাণের মূল্যই বা কি যে বোমার ঘায়ে মরবার তাদের এত ভয়? বড় সায়েব তাঁর প্রকাণ্ড গাড়ি হাঁকিয়ে সেই প্রায়-শূন্য কারখানায় ঢুকে প্রথমেই ডেকে পাঠালেন নরোত্তম সর্দারকে। খুব এক চোট ধমক দিয়ে বললেন—সর্দার। এ সব হচ্ছে কি? ঐ কাপুরুষ কুকুরগুলোর জন্যে তোমার লজ্জা হচ্ছে না? সর্দার! মিল তোমায় চালু রাখতে হবে! পারবে কি না বল। তোমারই উপর আমার ভরসা।

সর্দার তার নিজের বুকের উপর একটা ঘুষি মেরে বললে—যো হো গয়া ও হো গয়া হুজুর। লেকেন, নরোত্তম আজও জিন্দা আছে। সব কামের ভার আমার উপর ছেড়ে দিন। দেখে নিন নরোত্তম দেশে গিয়ে একবার হাঁক দিলে দেশোয়ালীর দল ঝাঁক বেঁধে চলে আসে কি না।

এই বলে নরোত্তম সেই দিনই চলে গেল দেশে এবং সত্যি সত্যিই কুলির ঝাঁক নিয়ে ফিরল। মজুরের অভাবে কারখানার অমন যে অবস্থা হয়েছিল, ক' দিনের মধ্যেই তার চেহারা ফিরে গেল—মিল চলতে

শুরু করল আবার প্রায় আগের মত। কারখানার মধ্যে লেবার দপ্তর খোলায় নরোত্তমের প্রতিষ্ঠা যতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়েছিল, তা সম্পূর্ণ মুছে গিয়ে আবার হল তার একচ্ছত্র আধিপত্য। লেবার আপিসটা রইল বটে, কিন্তু শুধু নামে। এবার থেকে নরোত্তমকে কুলিরা বলতে শুরু করল—বড় সাহেব। নরোত্তম ফিনফিনে মিহি ধুতি পাঞ্জাবি পরে পোলাও কালিয়া মদ খেয়ে প্রতিদিন সন্ধ্যায় ট্যাক্সি চড়ে চৌরঙ্গীতে গিয়ে দামী সিট-এ বসে সিনেমা দেখতে শুরু করল। কুলি ভর্তি করা, কুলি খাটানোর ব্যাপারে মিল-এর ম্যানেজার নরোত্তম ছাড়া আর কারো উপর নির্ভর করতে পারতেন না। নরোত্তম হয়ে দাঁড়ালো প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী। বলতে গেলে মিল তারই কথায় উঠতে বসতে শুরু করল।

নরোত্তমের মেয়ের বিয়েতে সায়েবরা সব নিমন্ত্রিত হলেন। বড় সায়েব তো সবার আগে। বড় সায়েব হয়ে পড়েছিলেন নরোত্তমের দোস্ত্ এবং দোস্তির খাতিরে নরোত্তম প্রতি মাসে পাঁচ সাত শ টাকার নানান উপহার বড় সায়েবের কুঠিতে নিজের হাতে পৌঁছে দিয়ে আসত। বিয়ের আসর বসল প্রকাণ্ড শামিয়ানার নীচে। ফিরপো থেকে খাবার চলে এলো সায়েবসুবোদের জন্যে। বড় সায়েব মস্ত এক টুকরো মুল্যবা'ন জর্জেট উপহার দিলেন। অন্যান্য সায়েবরা সবাই মিলে চাঁদা করে কিনে দিলেন একটা দামী উপহার। সায়েবরা পেট ভরে খাবার আর মদ খেলেন।

এই ভাবেই চলেছিল। নরোত্তমও বেশ নির্ভাবনায় কাটিয়ে যাচ্ছিল তার সুখের দিনগুলি। এমন সময় ঘটল এক অভাবিত ঘটনা। সেই যে কলকাতায় এক বিখ্যাত হরতাল হয়; যাকে বলা হ'ল 'পোস্টাল ষ্ট্রাইক' সেদিন কলকাতার সমস্ত আপিস তো বন্ধ হয়ে গিয়েইছিল, অনেক কারখানার সঙ্গে কার্লাইল মিলও বন্ধ হয়ে গেল। নরোত্তম এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। সে ভাবতেই পারেনি তাকে না জানিয়ে কুলিরা এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে

নিজেদের বুদ্ধির উপর নির্ভর করে এগিয়ে যেতে পারে। সে যখন স্নান করতে যাচ্ছে সেই সময় হঠাৎ খবর পায়। যখন শুনল যে, কারখানায় পুরো হরতাল হয়ে গেছে, মাথায় রক্ত চড়ে গেল। গায়ে একটা গেঞ্জি পর্যন্ত না দিয়ে খ্যাপা ষাঁড়ের মত ঢুকতে যাচ্ছিল কারখানার মধ্যে। ভেবেছিল সামনে যাকে পাবে তার দাঁত অন্তত উপড়ে নেবে। কিন্তু প্রথমেই চোখে পড়ল হাতে ঝাঁটা নিয়ে একসার মজুরনী দাঁড়িয়ে আছে। নরোত্তমের মাথায় সুবুদ্ধি প্রবেশ করায় সে আর না এগিয়ে বরং পিছিয়ে গেল। অনেক বেলায় কলকাতা থেকে সায়েব এলেন। এসে নরোত্তমের পিঠ চাপড়ে বললেন—নরোত্তম তুমি থাকতে এটা হল ? দেখো যেন আর না হয়।

এই স্ট্রাইকের পরেই বোঝা গেল নরোত্তম যে সাম্রাজ্য গড়েছিল তাতে ফাট ধরেছে। সেটা বুঝে নরোত্তম গেল আরো খেপে। সেবার অফিসাররা সেই সময় বার বার মিল ম্যানেজারকে এবং হেড আপিসকে বলতে থাকলেন যে, এই একটা লোকের হাতে বড় বেশী ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। এটা ভালো হচ্ছে না। এটা শোধরানো দরকার। কর্তৃপক্ষ কিন্তু যে দুর্দিনে নরোত্তম মিলকে বাঁচিয়েছে তারই কথা ভেবে নরোত্তমকে তার স্থান থেকে একটুও হটালেন না।

চলল কিছুদিন এইভাবে। মনে হল যেন লেবার দপ্তরের অনিচ্ছা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের আনুকুল্যে নরোত্তমের প্রভাব নরোত্তমের ক্ষমতা এখনও বহুকাল অক্ষুণ্ণই থাকবে।

তারপর একবার মিল-এর ম্যানেজার কিছুদিনের ছুটিতে দেশে গেলেন। তাঁর জায়গায় এসে বসলেন নতুন ম্যানেজার। নতুন ম্যানেজার আসায় লেবার অফিসারের একটু সুবিধে হল। নতুন ম্যানেজার সর্দারী-প্রথাকে ভাল চোখে দেখতেন না। লেবার অফিসার সেই সুযোগ নিয়ে নরোত্তমকে মজুর ভর্তি করার কাজ থেকে সরিয়ে দিলেন। নরোত্তম এবার মরিয়া হয়ে উঠল।

পুরোনো ম্যানেজারের ফিরে আসার অপেক্ষায় বসে থাকাও তার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠল। সে ঠিক করলে এর সমাধান সে নিজেই করবে। কুলি ভর্তি করা তার একচেটে অধিকার। কারখানা যখন কুলির অভাবে বন্ধ হয়ে যায়-যায় তখন সে-ই তো বাঁচিয়েছিল কারখানাকে দেহাত থেকে কুলি খুঁজে এনে দিয়ে। আর কেউ পেরেছিল? প্রতিটি মজুর বহাল করে সে টাকা পায়; এ তার মস্ত রোজগার। কিন্তু সেটাও বড় কথা নয়। টাকার অভাব আজ আর তার নেই। দু-একটা রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে গেলেও সে বিশেষ তোয়াক্কা করে না। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড় কথা হচ্ছে তার সম্মান, তার প্রতিপত্তি, তার প্রভাব। সেখানে টান পড়লে তার পক্ষে চুপ করে থাকা অসহ্য। নরোত্তম সেইদিনই পুরোনো ম্যানেজারকে বিলেতে একটা টেলিগ্রাম করল কারখানা রক্ষা করবার জন্যে শীঘ্র ফিরে আসতে। কারখানায় তার মজুর সাম্রাজ্যে ফাট ধরলেও তখনও তার বহু অনুগত বিশ্বস্ত অনুচর ছিল। এরা নরোত্তমের আদেশে লেবার দপ্তরের সামনে বদলী রেজিস্ট্রির সময় এক হল্লা বাধিয়ে দিল। একদল কুলি লাঠি নিয়ে লেবার অফিসারকে আক্রমণ করতে এগিয়ে এল এই বলে যে, তিনি এবং তাঁর আপিসের কর্মচারীরা ঘুষ নিয়ে নিজেদের পেটোয়া লোকদের কাজে পাকা করছেন। সত্যিকারের মারামারি হল না বটে, কিন্তু হাঙ্গামার কথা ম্যানেজারের কানে উঠল। তিনি নিজে এসে তদন্ত করলেন। নরোত্তমের জবানি শুনলেন। নরোত্তম কোনোরকম কথার মারপ্যাঁচের মধ্যে না গিয়ে সোজাসুজি বললে—লেবার অফিসার ঘুষ খাচ্ছে। ওকে না সরালে গোলমাল মিটবে না।

লেবার অফিসারের বিরুদ্ধে কিছু সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও ম্যানেজার মিল-এর শান্তিরক্ষার জন্যে লেবার অফিসারকে কার্লাইল মিল থেকে সরিয়ে দেওয়াই শ্রেয় বলে ঠিক করলেন। সন্ধ্যার সময়

নিজের বাংলোয় ফিরে লেবার অফিসারের ট্রান্সফারের অর্ডারটা লিখে ফেললেন। ঠিক করলেন পরদিন সকালেই লেবার অফিসারকে ডেকে ভাল করে বুঝিয়ে বলবেন সমস্ত বিষয়টা, এবং সেই দিনই তাকে পাঠিয়ে দেবেন কোম্পানীর অন্য একটা কারখানায়।

সারাদিনের উত্তেজনার অবসাদকে ধুয়ে ফেলবার জন্যে গেলাসে ঢালা হুইস্কিটা মুখে তুলে তিনি সবেমাত্র চুমুক দিয়েছেন, ঠিক সেই সময় একজন মজুর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এল। দরোয়ানের হাতে ছোট্ট ময়লা এক টুকরো চোথা কাগজ, তাতে তার নাম এবং লাল পেন্সিলে ইংরেজীতে লেখা—'আর্জেণ্ট—সীক্রেট'। ম্যানেজার লোকটাকে ডেকে পাঠালেন। কারখানার অতি সাধারণ একজন হিন্দুস্থানী মজুর। হাঁটুর উপর তোলা ময়লা ধুতি আর নিতান্ত অবোধের মত তার মুখের ভাব। দেখে কোনোমতেই মনে হয় না যে ম্যানেজারের জন্যে সে একটা জরুরী এবং গোপনীয় খবর নিয়ে আসতে পারে। নিজের চাকরির বিষয়ে হয়তো কোনো দরখাস্ত পেশ করতে আসবে এটাই এর পক্ষে অনেক বেশী স্বাভাবিক। লোকটা তার কাপড়ের আড়াল থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বার করল। ম্যানেজার ভাঁজ খুলে সেটাকে টেবিলের উপর রাখলেন। একবার তার উপর চোখ বুলিয়েই খাড়া হয়ে বসলেন নিজের চেয়ারে। নরোত্তম সেদিন সকালে পুরোনো ম্যানেজারকে যে টেলিগ্রামটা পাঠিয়েছে এটা তারই একটা নকল। ম্যানেজারের মুখের চেহারা সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল। হুইস্কির গেলাসটা চোঁ করে এক নিমেষে শেষ করে দিয়েই পকেট থেকে একটা টাকা বার করে লোকটার হাতে দিতে গেলেন। লোকটা কোন কথা না বলে টাকাটা না ছুঁয়েই সেলাম করে সায়েবের বাংলো থেকে বেরিয়ে গেল।

সায়েব তাঁর এক অনুচরকে ডেকে তখনই খোঁজ নিতে বললেন পোস্ট মাস্টারের কাছে টেলিগ্রামের খবরটা সত্যি কি না। যখন জানা গেল নরোত্তম সত্যিই টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে, তখন ম্যানেজার

ঠিক করে ফেললেন নরোত্তম সম্বন্ধে অতি দ্রুত একটা ব্যবস্থা করা দরকার—কাল সকালেই।

লেবার অফিসারের ট্রান্সফার অর্ডারটা ছিঁড়ে ফেলা হল। নরোত্তমকে জানানো হল তাকে স্পিনিং হেড সর্দারি থেকে আপাতত সাস্‌পেণ্ড করা হচ্ছে। এখন তদন্ত চলুক, তারপর হেড-আপিসের পরামর্শানুযায়ী চূড়ান্ত ব্যবস্থা করা হবে।

আগুনের মত এই খবর ছড়িয়ে পড়ল এবং তার পরদিন দেখা গেল সমস্ত কারখানা ষ্ট্রাইক করে বসে আছে। ম্যানেজার স্তম্ভিত, বিব্রত, ভীত হয়ে বসে রইলেন। হেড আফিসকেই বা কি বলে বোঝাবেন, সে-ও এক ভাবনা হল। ইতিমধ্যে ম্যানেজারের কানে লেবার অফিসারেরও কানে গোপনে খবর আসতে লাগল যে, বহু মজুরই কাজ করতে যেতে রাজী আছে, কিন্তু নরোত্তমের সাঙ্গোপাঙ্গের ভয়ে কারখানায় ঢুকতে পারছে না। ম্যানেজার সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের ব্যবস্থা করলেন। কারখানার ফটক খুলে রাখা হল। একটি দুটি তারপর ক্রমে দলে দলে মজুর কারখানায় ঢুকে পড়ল।

স্ট্রাইক এইভাবে ভেঙে গেল। কারখানাও আস্তে আস্তে চালু হল। নরোত্তমের এই আংশিক পরাজয়টা নরোত্তম কিন্তু মুখ বুজে সহ্য করল না। আগেই তাকে যথেষ্ট অপমানিত করা হয়েছে, এবারে আরো হল। স্ট্রাইক এমনি করে ভেঙে যাওয়ায় মজুর সমাজের কাছে তার মর্যাদা তো ক্ষুণ্ণ হলই, বরং ভয়ের যে কারণটা ঘটল সেটা হচ্ছে এই যে, এবারে স্পষ্ট বোঝা গেল—বেশ বড় একটা দল নরোত্তমের মুঠোর বাইরে কখন অজান্তে চলে গেছে এবং খুব সম্ভব তারা একটা জোট-ও বেঁধে ফেলেছে। নরোত্তম এবং নরোত্তমের দল তাই শেষ অবধি চরম পথ ধরল। কারখানা চালু হল বটে কিন্তু কারখানার মধ্যে তারা শান্তি ফিরে আসতে দিল না। প্রতি বিভাগে, প্রতি শেড্‌এ নরোত্তমের বশবর্তী মজুর ছিল। তারা শাসানি শুরু করলে, ধমক ধামক চড়

পড় হাতাহাতি তারপর লাঠালাঠি, মাথা-ফাটাফাটি পর্যন্ত বেধে গেল এখানে ওখানে। ম্যানেজার কদিন ধরে চেষ্টা করলেন পুলিসের সাহায্যে এবং নিজেদের দরোয়ান বাহিনীর সাহায্যে কারখানায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে, কিন্তু নরোত্তমের পাপাত্মা যেন কারখানার ইটকাঠে পর্যন্ত ভর করেছিল। নরোত্তমের ক্ষোভ হিংসা মার-মূর্তি হয়ে থেকে থেকে কারখানার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে জেগে উঠতে থাকল। শেষে আর ম্যানেজার পারলেন না। কারখানা বন্ধ করে লক্ আউট করে দিলেন এবং নরোত্তমের বিরুদ্ধে নালিশ রুজু করলেন এই বলে যে, সে কারখানার মজুরদের স্ট্রাইক করতে এবং হাঙ্গামা আর রাহাজানি করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

মামলা চললো গড়িয়ে। সিংহের মতো লড়ল নরোত্তম। লড়াই করে যখন সর্বস্বান্ত হয়ে গেল তখন নরোত্তমের বিরুদ্ধে সব দোষই প্রমাণিত হয়ে গেছে! নরোত্তমের জেল হয়ে গেল বটে, কিন্তু কারখানা আর খুলল না। পুরোনো ম্যানেজার ফিরে আসার পরেও হেড আপিস সাহস করলেন না মিল খুলতে। নরোত্তমের ভাঙ্গা সাম্রাজ্য তখন দুই ভাগে বিভক্ত। এ ওর টুঁটি চেপে ধরবার জন্যে সদাই প্রস্তুত এবং এই গৃহযুদ্ধ কবে যে শেষ হবে কেউ তার কোনো নির্দেশ দিতে পারলে না। শেষ অবধি কার্লাইল মিল বিক্রির জন্যে লাটে উঠল।

কুলি-সর্দাররা চটকলের প্রথম যুগে চট-শিল্পের প্রভূত উপকারে এসেছিল। অতবড় ক্রমবর্ধমান শিল্পের জন্যে সস্তায় শ্রমিক সরবরাহের যত দায় যত ঝক্কি তারাই নিজ স্কন্ধে বহন করেছে। চটকলকে নিজের পায়ে দাঁড় করাতে আর সকলের মতো তাদের প্রচেষ্টাও কম সফল হয়নি। চটশিল্পে তাদের অবদান বড় কম নয়। তার উপর চটশিল্পের এই দীর্ঘ জীবনে চট-শতাব্দীর নানা বিপর্যয়ে শ্রমিককুল যখনই টলমল করে উঠেছে তখনই এরা ছুটে এসে সব দিক সামলেছে। আর এই সব কারণেই কুলি-সর্দাররা

তাদের সফল প্রচেষ্টার জন্যে যে মূল্য চেয়েছে তা হচ্ছে সোজ
কথায় কুলি-রাজ্যের জমিদারি। কুলি নিয়ন্ত্রণে, কুলি নিয়োগে
কুলি বিয়োগে, কুলি-পুরুষের রোজগারে এবং কুলি-রমণীর স
যথেচ্ছ অধিকার। এই মূল্য উপযুক্ত মূল্য কিনা তা
বিচার করেছে ইতিহাস। চটশিল্প যখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে
মজুরেরা যখন চট উৎপাদনের অঙ্গ হয়ে মিশে গেছে, তারা মনে প্রা
হয়ে গেছে চটেরই কুলি, ঘর বেঁধে ফেলেছে পুরুষ ও নারী চট-
উৎপাদনের জমিতে, তখনই ইতিহাস বাজিয়ে দেখেছে কুলি-সর্দারদে
আর পাল্লার সাহায্যে ওজন করে নিয়েছে তাদের অবাধ দাবি-দাওয়া
গুলোকে। কুলি সর্দারের মতো লোককে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলে
কারখানার সর্বেসর্বা করে তুললে তার পরিণাম কোথায় গিয়ে
পৌঁছতে পারে কার্লাইল মিলের ইতিহাসে রয়ে গেছে তার
সাক্ষ্য।

মিল যখন বিক্রি হবার মুখে তখন শুরু হল আর এক খেলা
মিল-এর সেল্‌স মাস্টার, মিল-এর ম্যানেজার, মিল-ক্লার্ক, জুট-ক্লার্ক
সবাই যে যা পারল নিয়ে নিজের পকেট ভরতে শুরু করল। অত
বড় মিল, তার কত ছিল লোহা-লক্কড়, ফেঁসো, কাঁচা পাট, পাথরের
কুঁচি, ইঁট, সিমেন্ট ভরা থলি, কাঠ কাটরা, বাড়তি আসবাব, সেই
সব সন্ধ্যার অন্ধকারে মাড়োয়ারী আর অন্যান্য কারবারিদের কাছে
বেচে দিতে থাকল সায়েবরা যা দাম পেল তাতে। দেখতে দেখতে
কয়েকদিনের মধ্যে ঝাঁট দিয়ে সাফ হয়ে গেল মিল—এ সব ব্যাপারে
দেরি করতে নেই। মিল-এর 'ওয়েলফেয়ার ফাণ্ড'-এ মোটা রকম
একটা টাকা ছিল বুড়ো মিল-ক্লার্ক-এর কাছে, সেটা সে আত্মসাৎ
করল কাউকে কোনোরকম হিসেব না দিয়েই। ডামাডোলের
বাজারে কে কি ধরবে? এ সব সত্ত্বেও আমাদের কোম্পানি কিনে
নিল ডুবন্ত কার্লাইল মিল। আমাদের কোম্পানীর কলেবর বৃদ্ধি
হল। ঝগড়া-ঝাঁটি করছিল যে-সব মজুর, হাজারে হাজারে তাদের

াকরি চলে গেল। কিন্তু মজা এই যে, যে-সব ম্যানেজার, সেল্‌স
াস্টার আর জুট ক্লার্ক কোম্পানিকে ঠকিয়ে নিজেদের পকেট স্ফীত
করছিলেন তাঁরা যে যেখানে ছিলেন রয়েই গেলেন। এক শুধু বুড়ো
মিল ক্লার্ক একদিন রবিবারের দুপুরে টেনিস খেলে এসে নিজের
কুঠিতে বসে কমলালেবুর সঙ্গে জিন মিশিয়ে সবে খেতে শুরু করেছেন
এমন সময় হৃদযন্ত্র বিগড়ে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হল। বুড়োর
পেনশান নিয়ে আর চুরির টাকায় পকেট ভরে দেশে ফেরবার কথা
ছিল কয়েকমাসের মধ্যে—সেটা আর অদৃষ্টে ঘটল না।

॥ আঠার ॥

এর পর শুনতে পেলুম, আমাদের কোম্পানী নাকি আরো একখানা ডুবন্ত মিল কিনবে। রচেস্টার মিল। বাজারে গুজব, রচেস্টার মিল নাকি অনেক দিন ধরে লোকসান দিচ্ছে। মাসে মাসে যা চট উৎপাদন হবার কথা, তা কিছুতেই জন্মাচ্ছে না। তাঁতীরা কেবলই অনুযোগ করে চলেছে যে, যে-কাঁচা পাট থেকে সুতো তৈরী হচ্ছে, তা খুবই খারাপ, কাপড় বুনতে গেলেই সুতো ছিঁড়ে যায়। কিন্তু তার কোনো সুরাহা হচ্ছে না। রচেস্টার মিল-এর ম্যানেজার তাঁর লেবার অফিসারদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—এই যে তাঁতীরা এত হট্টগোল করছে, এর আসল কারণ কি? ভাল করে খোঁজ করে আমায় জানাও। লেবার অফিসারদের প্রধান ছিলেন কাপুর সায়েব। তিনি রিপোর্ট দিলেন, তাঁতীরা একজোট হয়ে 'গো স্লো' শুরু করেছে; অর্থাৎ ইচ্ছে করে কাজে ঢিলে দিচ্ছে। তাঁতীরা এযুক্তি শুনে অবাক হয়ে গেল। তারা বললে—আমরা পাস্‌ রেটে কাজ করি, যত বেশী গজ কাপড় বুনবো,

তত বেশী কামাবো। আমরা কাজে ঢিলে দিয়ে বোকামি করতে যাবো
কেন ? কিন্তু ম্যানেজারের কাপুর সায়েবের যুক্তি খুব পছন্দ হল
তিনি তখনই সেই রিপোর্ট কলকাতায় তাঁদের হেড আপিসে পাঠিয়ে
দিলেন। অনেকেই জানতো, মিল-এর ম্যানেজার ও সেল্‌স-মাস্টার
দুজনেই নামকরা চোর। কাঁচা পাট কেনবার সময় দুজনেই ঘুষ
খেত। ভিজে পাট আর রদ্দি মাল কিনে মিল-এর গুদাম বোঝাই
করতে তাঁদের আটকাত না। কিন্তু অত বড় পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের
নামে কেউ কিছু বলতে সাহস করলে না। মিল থেকে রিপোর্ট
পেয়ে হেড আপিসের কর্তারা সেই রিপোর্ট নিয়ে লেবার কমিশনারের
কাছে গেলেন। গিয়ে তাঁকে বোঝালেন যে, তাঁতীরা একজোট
হয়ে 'গো স্লো' শুরু করেছে। এখন যদি লেবার কমিশনার মাঝে
পড়ে কিছু না করেন তা হলে কোম্পানীর পক্ষে মিল চালানো
অসম্ভব। মিল বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তাহলে মিল-এর সাথে
তিন হাজার শ্রমিককে এক কথায় ছাড়িয়ে দিতে হবে। এবং তার
বিক্ষোভ ও ঝঞ্ঝাট সামলাবেন লেবার কমিশনার। লেবার
কমিশনার ঘাবড়ে গিয়ে রচেস্টার মিল-এ হাজির হলেন। ধরেই
নিলেন যে 'গো স্লো'র ব্যাপারটাই ঠিক। তাঁতীরা যে ভিজে
পাটের অনুযোগ শোনালো সেটা কানেও তুললেন না। তিনি
তাঁতীদের বললেন—শোনো তোমরা। এমন করলে চলবে না
উৎপাদন বাড়াতে হবে। তা নইলে যাদের উৎপাদন কম তাদের
জবাব দেওয়া হবে। লেবার কমিশনারের পিছনে পিছনে চট-সংস্থার
লেবার দপ্তরের কর্তারাও এসেছিলেন। তাঁদের হুমকি আরও
বেশী। তাঁরা বললেন—কার উৎপাদন বেশী, কার কম, এ-ভাবে
লোক বাছাই করা শক্ত। তার চেয়ে গোটা মিলটাই বন্ধ করে দেওয়া
দরকার। এ সবের কিন্তু কিছুই হল না। উৎপাদন একটুও বাড়ল
না। তাঁতীরা অনবরত অনুযোগ করে চললো যে, সুতো ছিঁড়ে
যাচ্ছে। সুতো কমজোর। পাট খারাপ।

তখন কর্তাদের মাথায় এক অদ্ভুত বুদ্ধি এল। কে যে এ বুদ্ধি তাঁদের মাথায় দিল তা জানা যায় নি। নানা পরামর্শদাতা ছিলেন; তাঁদেরই কেউ হবেন একজন। ঝাঁ করে শ-দুই তাঁতীকে চার্জ-শীট দেওয়া হল, আর সঙ্গে সঙ্গে খরচ-খরচা দিয়ে বিহার থেকে শ-দুই মুসলমান তাঁতী নিয়ে আসা হল। তারপর বলে দেওয়া হল, এবার থেকে যারই উৎপাদন কম হবে তারই নামে 'ওয়ার্নিং কার্ড' দিয়ে যাওয়া হতে থাকবে। কর্তৃপক্ষ ধরে নিয়েছিলেন তাঁতীরা একজোট হয়ে যে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলেছে এইতে তা ভেঙে যাবে। এর পিছনে সত্যি যদি কোনো ষড়যন্ত্র থাকতো, তাহলে এবারকার এই প্রচণ্ড আঘাতে ভেঙে যেত তা। কিন্তু অমন একটা ষড়যন্ত্র পাকাবার মত সংগঠনও ছিল না তাঁতীদের, আর সরলবিশ্বাসী মানুষগুলোর মাথায় অমন বুদ্ধিও ছিল না। এই কারণেই উৎপাদন একটুও বাড়ল না, এমন কি নতুন বিহারী তাঁতীদেরও নয়। ম্যানেজার বললেন—বিহারী মুসলমান তাঁতীরা আর একটু দক্ষ হলেই তাদের উৎপাদন বেড়ে যাবে। আপাতত পুরানো পাপী গুলোর উপর অত্যাচার এবং নিপীড়ন চলতে থাকুক। এইভাবে চললো কিছুকাল। যাদের নামে তিনবার ওয়ার্নিং পড়ল তাদেরই বদলে সঙ্গে সঙ্গে বিহারী তাঁতী নিযুক্ত হতে থাকল।

নতুন তাঁতীরা কোম্পানীর খরচে এসেছে। থাকবার জায়গা পেয়েছে। মেস-ঘর পেয়েছে। তাদের চেনাশোনা গ্রামভাই যারা এসে পড়তে লাগল তারাও বদলি বা ক্যাজুয়াল শ্রমিকের তালিকা টপ্‌কে চটপট চাকরি পেয়ে যেতে থাকল। নতুন তাঁতীরা ভাবলে তাদের আর পায় কে? এক কথায়, অদ্ভুত এক আবহাওয়ার সৃষ্টি হল। দেখা গেল, নতুন আমদানি করা মজুররা নিজেদের বেশ শ্রেয় বলে জ্ঞান করতে শুরু করেছে। মনে করতে সুরু করেছে তারা যেন কোম্পানীর আদরের ছেলে। যা খুশি তাই করতে পারে। কুলি লাইনের মেয়েদের উপর বলাৎকারের চেষ্টা, হাত ধরে টেনে তাদের নিজের ঘরে নিয়ে

যাবার চেষ্টা, এইসব শুরু হল। ছোটখাট মারধোর তো আছেই। শ্রমিকরা ক্রমেই বিক্ষুব্ধ হতে থাকল। কিন্তু শ্রমিক-কুলের মধ্যে অসন্তোষের এইসব লক্ষণ কর্তৃপক্ষের চোখে পড়েও পড়ল না। লেবার দপ্তরের কর্তারাও চুপ করে রইলেন। শেষে একদিন একটা তুচ্ছ কারণে লেগে গেল হাঙ্গামা। আর হাঙ্গামা লাগতেই দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল তা চারিদিকে। স্থানীয় জেলেদের কয়েকটি ছেলে মিল-এর সীমার বাইরে কাদের জমিতে গিয়েছিল গাছ থেকে তাল পাড়তে। তালের কাঁদি নিয়ে তারা যখন ফিরছে তখন নবাগত বিহারীদের একজন তাদের জিজ্ঞেস করল—এই, কোথা থেকে তাল নিয়ে আসছিস্ রে ? তারা উত্তর দেয় নি। প্রশ্নকর্তা বললে—ও তো চুরির মাল। দাও আমাকে ক-টা। তাতেও উত্তর না দিয়ে ছেলেরা চলে যায় দেখে প্রশ্নকর্তার সঙ্গে আরো কয়েকজন বিহারী যোগ দিয়ে ছেলেগুলোকে ধরে। ধরে তাদের কাছ থেকে ক-টা তাল কেড়ে নেয়। এই আর কি, সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক-মহলে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায়। শ্রমিকেরা লাঠি সড়কি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিহারী তাঁতীদের উপর। মার দেয় তাদের। বিহারী তাঁতীরা বিকেলের দিকে গিয়ে কুলি-লাইনে মারপিট করে আসে। তারপর সন্ধার অন্ধকারে সত্যিকারের দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুনোখুনি, রক্তারক্তি শুরু হয়ে যায়। পা ভাঙে, মাথা ফাটে অনেকের। দু-জনের প্রাণ যায়। শেষে মার খেতে খেতে মিল-এর মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নেয় বিহারীরা। আশ্রয় নিয়ে বেঁচে গিয়েছিল। নইলে সেদিন আর বোধহয় কেউ আস্ত থাকত না। রাতারাতি এইসব তাঁতীদের নৌকোয় করে কোম্পানীর খরচায় অন্যান্য মিল-এ পাঠিয়ে দেওয়া হল।

এইভাবে বিহারী তাঁতীদের হাঙ্গামা চুকলো বটে, কিন্তু উৎপাদন যেমন ছিল তেমনিই রইল। কর্তৃপক্ষ তখন মিল বেচবার সিদ্ধান্ত নিলেন। ডিরেক্টাররা এক গোপন মিটিং ডাকলেন। তাতে

আসতে বললেন মিল-এর হিসাব-রক্ষককে আর লেবার দপ্তরের কাপুর সায়েবকে। চেয়ারম্যান কারখানা বেচবার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়ে বললেন—এবার হিসাব-রক্ষক বলুন মিল বন্ধ করে দিলে সাড়ে তিন হাজার শ্রমিককে কত ছাঁটাই-এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে? হিসাবরক্ষক এ প্রশ্নের জন্য আগে থেকেই তৈরী ছিলেন; তিনি এক টুকরো কাগজের উপর চোখ বুলিয়ে যে সংখ্যাটির কথা বললেন, তা শুনে সকলের চক্ষুস্থির! একে তো মিল লোকসান দিয়ে চলেছে, তার উপর ক্ষতি-পূরণের এতবড় অঙ্ক হলে মিলের আর থাকে কি? এ মিল তাহলে তো আর বেচাই যাবে না। তখন চেয়ারম্যান কাপুর সায়েবের দিকে তাকিয়ে বললেন—এ-বিষয়ে আপনার কিছু বলবার আছে? মিটিং-এর আগেই চেয়ারম্যানের সঙ্গে কাপুর সায়েবের বিস্তৃত গোপন আলোচনা হয়ে গিয়েছিল। কাপুর-সায়েব প্রশ্নের জন্য তৈরী ছিলেন। তাঁর প্রস্তাব পেশ করলেন ডিরেক্টারদের কাছে। সর্দারদের মাধ্যম এবং সোজাসুজি কুলি-লাইনে গিয়ে জানিয়ে দেওয়া হোক যে মিল বিক্রি হয়ে যাচ্ছে এবং কিনছে মাড়োয়ারী ধনপতি। মাড়োয়ারীর হাতে যদি মিল যায় তা হলে শ্রমিকের অবস্থা যে কি দাঁড়াবে তা তো ভালই জানা আছে! এইভাবে যতটা পারা যায় শ্রমিকদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করা হোক। তারপর বলা হোক মিল বিক্রি হবার আগেই তারা যদি কিছু নগদ টাকা হাতে নিয়ে চাকরি ছেড়ে চলে যেতে চায় তা হলে কোম্পানী তার ব্যবস্থা করে দিতে পারে। তাদের যা গ্র্যাচুইটি আর প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকা আছে তা নিয়ে নিক। কোম্পানী দয়া পরবশ হয়ে তাদের আরও একমাসের মাইনে এবং দেশে ফেরা বাবদ পঁচিশ টাকা করে দিতে রাজী আছেন। এইটে রটিয়ে দেবার পরই মিল-এর লেবার অফিসাররা বলতে আরম্ভ করুক যে, সামনের মাসের শেষ তারিখের মধ্যে প্রাপ্য টাকা না নিয়ে নিলে ঐ বাড়তি এক মাসের মাইনে, ভাড়ার পঁচিশ টাকা আর

পাওয়া যাবে না। প্রস্তাব শুনে ডিরেক্টাররা খুশী হলেন বলে মনে হল। একজন শুধু মন্তব্য করলেন—এ পরিকল্পের সফলতা নির্ভর করছে শুধু মাত্র প্রোপাগাণ্ডার উপর। এর মধ্যে যে মস্ত বড় ভাঁওতাটা আছে, সেটা কুলিদের কাছে বোধগম্য করে দেবার লোকের অভাব কি আজকালকার এই পোড়া দেশে আছে? চারিদিকে যেমন ট্রেড ইউনিয়নের তৎপরতা? কাপুর সায়েব বাধা দিয়ে বললেন—কর্মীদের ট্রেড ইউনিয়ন যদি একটাই হত, তা হলে ভয় করবার কথা ছিল। কিন্তু আপনারা তো জানেন, এ অঞ্চলে কতগুলি ইউনিয়ন? ওরা একজোট হয়ে কাজ করতে পারবে না। ওদের আমি সামলাবো, ভাববেন না। একজন ডিরেক্টার হিসাবরক্ষককে হিসেব করতে বললেন—রিট্রেঞ্চমেণ্ট কমপেন্‌সেশন দিলে কোম্পানীর যা টাকা লাগতো, নতুন পরিকল্পনা চালাতে পারলে তার কতটা বাঁচবে? হিসাবরক্ষক সঞ্চয়ের যে বিরাট অঙ্কটা দেখালেন, তা সকলেরই খুব মনঃপূত হল। তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন যে, সমস্ত ব্যাপারটা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার ভার কাপুর সায়েবের উপর ছেড়ে দেওয়া হোক। কাপুর সায়েবকে দশ মিনিটের জন্য বাইরে যেতে বলা হল। যখন তিনি আবার ফিরে এলেন, তিনি শুনলেন, ডিরেক্টারদের আলোচনার ফলে তাঁর এই মাস থেকে আড়াই-শ টাকা মাইনে বৃদ্ধি হয়েছে।

শ্রমিকেরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পঙ্গপালের মত এসে পড়ল লেবার দপ্তরের দ্বারে। সবাই জানতে চায়, কি হবে তাদের ভবিষ্যতে? কাপুরের দপ্তর তাদের বুঝিয়ে দেয়—ভবিষ্যৎ তো অন্ধকার। এখন যা পাচ্ছো হাতে তুলে নাও। এ ছেড়ে দিলে শেষ অবধি হয়তো কিছুই পাবে না। টেবিলের উপর স্তূপীকৃত টাইপ-করা ছাপানো কাগজ, তাতে এই মর্মে লেখা যে, আমি স্ব-ইচ্ছায় কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছি। আমাকে যেন আমার পাওনা-গণ্ডা এবং এক মাসের বাড়তি মাহিনা ও দেশে ফিরিবার ভাড়া বাবদ পঁচিশ টাকা চুকাইয়া দেওয়া হয়। এর নীচে সই বা টিপসই করে দিয়ে

দলে দলে শ্রমিক কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। বিনা গোলমালে মিটে গেল সমস্ত ব্যাপারটা। বড় সায়েব কাপুরের পিঠ চাপড়ে বললেন—ওয়েল ডান্ কাপুর!

চটকলের রঙ্গমঞ্চ থেকে যখন অতগুলো হতভাগা বিদায় নিয়ে গিয়ে পথে বসল, তখন হঠাৎ ট্রেড ইউনিয়নের কর্তারা একটু সচেতন হয়ে উঠলেন। তাঁরা বিধান সভায় প্রশ্ন তুললেন—সরকার এ ব্যাপারে কি করবেন? সরকারের তরফ থেকে অনুসন্ধান ও বিচারের কথা উঠল। সরকার তলব করলেন কোম্পানীকে। লেবার কমিশনারের কর্মকর্তাদেরও হাজির থাকতে বললেন। কোম্পানী একতাড়া টাইপ-করা কাগজের নীচে সইগুলো দেখিয়ে দিয়ে বললেন—বিচার করে নিন। দলে দলে মজুর স্বেচ্ছায় কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে গেছে—শরীর অসুস্থ, ব্যক্তিগত অসুবিধা, দেশে ফিরে জমির তদারক প্রয়োজন—এমনি নানান কারণ। কাগজে-কলমে সমস্ত জিনিসটাকে পাকাপোক্তভাবে দাঁড় করানো হয়েছে। কাজেই সরকার আর কিছু করতে পারলেন না। তাঁরা অবশ্য জিজ্ঞেস করতে পারতেন যে, নিজেদের বিভিন্ন প্রয়োজনে যদি মজুররা কাজ ছেড়ে চলে যেতে চায়, তা হলে তারা সবাই একই রকম টাইপ-করা কাগজে সই করল কেন? কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক, এ প্রশ্ন তাঁরা করেননি। এইখানেই মিটে গেল ব্যাপারটা। অভাগা শ্রমিকের পাল নিঃশব্দে মরল।

রচেষ্টার মিল যখন এইভাবে শূন্য হয়ে গেল, সেই সময় জানা গেল, আমাদের কোম্পানী কিনছে মিলটা। মাড়োয়ারীর হাতে মিল পড়বে বলে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পালাচ্ছিল সে-সব শ্রমিক, তারা আবার ভিড় করে এল আমাদের কোম্পানীর দ্বারে। আমাদের কোম্পানীও বাছাই করে করে নিজেদের পছন্দমত লোক ভর্তি করতে লাগলেন। যাদের পুরোনো মিল-এ দশ বছর, পনের বছর পারমানেন্ট চাকরি হয়ে গিয়েছিল, তারা নতুন রংরুট হিসেবে গণ্য হতে থাকল।

কিছুদিন ধরেই শুনছিলুম, আমাদের কোম্পানীর কলেবর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একজন প্রধান লেবার অফিসারেরও খোঁজ করা হচ্ছে, যিনি সব লেবার অফিসারের উপরে বসবেন এবং কলকাতার আপিস থেকে কোম্পানীর তথা চট-সংস্থার শ্রমনীতি চালনা করবেন। আমাদের বিভিন্ন মিল-এ যে-সব লেবার অফিসার ছিলেন, তাঁদের মধ্যে থেকে বেছে দু-একজনকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল, কিন্তু বড় সায়েবের মনঃপুত হননি কেউই। বাকি যাঁরা ছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই একবার করে স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, কপালে যদি থাকে, তা হলে তিনিই অলঙ্কৃত করবেন সেই পদ। কিন্তু তাঁদের স্বপ্ন সফল হবার আগেই হঠাৎ একদিন শোনা গেল, আমাদের হেড আপিসের বড়সায়েব দেউলিয়া রচেস্টার মিল-এর কাপুর সায়েবকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠিয়েছেন। দেয়ালেরও কান আছে, কাজেই বড়সায়েবের সঙ্গে কাপুর সায়েবের কথোপকথনটা আমাদের কানে এসে পৌঁছল। সেটা অনেকটা এই রকম :—

বড় সায়েবের ঘরে কাপুর ঢুকতেই বড় সায়েব ডান হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলেন, বাঁ হাতে কি যেন একটা মুঠিয়ে ধরা। কাপুর চেয়ারে বসতেই বড়সায়েব বাঁ হাতের মুঠোটা খুললেন। হাতের চেটোর মধ্যে ছোট একটা জিনিস দেখা গেল। বড় সায়েব বললেন —এটা কি জান?

কাপুর সায়েব বললেন—না তো।

—দেখ।

দেখা গেল, পরিপাটি করে ভাঁজ-করা ছোট্ট একটুকরো কাগজ। আস্তে-আস্তে বড় সায়েব ভাঁজ খুলে টেবিলের উপর রাখলেন।

তখন দেখা গেল, কাগজ নয়, পার্চমেন্ট। পার্চমেন্টের উপর আঁকা যেমন সংগঠনের নক্‌শা হয়, তেমনি একটি নক্‌শা।

কাপুর চোখ বড় করে দেখতে থাকলেন।

—দেখছ, চারজন ডিরেক্‌টার? আর তাঁদের নাম?

—দেখছি।

—আর এই দেখ, পঞ্চম জায়গাটায় ফাঁক।

—হ্যাঁ।

—শ্রমিকাধ্যক্ষ যে হবে, তাঁর নাম বসবে এইখানে।

—বুঝলুম।

—এই হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যতের পরিকল্পনা। আগে তো শ্রমিক-নীতি বলে কিছু ছিল না। যা করতো ম্যানেজার তার ব্যক্তিগত দায়িত্বে এবং অধিকারে। আজকালকার দিনে প্রগতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে গেলে ওটাকে বাদ দেওয়া চলে না। ওটা যে কত গুরুত্বপূর্ণ, তা তো কোম্পানীর নক্‌শা দেখেই বুঝতে পারছ?

—বুঝছি।

—প্রথমে চেষ্টা করে দেখেছিলুম আমাদের শান্তনুকে দিয়ে। শান্তনুকে তো জানই। বড় ছটফটে। লেবার অফিসার হবার যথেষ্ট গুণ আছে অস্বীকার করি না। কিন্তু ধৈর্য একটা মস্ত গুণ—তারই অভাব। তারপর জালালের কথা ধরা যাক। চেনো তো জালালকে?

—চিনি।

—জালালকে দিয়ে কাজ চলে। কিন্তু—

বড় সায়ের নক্‌শার শূন্য স্থানটা আঙুল দিয়ে আর একবার দেখালেন।

—কিন্তু এখানে কি আর জালালের কথা ভাবা যায়? তুমিই বল না!

কাপুর শুনে খুব খুশী। পেশাদারিদের নিজেদের মধ্যে যে রেষারেষি থাকে, লেবার অফিসারদের বেলাই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন?

—ঠিক, ঠিক।

—আর মিটার-এর কথা যদি বল। ছেলে-মানুষ। অভিজ্ঞতাই বা কোথায়? আমেরিকা ঘুরে এসেছে, তাই শুনে কোম্পানী ভেবেছিল একটা কেউ-কেটা হবে। আমার কিন্তু দ্বিধা ছিল গোড়া থেকে, আর তুমি নিশ্চয় জানো মিটারকে—

—জানি বই কি!

শান্তনু গেল, জালাল গেল, আমেরিকা-ফেরত মিটারও গেল। কাপুর খুশীতে উপচে পড়লেন। তিনি নিজে তো আমেরিকা যাননি। কলকাতা থেকেই লেবার পরীক্ষা পাশ করে ডিপ্লোমা নিয়েছেন।

বড় সায়েব স্থিরদৃষ্টিতে কাপুরের চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন—তুমিই পারবে। আমি বেশ বুঝতে পারছি, তোমাকে দিয়েই হবে। মাইনে? মাইনে নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। তুমি যা চাও। আফ্‌টার অল উপরের দিকের মাইনে নিয়ে দর-কষাকষি আমরা করি না। তোমার তো একটা নিজস্ব জীবন আছে, প্রতিষ্ঠা আছে, সমাজের স্তরের প্রশ্ন আছে, তোমার প্রয়োজনের মূল্য তুমিই সবচেয়ে ভালো বিচার করবে। সুতরাং—

কাপুর একটা ঢোঁক গিলে একটু ভেবে বললেন—জানেন তো সায়েব আমি যেখান থেকে ছেড়ে আসছি, সেখানে দু-হাজার পেতুম। আপনাদের কাছে আড়াই হাজার চাওয়া কি খুব বেশী হবে?

—এ তো অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত কথা। বেশ তা হলে সেই কথাই রইল। সায়েব হাত বাড়িয়ে দিলেন। কাপুর আনন্দে :করমর্দন করলেন।

সায়েব তখন একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বললেন—বেশ

তবে একটু কাজের কথায় আসা যাক। এই দেখ একটা তালিকা। এক-শ ষাটজন শ্রমিক। এরাই হচ্ছে যত গণ্ডগোলের মূল। কেউ কেউ কাজে অপটু, পরকে বাধা দেয়, কেউ ইউনিয়ন করে, কেউ হ্যান, কেউ ত্যান। কোম্পানী এদের মাইনে দেয়, অথচ তার বদলে কিছুই পায় না। উল্টে বরং বাধাবিপত্তি, গোলমাল, এইসব। তোমার প্রথম কাজ এদের তাড়ানো। দেশের আইনকানুন বড় বিশ্রী। সোজাসুজি তাড়াতে গেলে আইনে বাধছে। আইন যাঁরা করেছেন, তাঁরা এটা দেখেননি যে, এদের রেখে কোম্পানীর কত ক্ষতি হচ্ছে। তুমি এলে, এবার কোম্পানীর এই দিকটা দেখ। মিটারকে বলেছিলুম, মিটার পারেনি। তবে ঐ তো বললুম, মিটার অনভিজ্ঞ। তোমার কথা আলাদা। তোমার উপর আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে।

কাপুর আনন্দচিত্তে বিদায় নিলেন। শনিবার সকালে এই কথাবার্তাগুলি হয়। সোমবার কাপুরের কাজে যোগ দেবার কথা। শনিবার সন্ধ্যায় যখন রাস্তায় সবেমাত্র আলো জ্বালা হচ্ছে, ঠিক সেই সময় কোম্পানীর এক প্রকাণ্ড কালো 'রোভার' গাড়ি নিয়ে উর্দি-পরা কোম্পানীর এক ড্রাইভার কাপুরের বাড়িতে ঢুকে সেলাম জানিয়ে বললে—হুজুর গাড়ি আপ কা!

॥ উনিশ ॥

কাপুর সায়েব আসবার কিছুদিনের মধ্যেই জানা গেল কোম্পানীর বর্তমান শ্রমিক নীতিটা কি? ভারতবর্ষের চটকলগুলো বহুদিনের পুরোনো। তাদের এইবার আধুনিকতম কারখানায় রূপান্তরিত করা দরকার। তার জন্যে বহু টাকা লাগবে। কলের পিছনে এত টাকা খরচ করার পর আর আড়াই লাখ তিন লাখ শ্রমিক পোষা লাভজনক হবে না। কাজেই শ্রমিক ছাঁটাই করা দরকার।

একদিকে আধুনিকীকরণ অপরদিকে ছাঁটাই, এই দাঁড়ালো বর্তমান চটকলের নীতি। কেউ বললে এক লাখ শ্রমিক ছাঁটাই হবে, কেউ বললে দেড় লাখ। সত্যি ব্যাপারটা কি ভালো করে জানা গেল না। উপর তলার সায়েবরা গোপন মিটিং ডেকে নানারকম পরামর্শ করতে থাকলেন। তার খবর বাইরে বেরল না।

চটকলের যন্ত্রগুলি প্রায় পঞ্চাশ ষাট বছরের পুরোনো। উপরে-উপরে সংস্কার করা হয়েছে, কোনোদিন নতুন যন্ত্র এনে বসানো হয়নি। ইতিমধ্যে নানারকম নতুন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়ে গেছে, যে সব কল ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে চালু হয়ে গিয়েছে কতকাল। কলকাতার চটশিল্প যদি প্রগতিশীল হত, তারা তাদের লাভের টাকার এক অংশ এইদিকে নিয়োগ করতে পারত এবং তাহলে আজ হঠাৎ আধুনিকীকরণের ধুয়ো এমনভাবে সকলকে সচকিত করে দিয়ে শ্রমিককুলের সর্বনাশ করতে উদ্যত হত না। চটশিল্প এতদিন ছিল অবিশ্বাস্য রকমের লাভের শিল্প। কাঁচা টাকা হাতে এসেছে, তাই দিয়ে প্রধানতঃ চলেছে ফাটকাবাজী এবং অন্যান্য ব্যয়। চটশিল্পের ইতিহাসের প্রথকদিকে যেমন শিল্পটাকে নিজের পায়ে দাঁড় করাবার একটা প্রচেষ্টা ছিল সেটা আর দেখা যায়নি গত পঞ্চাশ ষাট বছর। অন্য যে কোনো শিল্প এই পঞ্চাশ-ষাট বছরের জড়তার ফলে হয়তো এতদিন ডুবে যেত। কলকাতার চটশিল্প যে এ সত্ত্বেও এখনও দোর্দণ্ড প্রতাপে দাঁড়িয়ে, এইটাই এক পরম বিস্ময়। আজকের এই সহসা-জাগ্রত চেতনার আসল কারণ কিন্তু পাকিস্তানের উদ্ভব। ভারতের চটশিল্প এতদিন ভারতের বাইরের ইংলণ্ড, জার্মানী, ফ্রান্সের চটশিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বীতাকে ডরাতো না। ওদেশের আধুনিক যন্ত্রে জনপিছু উৎপাদনের হার অনেক বেশী হলেও এদেশের শ্রমিকের হার এত সুলভ যে, অনেক সস্তা পড়ে যেত এদেশের উৎপাদনের মূল্য। কিন্তু যখন জানা গেল পাকিস্তান এবার নিজেদের চটশিল্প গড়ে তুলবে

[illegible] দেশের উৎপাদিত পাটের উপর ভিত্তি করে এবং আধুনিকতম যন্ত্রপাতি নিয়ে আসবে বিদেশ থেকে তখনই এদের টনক নড়ে উঠল। এই হল কলকাতার চটশিল্পকে আধুনিকীকরণের প্রধান তাগিদ।

শুনলুম ভারতীয় চট সংস্থা তার সভ্যদের জন্যে সরকারের কাছ থেকে পঞ্চাশ কোটি টাকা ধার চেয়েছে আধুনিক যন্ত্রাদি কেনার জন্য। সব সুদ্ধ খরচ এক-শ' কোটি টাকা। বাকি পঞ্চাশ কোটি টাকা দেবে চটকলেরা নিজেদের তহবিল থেকে। এক-শ' কোটি টাকা অনেক টাকা। কিন্তু চটশিল্প আজ প্রায় এক-শ বছর ধরে কত শত-শত কোটি টাকা লাভ করে এসেছে তার কতটুকু নিয়োগ করেছে নিজেদের শিল্পের এবং নিজেদেরই শ্রমিকদের জীবনের মানের উন্নতির জন্যে? প্রায় কিছুই নয়। তা যদি করত, তা হলে আজ পঞ্চাশ কোটি টাকার জন্যে সরকারের দ্বারস্থ হতে হত না। আমাদের কোম্পানীর নামে শুনলুম পৌনে চার কোটি টাকা ধার চাওয়া হয়েছে।

অদূর ভবিষ্যতে ছাঁটাই-এর দুশ্চিন্তা এবং গুরুভার আমাদের মিল-এর উপর কালো মেঘের মত নেমে এল। ফিসফাস করে সবাই বলতে লাগল ঐ কথা। কে যাবে? কে থাকবে? যারা যাবে তাদের কি হবে?

টেবিলে বসে একদিন খাতা লিখছি, হঠাৎ টের পেলুম পাশে এসে কে দাঁড়িয়েছে। দেখি ফগুয়া।

—কি রে ফগুয়া, কবে এলি?

—দিন দশ হল এসেছি হুজুর মাপ করবেন, আপনার সঙ্গে দেখা করিনি। বড় ব্যস্ত ছিলুম। আজকাল আর একটুও ফুরসত পাই না।

—কিসের কাজ তোর এত?

—ঠিক আমার কাজ নয় হুজুর আবদুলের কাজ।

—আবদুল ? আবদুল আবার কে ?

—আবদুলকে চেনেন না ? তাঁত ঘরে কাজ করে। আমাদের নতুন যে ইউনিয়ন হয়েছে তার সেক্রেটারি।

—বুঝেছি। তুই বুঝি ওর খপ্পরে পড়েছিস ? তোর ভয় নেই ?

—না হুজুর, লোকটা খুব ভালো। আমাকে পড়া লিখা শিখিয়েছে। এবার ছুটিতে যখন দেশে যাই, আমার সঙ্গে কিতাব দিয়ে দিয়েছিল। আমি এখন অনেক লিখাপড়া শিখে গেছি হুজুর। বলে ফগুয়া লজ্জায় একটু হাসলো।

—তা ফগুয়া এবার বিয়ে করে এসেছিস্ তো ?

—হাঁ হুজুর। মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল ফগুয়া।

—বউ এনেছিস্ ?

—না হুজুর।

—কেন রে ?

—বউ নিয়ে আসব ঠিক ছিল হুজুর। তারপর আবদুলের চিঠি পেলুম, এদিকের অবস্থা খুব খারাপ। কার চাকরি যায়, কার থাকে কিছু ঠিক নেই। তা ছাড়া মজুরদের সবাইকে অবস্থাটা ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে সবাই মিলে এক সঙ্গে লড়তে হবে। নইলে এক ঝাপটায় এরা আমাদের শেষ করে দেবে। ছাঁটাই তো করবেই, যারা থাকবে তাদেরও আর শিরদাঁড়া তুলে দাঁড়াতে দেবে না। এই সব ভেবে আর বউ আনলুম না হুজুর।

অবাক হয়ে তাকালুম মুখের দিকে। এ কোন্ ফগুয়া ? ছোট্ট খাট্টো নরম নরম একটি বউ নিয়ে ঘর করবার কতদিনের শখ তার। তা ছাড়া তার মন পড়ে থাকত সব সময় তার দেশের মাটির দিকে। যে মাটি তাদের হাত-ছাড়া হয়ে গেছে, যা তাকে উদ্ধার করতে হবে। সেই ফগুয়ার মুখে এ কি অদ্ভুত ভাষা শুনছি ? বউ গেল, বাপ গেল, দেশের জমি গেল, রইল শুধু তার আবদুল আর চটকলের লড়াই ?

মনে হল বেচারাকে একটু উপদেশ দেওয়া দরকার। বললুম—একটু সাবধানে থাকিস ফগুয়া। দিনকাল তো ভাল নয়। আর আবদুলের সঙ্গেই বা তোর এত মেলামেশা করার কি দরকার?

ফগুয়া মাটির দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললে—আবদুলের মতো মানুষ হয় না হুজুর।

বুঝলুম ফগুয়ার হয়ে গেছে। ফগুয়া বদলে গেছে। আমাদের কোম্পানীর চটকলে যতগুলো শ্রমিক ইউনিয়ন ছিল তার প্রায় প্রত্যেকটার সঙ্গে কিছু না কিছু স্বার্থান্বেষী লোকের যোগাযোগ ছিল। ইউনিয়ন চালনের ভার যাদের উপর গিয়ে পড়ত, দেখা যেত তারা অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিক নয়—হয় বাইরের লোক, হয়তো বা শিক্ষিত কেরানীবাবু, না হলে কোম্পানীর ভাড়া করা লোক। এই নতুন ইউনিয়নটি এবং এরই মতো আরও কিছু কিছু শ্রমিক ইউনিয়ন সম্প্রতি দেখা দিতে শুরু করেছে যেগুলিকে চালিত করছে আবদুলের মত কারখানারই শ্রমিকেরা, যারা নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে বোঝে শ্রমিকদের সমস্যা, শ্রমিকদের দুঃখ, শ্রমিকদের দরদ, যারা শ্রমিকদের সত্যিকারের প্রতিনিধি হয়ে কথাবার্তা তর্ক-বিতর্ক করতে পারে কর্তৃপক্ষ বা লেবার কমিশনারের সঙ্গে।

ফগুয়া বললে—শুনছি হুজুর এবারে ছাঁটাই শুরু হবে। এদিক দিয়ে হুজুর আমাদের অনেক কিছু বলবার আছে। চোখ বুজে ছাঁটাই নীতি চালালে হুজুর দু'পক্ষেরই ক্ষতি। তাতে অনেক গোলমালও হতে পারে। ছাঁটাই না করেও কেমন করে চটকলে নতুন যন্ত্র আনিয়ে উৎপাদনের হার বাড়ানো যায় এ বিষয়ে আমরা কথা বলতে চাই। দাস সায়েব যদি এ নিয়ে আবদুলকে ডেকে পাঠান তো বড় ভালো হয়। শুনেছি দাস সায়েব লোক ভালো।

আমি বললুম—হা কপাল! ফগুয়া, তুমি দেখছি খবর রাখো না। ছাঁটাই-এর ব্যাপারে দাস সায়েবের বা ওর মতো কোনো

সায়েবরই আর হাত নেই। দাস সায়েবদের উপর এক নতুন সায়েব এসেছেন—কাপুর সায়েব। ছাঁটাই-এর সব ভার তাঁর হাতে। নিজে তিনি সরাসরি দেখবেন। আবতুলকে নিজেই গিয়ে কাপুর সায়েবের সঙ্গে দেখা করতে বল। কাপুর সায়েব তাকে ডেকে পাঠাবেন বলে আমার মনে হয় না।

আবতুলের ইতিহাস তারপরে শুনলুম।

চটশিল্প যতদিন থেকে আরম্ভ হয়েছে তারপর আজ অবধি চার আনা মাত্র মজুর চটকলের আশেপাশে উপনিবিষ্ট হয়ে গেছে। বাকি বারো আনা মজুরেরই ঘর-তুয়োর এখনও গ্রামেই আছে। এরা প্রত্যেক বছরই বসন্ত এবং গ্রীষ্মকালে অন্তত তু-মাসের জন্মে দেশে ফিরে যায়। চটপতিরা কোনদিন এই সব মজুরদের চটকলের কাছেই ভালোভাবে থাকবার ব্যবস্থা করে দেন নি। তারা কুকুর বেড়ালের মতই থেকেছে এবং প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে দেশে গিয়ে কিছুদিনের মতো প্রাণ জুড়িয়ে এসেছে। কলওয়ালারা কোনোদিন শ্রমিকের অভাব অনুভব করেন নি বলেই তাদের ভালো ঘর তুয়োর দেবার প্রয়োজনও বোধ করেন নি। এদের মধ্যে যে চার-আনা অংশ ধীরে ধীরে বহু বাধাবিপত্তি কাটিয়ে শহরতলীতে ঘর বেঁধে ফেলেছে আবতুলের পরিবার হচ্ছে তাদের মধ্যে অন্যতম।

১৯১৮ সালে আবতুলের বাবা আল্ করিম প্রথম জগদ্দলে আসে। উত্তর প্রদেশের গাজীপুরের তাঁতী। ক' পুরুষ যে মাকু ঠেলে এসেছে তার ঠিক নেই। বংশ পরম্পরায় বাপ ছেলেকে, ছেলে আবার তার ছেলেকে পরম যত্নে তাঁতের কাজ শিখিয়ে এসেছে। আল্ করিমের বাপ ঠাকুর্দারা তাঁতের কাপড়ের যুগের লোক; আল্ করিমের আমলে

এল কলের কাপড়ের যুগ। গাজীপুরের বাজারে যখন আশপাশের কল থেকে এবং ম্যান্‌চেস্টার থেকে কলে-বোনা কাপড় আসতে শুরু হল তখন তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নড়িয়ে দিল গাজীপুরের তাঁতীদের বেঁচে থাকবার ভিত। এর উপর আল্‌ করিমের পরিবার বৃদ্ধি হওয়ায় তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হল গাজীপুরে তাঁত চালিয়ে তাঁতের লুঙ্গি, তাঁতের শাড়ি, তাঁতের ধুতি বেচে পেট চালানো। এক সময় শোনা যায় আবছুলের ঠাকুর্দাকে গ্রামের কে একজন খুশী হয়ে দশ বিঘে জমি দিতে চেয়েছিলেন। ঠাকুর্দা সে জমি নেন নি। বলেছিলেন, কিসের অভাব আমার? কিসের ছুঃখ? চার পাঁচ ঘণ্টা মাকু ঠেলে যা রোজকার হয় তাতেই স্থখে চলে আমার সংসার। কাদা-মাটি ঘাঁটতে যাবো কেন আমি? কিন্তু এখন আর সে দিন নেই। আল্‌ করিম কলকাতায় চলে এসে জগদ্দলে গিয়ে চটকলে কাজ নিতে বাধ্য হল। তখন তার রোজগার ছিল হপ্তায় পাঁচ টাকা। পাঁচ-টাকা-হপ্তার চাকরি পাওয়ায় আল্‌ করিম তার বউ আর ছুই কন্যাকে এনে জগদ্দলে রাখল। ঐ টাকাতেই বেশ চলত তখনকার দিনে। পাঁচ বছর পরে ১৯২৩ সালে আবছুলের জন্ম হয়। তারপর আর এক ভাই। ছুই ছেলে বাড়ায় দেখা গেল ঐ মাইনেয় পেট আর চলে না। তবু চেষ্টা চললো কিছুকাল। শেষে আর না পেরে ১৯২৮ সালে আল্‌ করিম তার ছেলে-মেয়ে-বউকে পাঠিয়ে দিল দেশে। এই একটা অভ্যেস কলের মজুরদের আছে। যখন দেখে বউ-ছেলে নিয়ে আর সংসার চালানো যাচ্ছে না, বাচ্চাগুলো খাই-খাই করেও কিছু পাচ্ছে না, তখন বউ-ছেলেদের দেশে পাঠিয়ে দেয়। ও-ই যেন পরম সমাধান। যে সমস্যার কোনো সমাধান নেই তার দিকে তাকিয়ে না দেখে চোখ বুজে থাকাই ভাল—এই ভাব। দেশে ছেলে-পিলেগুলোর কি হচ্ছে জানবার দরকার নেই—মাসে-মাসে যে কটা পারে টাকা মানিঅর্ডার করে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত। এর বেশী আর কী-ই বা করতে পারে তারা? মাঝে মাঝে যখন হঠাৎ নিরক্ষর বউ

গ্রামের কাউকে দিয়ে চোখের জল ভরা একখানা চিঠি পাঠিয়ে দেয় তখন তা পড়ে বেচারা মস্ত একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে, তারপর চিঠিটা সযত্নে মুড়ে তেল চিট্‌চিটে বালিসের তলায় রেখে দেয়। তারপর কিছুদিন পরে চিঠিটার কি হয় কেউ কোন খবর রাখে না। আল্‌ করিমের বউও এইভাবে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে দেশে ফিরে গেল। তার পর বছরের পর বছর কি উপায়ে যে সেই দুঃস্থা গৃহিণী ছেলে-পুলের জন্য দু-বেলা দু'মুঠো ভাতের যোগাড় করতেন তার খোঁজ আল্‌ করিম করতও না, করবার উপায়ও ছিল না।

ক্রমে আবদুল ন-বছরেরটি হল। এতদিন সে একবর্ণও লেখাপড়া শেখেনি। হাটে যাবার পথে খোলা আটচালার তলায় স্কুল। সেইখানে প্রায়ই তাকে দেখা যেত একখানা বাঁশের খুঁটি ধরে হেলে দাঁড়িয়ে থাকতে। দূর থেকে শুনতো ছেলেদের পড়া। মাঝে মাঝে মাস্টারের তাড়া খেয়ে ছুটে পালাতো, তারপর আবার আসত সেই জায়গাটিতে। মাকে কোনোদিন সে বলেনি যে সে স্কুলে পড়তে চায়। তার বরং একটা ভয়ই ছিল স্কুলের। রাগী মাস্টার, বেত, ধমক এই সবই চোখে পড়ত বেশী। তবু কী যেন তাকে টানত। গ্রামের ছেলেদের জটলা দেখবার আগ্রহে সে ফিরে ফিরে গিয়ে দাঁড়াতো সেই বাঁশের খুঁটিকে জড়িয়ে। তার মা জানতেন ছেলের এই অভ্যাসের কথা। ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেবার তাঁর ইচ্ছে হত। কিন্তু কোনো উপায় ছিল না। স্কুলের মাইনে ছিল মাসে সাত পয়সা। সে সাত পয়সাও আবদুলের মায়ের ছিল না। আবদুল-এর যখন ন-বছর বয়েস তখন একদিন স্কুলের কর্তারা দয়াপরবশ হয়ে তাকে বিনামূল্যে স্কুলে ভর্তি করে নেন। আবদুলের আপত্তি ছিল স্কুলে যেতে। যে ভয়াবহ রহস্যময় জগতকে সে এতদিন দূর থেকে দেখে এসেছে তার অন্তঃপ্রদেশে প্রবেশ করবার সাহস তার কোথায়? কিন্তু মা ছাড়লেন না। জোর করে তিনি আবদুলকে পাঠিয়ে দিলেন স্কুলে।

স্কুলের পড়া শুরু হয়ে গেল আবদুলের। এই ভাবে সে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে। প্রাইমারি স্কুলের পড়া শেষ হলে মিড্‌ল্‌ স্কুল। কিন্তু মিড্‌ল্‌ স্কুলে কে আর তাকে ফ্রি পড়ায়? তা ছাড়া সে বড় হয়েছে, এইবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। তের বছর বয়সে চলে গেল সে বেনারসে মামার কাছে কাজের খোঁজে। গাজীপুরের সূতির কাপড়ের বাজারে তাঁতীরা মার খেয়েছিল বটে কিন্তু বেনারসী শাড়ির মতো কোনো কলে বোনা শাড়ি ম্যানচেষ্টার থেকে বেরয়নি। সেদিক দিয়ে বেনারসের রেশমের তাঁতীরা ছিল ভাগ্যবান। কাজেই তাদের তাঁত চলছিল আগেরই মত। আবদুল সেই সব তাঁতীপাড়ায় কাজের ফিকিরে ঘুরতে লাগল তার মামাকে নিয়ে। অনেক চেষ্টায় শেষে রেশমের কারখানায় অতি কম মাইনেয় তার একটা কাজ জুটে গেল। মাইনে পেত অতি সামান্য। তাতে আধপেটা খেয়ে কোনরকমে টিকে থাকা যায়। মাকে কিছু পাঠানোর কোনো প্রশ্নই উঠল না।

সেই সময় বহুদিন পরে আবদুলের বাপ তিন মাসের ছুটি নিয়ে দেশে ফিরল। ফিরে আবদুলের লেখাপড়ার প্রীতির কথা শুনল। শুনল বেনারসের রেশমের কারখানায় সে আধপেটা খেয়ে থাকে। ছেলেকে সে একখানা পোস্টকার্ড লিখে দিল চলে আসতে। ক-দিনের ছুটি নিয়ে আবদুল গাজীপুরে এল বাপের সঙ্গে দেখা করতে। আর সে ফিরল না। বাপ তাকে মিড্‌ল্‌ স্কুলে ভর্তি করে দিল। মাইনে মাসে পৌনে দশ আনা। চটকলে আল্‌ করিমের হপ্তায় এক টাকা মাইনে বেড়েছে। সে নিজেকে এখন মস্ত বড় লোক বলে মনে করে। কাজেই ঐ মাসিক পৌনে দশ আনা সে খরচের মধ্যে গণ্যই করল না। এইভাবে চললো বছর খানেক। ইতিমধ্যে আল্‌ করিমের আর একটি ছেলে হল। ছেলে হতেই খরচ বাড়ল আবদুলের মার। স্কুলের পৌনে দশ আনা মাইনে দেওয়া এবার তাঁর পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠল। মিড্‌ল্‌ স্কুলে আবদুল

সব পরীক্ষায় প্রথম হত। পণ্ডিত তাই দেখে শুনে আবছুলকে ছু-বছরের জন্যে ফ্রী করে দিলেন।

আল্ করিম আজকাল বছরে একবার করে দেশে আসে। কিছু কিছু হপ্তা বৃদ্ধি হওয়ায় এটা তার পক্ষে আজকাল সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু প্রতি বছর তার একটি করে ছেলে বা মেয়েও জন্মাচ্ছে। কাজেই হপ্তা বাড়লেও সাংসারিক অবস্থা সঙ্কট থেকে সঙ্কটতর হয়ে উঠছে ক্রমেই। শেষে আর উপায় রইল না। আল্ করিম দেশে চিঠি লিখল আবছুলকে পাঠিয়ে দিতে জগদ্দলে। ১৯৩৭ সালে পনের বছর বয়সে আবছুল এল বাপের কাছে বাপকে সাহায্য করতে। ছেলেকে আনাবার আল্ করিমের আরও একটা কারণ ছিল। সে সময় সর্দারদের একাধিপত্য। আর সেই সর্দারের সঙ্গেই আল্ করিমের চলেছে ঝগড়া। সর্দারের পায়ে মাথা না লুটিয়ে ফেললে চাকরিই যাবার সম্ভাবনা। আল্ করিম ভেবেছিল তার চাকরি গেলে ছেলেকে কোনো একটা কাজে লাগিয়ে দিয়ে সব দিক সামলাবে। কিন্তু হল অন্যরকম। আল্ করিম মাথা নোয়াল না। কয়েকদিনের মধ্যেই তার চাকরি গেল। আবছুল তখনও খালি হাতে বসে আছে। কাজেই তাদের অবস্থা হয়ে পড়ল আরো খারাপ। ছেলের কাজের জন্য আল্ করিম অনেক চেষ্টা করলে কিন্তু সর্দার বিরূপ থাকায় কিছুই হল না। তখন সে ছেলেকে বললে—দেখ, তুই এখানে থাক মাটি কামড়ে পড়ে। চাকরি তোর হবেই। দেশের মাকু তো উঠে গেছে, তাঁতীর ছেলে তোর চটকল ছাড়া আর কোনো গতি নেই। এই বলে নিজে সুদূর কানপুরের এক চটকলে একটা কাজ যোগাড় করে চলে গেল। মাইনে সেখানে মন্দ হত না। আগের চেয়ে বরঞ্চ ভালই। তার কিছু পাঠাতো দেশে, কিছু আবছুলকে। কিন্তু খাটুনি ছিল ভয়ানক। বয়েস হয়েছিল, তার উপর ছু-জায়গায় টাকা পাঠাবার জন্যে প্রায়ই তাকে আধপেটা খেয়ে থাকতে হত। এইতে ক্রমেই

তার শরীর দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল। সর্বোপরি কানপুরের প্রচণ্ড গরম তার আর সহ্য হল না। সে জগদ্দলে ফিরে এল। আগেকার গুমোর তার গেছে। ভুগেছে অনেক। শাস্তিও হয়েছে প্রচুর। সে সময় সবে ১৯৩৯ সালের মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে তাই সব কারখানাতেই লোক নেওয়া শুরু হয়ে গেছে। এই মরশুমে সর্দারের হাতে পায়ে ধরে আবার সে কোনোক্রমে একটা তাঁতের কাজ যোগাড় করে নিলে।

কানপুরের পরিশ্রমে আর ধকলে আল্ করিমের শরীর ভেঙে গিয়েছিল। সে একা আর কাজ করতে পারত না। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যেত তাঁতে। ছেলে এটা ওটা যুগিয়ে দিয়ে নানারকমে সাহায্য করত বাপকে। আল্ করিমের পিঠে একটা ঘা হয়েছিল অনেকদিন থেকেই ; এইবার সেটা বেড়ে উঠে ভীষণ আকার ধারণ করল। তাঁতে বসে কাজ করা তার প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। আবদুল তখন বাপকে দেশে পাঠিয়ে দিলে। ততদিনে সে তাঁতের কাজ শিখে নিয়েছিল ; তাই বাপের তাঁতটা সে-ই পেয়ে গেল।

আবদুলের হপ্তায় তখন ন-টাকার মত আয়। একার উপর সমস্ত সংসারের ভার এসে পড়ল। তাঁতিদের মধ্যে আবদুল ছিল সবার চেয়ে ছোট। উজ্জ্বল ছিল তার চেহারা। সায়েবের চোখে পড়ে গেল একদিন। সায়েব এসে তার সঙ্গে দুটো কথা বলে গেলেন। যুদ্ধের বাজারে তখন প্রচুর চটের ক্যাম্বিশের অর্ডার এসেছে চটকলে চটকলে। চটকলী ভাষায় বলা হয় কিরমিচ। সায়েব একদিন এসে আবদুলকে কিরমিচের তাঁতে বদলি করে দিলেন। অনেকের চোখ টাটালো তাতে। কারণ কিরমিচের তাঁতিদের আয় ছিল হপ্তার বাইশ থেকে তেইশ টাকা। আবদুল তখনই একটা পোস্ট কার্ড কিনে বাপকে এই সুখবরটা গোটা গোটা অক্ষরে লিখে দিলে। তিন দিন পরে জবাব এল তার বাপ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। চিঠি তাঁর কাছে পৌঁছয়নি। আবদুল

তখন তার মা-ভাই-বোনদের নিয়ে এল জগদ্দলে। এক দিদি আগেই মারা গিয়েছিল। আরেক দিদির বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। বাকি যারা ছিল তারা সবাই কলে এল। মা এসে আবদুলের বিয়ে দিয়ে দিলেন। তারপর যখন কলকাতার উপর জাপানী বোমা পড়ল আর দলে দলে মজুর ভয়ে পালাতে লাগল শহর ছেড়ে তখন সেই সুযোগে আবদুল ঢুকিয়ে দিল তার ভাইকে তাদের মিল-এ তাঁতের কাজে। ভাইয়ের বিয়ে দিল সে। তারপর দুই ভায়ের রোজগারে সংসার চলতে লাগল বেশ সচ্ছলভাবে।

গাজীপুরের সঙ্গে চুকে গেল সম্পর্ক। ভাই-দাদারা যারা ছিল দেশে একে-একে তাদেরও ভুলে যেতে থাকল এরা। জগদ্দলের বস্তি আর বাজারের লোকেরাই হয়ে উঠতে লাগল এদের আপন। এই সময় ওদের চটকলে একটা হরতাল হয়। কোম্পানী যা চালের রেশন দিত তা ছিল বড় কম। তাগড়া তাগড়া মজুররা হাড়ভাঙা খাটুনির পর এক এক গ্রাসে সেই ভাত খেয়ে শেষ করে দিত। তারা কোম্পানীকে বলেছিল চালের রেশন বাড়াতে। কোম্পানী জবাব দিয়েছিল, যার বেশী খাবার ইচ্ছে সে খোলা-বাজারে গিয়ে যত খুশী চাল কিনে খেতে পারে। এই সূক্ষ্ম যুক্তি ভোঁতা মজুররা বোঝেনি। তারা জানত রেশনের চালের দর আর খোলা বাজারের চালের দরের তফাত আশমান জমিন। তাই তারা ষ্ট্রাইক করে বসেছিল। হরতাল হবার পর মিল-এর বাইরে ডোমপাড়ার মাঠে মস্ত মিটিং হয়। আবদুল তখন শ্রমিক আঞ্জুমান-এর সেক্রেটারি। তাকে সবাই বলে মিটিং-এ কিছু বলতে। আবদুল এর আগে কোন দিন খোলা সভায় কিছু বলেনি। অথচ ছেলেবেলায় গাজীপুরে শুনেছে জওহরলাল নেহরুকে বক্তৃতা দিতে। শুনেছে সবার হাততালি। সেই রকম করে বক্তৃতা দিয়ে সেই রকম হাততালি পাবার তার অনেক দিনের ইচ্ছে। আবদুল উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে শুরু করল। আপনিই এসে গেল

কথাগুলো তার মুখে। সামান্য কয়েকটি কথা সে বললে। সবাই শুনলে মন দিয়ে তার কথা। হাততালিও দিলে। সব শেষে সে বললে—কোম্পানী বেঁকে বসেছে। আমরাও বেঁকে বসেছি। এ ক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য কোম্পানীর কাছে একটা ডেপুটেশান পাঠানো। কিন্তু ডেপুটেশানে থাকবে সব পার্টির প্রতিনিধি। এই প্রস্তাব গৃহীত হল। ডেপুটেশান তৈরী হল সব পার্টির লোক নিয়ে।

কোম্পানী কিন্তু ডেপুটেশানের সঙ্গে দেখা করলেন না। তাঁরা ধরে নিলেন আবদুলই এর নেতা। ম্যানেজার তাকেই ডেকে পাঠিয়ে কথা বললেন। ম্যানেজার বললেন—দেখ তোমার হাতে চোদ্দ হাজার মজদুর যারা হরতাল করেছে। কোম্পানী তোমায় চোদ্দ হাজার টাকা দিচ্ছে তুমি হরতাল মিটিয়ে ফেল। আবদুল টাকা নিতে রাজী হল না। ফিরে গিয়ে মজদুরদের বলল সে কথা। হরতাল মিটল না। চলল গড়িয়ে তিন হপ্তা। শেষে তদানীন্তন দের মাধ্যমে এবং তাদের আশ্বাসে হরতাল কোনো রকমে মেটে। রাজনৈতিক অঙ্গনে এই হল আবদুলের প্রথম প্রবেশ।

ইতিমধ্যে যুদ্ধ গেল মিটে। কিরমিচের অর্ডারও বন্ধ হল। বাইশ টাকার বদলে আবার সেই ন-টাকার তাঁতি হল আবদুল। দু' ভায়েয় পরিবার বৃদ্ধি হয়েছে ইতিমধ্যে। ছেলেপুলে অনেক। সংসার চালানো কঠিন হয়ে উঠল আবার। আবদুল ভাবলে সে এবার ব্যবসা করবে—বেচা-কেনার ব্যবসা। যুদ্ধোত্তর বাজারে অনেক বাড়তি মাল নিলেম হত। সেই সব দাঁওয়ায় কিনবে আর লাভে বেচবে। হাতে তার শ' তিনেক টাকা জমেছিল—এই নিয়ে ব্যবসায় নামল। ব্যবসায় নেমেই কিন্তু আবদুলের বৈশিষ্ট্য উঠল ফুটে। সাধারণ ব্যবসাদারেরা যেমন পরস্পর পরস্পরকে মেরে বড়লোক হবার চেষ্টা করে আবদুল সেদিক দিয়ে গেল না মোটেই। দুটো দাঁও সে মেরেছিল; দুটোতেই দেখিয়েছিল তার অদ্ভুত কর্ম-

তৎপরতা, তার চৌম্বকশক্তি এবং সংগঠনক্ষমতা। একটা রাঁচীতে আর একটা পানাগড়ে।

মিলিটারি লরির নানারকম অংশ বিক্রি হচ্ছিল রাঁচীর মিলিটারি গুদম থেকে। ভারতের নানা জায়গা থেকে ক্রেতারা গিয়েছিল নিলেম ডাকতে। রাঁচীতে পৌঁছেই আবদুল সেখানে যে-কজন ক্রেতা ছিল তাদের সকলের সঙ্গে দেখা করে বললে—দেখুন, নিজেদের মধ্যে রেষারেষি করে ডাকাডাকি করলে নিলেম-সামগ্রার দাম বেড়ে যাবে অনর্থক ; যে কিনবে সে-ও হয়ত লাভ করতে পারবে না, বাকি যারা খরচ খরচা করে এসেছে রাঁচীতে তারাও খালি হাতে ফিরে যাবে। তার চেয়ে এক কাজ করুন। নিজেদের মধ্যে একটা বোঝা পড়া থাকুক। পঞ্চাশ টাকা করে চাঁদা দিন সকলে এই মর্মে যে, কেউ ডাকাডাকি করবেন না। এক টাকার জিনিস এক পয়সা ডাকবেন। এইভাবে সস্তায় জিনিস কেনা হয়ে গেলে আমরা নিজেদের মধ্যে ডাকাডাকি করব আবার। তার ফলে যে লাভটা হবে সেটা নিজেদের মধ্যে বেঁটে নেব। আশ্চর্যের বিষয়, সবাই মেনে নিল এই পরিকল্পনাটা। আবদুলকে বিশ্বাস করে সবাই পঞ্চাশ টাকা করে জমা দিয়ে নামও লেখালো। নানা প্রদেশের নানা ফিকিরের ঘড়িয়াল সব ক্রেতা আবদুলের এক কথায় রাজী হয়ে গেল। নিলেমের দিন নিলেমদারের তো চক্ষুস্থির। কোনো জিনিসেরই দাম ওঠে না। তিনি দেখে শুনে বললেন—মনে হচ্ছে এখানে কোনো রাজনৈতিক এসেছে। যাই হোক দাম না উঠলেও মাল তিনি আটকাতে পারলেন না। সরকারের নিয়ম অনুযায়ী নিলেম সামগ্রী ধরে রাখবার উপায় ছিল না। তাই নামমাত্র মূল্যে বেচে দিতে হল সব জিনিস। ক্রেতারা আবার নিজেদের মধ্যে ডাকাডাকি করে যে যা পারে নিয়ে গেল। সরকার যে লাভটা করতেন সেটা অর্শালো ক্রেতাদের। তারপর যখন লাভের কড়ির ভাগ বাঁটোয়ারা হল, দেখা গেল যাঁরা নাম লিখিয়েছিলেন তাঁরা

প্রত্যেকে পঞ্চাশ টাকার উপর আরো একশ পঁয়ষট্টি টাকা করে লাভ করেছেন।

পানাগড়ে গিয়েও আবদুল ঠিক এই কাণ্ড করল। সেখানেও জোট পাকালো ক্রেতাদের নিয়ে। সরকারকে কোণঠাসা করে মাল নিয়ে বেরিয়ে গেল সাফ। কিন্তু তার পর আর তার মন বসল না এদিকে। নিজের সংগঠন ক্ষমতার উপর তার একটা বিশ্বাস জন্মেছিল। নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছিল নিজের ক্ষমতা দেখে। কিন্তু যে সংগঠন দু-দিনে ভেঙে যায়, নিলেম শেষ হয়ে গেলেই যেখানে যে-যার স্বার্থে জড়িয়ে পড়ে ছড়িয়ে পড়ে দিক-বিদিকে তাতে আর আবদুলের আকর্ষণ বা ঝোঁক রইল না। সে ফিরে এল চটকলে—যেখানে সে নিজের মনের মতন করে স্থায়ী সংগঠন গড়তে পারে। যেখানকার মানুষগুলোর সংযুক্ত স্বার্থ এক অলিখিত দীর্ঘ লড়াইয়ের শেষ পর্যন্ত নিজেদের এক করে রেখে দেবে। সে বুঝলে যে, এ-ই চাইছিল সে মনে মনে। অনটন অভাব তো আছেই। সেজন্য সেজো ভাইকেও চটকলের কাজে লাগিয়ে দিলে। তাতে খানিকটা সুরাহা হল। এইবার সে চটকলের তাঁতী হয়ে স্থায়ীভাবে বসল চটকলের বস্তিতে।

॥ কুড়ি ॥

আবদুল নিজেই গিয়ে দেখা করল কাপুর সায়েবের সঙ্গে। সঙ্গে নিয়ে গেল ফগুয়াকে। কাপুর সায়েব তার কথা শুনে বললেন—ছাঁটাই? ছাঁটাই করবে কেন কোম্পানী? আধুনিকীকরণ হচ্ছে মিলগুলোর, যাতে দুনিয়ার বাজারে ভারতের চটশিল্প ভাল ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে—এর সঙ্গে ছাঁটাই-এর কি সম্পর্ক?

ফগুয়া একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু

বাইরে এসে আবতুল বললে—আমার ভাই ব্যাপারটা একেবারেই সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না। এক-শ কোটি টাকার আধুনিকীকরণ হলে ছাঁটাই হতে বাধ্য, যদি এরা নিজেদের পূর্বতন লাভের কড়ি অটুট রাখতে চায়। তবে কাপুর সায়েবের কথা শুনে মনে হচ্ছে সোজাসুজি ছাঁটাই হবে না, খুব শিগ্‌গিরও হবে না। আড়ালে আড়ালে চলবে কারবার। হুঁশিয়ার থাকতে হবে আমাদের। অবশ্য কি করতে পারব জানি না। চোরা ছাঁটাই-এর বিরুদ্ধে লড়া সহজ নয়।

চটকল যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল। ছাঁটাই-এর যে আতঙ্কটা উঠেছিল চারিদিকে, সেটা মিলিয়ে গেল আস্তে আস্তে। অবশ্য শোনা গেল নতুন যন্ত্রের অর্ডার গিয়েছে বিলেতে। কিন্তু সে যন্ত্র কবে যে এসে পৌঁছবে কেউ বলতে পারলে না। যন্ত্র আসতে যে এখনও অনেক দেরি এই কথাই সবাই বললে। আরো শোনা গেল, ভারত সরকার এ দেশের কোনো কোনো ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানীর মালিকদের নির্দেশ দিয়েছেন তাঁরা যেন বিলেত থেকে বিশেষজ্ঞ আনিয়ে এ দেশেই চট বোনার যন্ত্রপাতি উৎপাদন শুরু করে দেন। এই সব শুনে বোঝা গেল তু-পাঁচ মাসের মধ্যে আধুনিককরণ হচ্ছে না, কয়েকটা বছরই হয়তো গড়াতে পারে। কাজেই তার প্রথম ধাক্কাটা এসে পৌঁছতে এখনও দেরি।

এই সময় হঠাৎ আমাদের কারখানায় একটা অ্যাক্‌সিডেন্ট হল। স্পিনিং শেড-এর বেল্টিং গার্ড কোথায় যেন আলগা হয়ে খুলে পড়েছিল। এক বেচারা উড়িয়া মজুর, প্রায় সতেরো বছরের পুরোনো লোক, আচমকা ধরা পড়ে গেল সেই বেল্টিং-এর খপ্পরে। প্রকাণ্ড এক জিভ বার করে যেন চেটে তুলে নিল তাকে। সঙ্গে সঙ্গে হল তার মৃত্যু। কেউ কিছু করতে পারল না।

কারখানায় অ্যাক্‌সিডেন্ট হয়। ছোটখাট ঘটনা প্রতি হপ্তায়

হয়ে থাকে। অ্যাক্‌সিডেন্ট-এ মানুষ মারাও যায়। কিন্তু লোকনাথের এই অ্যাক্‌সিডেন্টটার একটু বিশেষত্ব ছিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে এর ওর মুখে সারা কারখানায় ছড়িয়ে পড়ল খবরটা। প্রায় সবাই এই দুর্ঘটনাটা নিয়ে কতরকম আলোচনা যে শুরু করে দিলে তার ঠিক নেই। আর আলোচনার শেষে সবাই বললে—দৈবের অমোঘ শক্তি কে খণ্ডাবে ? লোকনাথের মৃত্যু যে ঘনিয়ে এসেছে এ পূর্ববোধের সঙ্গে প্রকৃত ঘটনার এমন আশ্চর্য মিল দেখে কারখানার মানুষদের উত্তেজনার আর সীমা রইল না।

কারখানার সবাই জানত এ বছর ফাল্গুন মাসে লোকনাথ দেশে গিয়েছিল। সেখানে সে এক মাসের বেশী থাকতে পারেনি। ফিরে এসেছে। সতের বছর পরে লোকনাথের এই প্রথম দেশে যাওয়া। এতদিন পরে গিয়ে এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসা যেমন অস্বাভাবিক তেমনি অদ্ভুত। কিন্তু এর যথেষ্ট কারণ ছিল। সতের বছর আগে লোকনাথের বয়েস যখন একুশ, ঠিক ফগুয়ারই মতো সে ছুটি নিয়ে টাকা ধার করে দেশে যায় বিয়ে করতে। গিয়ে দেখে তার বুড়ো বাপ তার আসার খবর পেয়ে আগে-ভাগেই মেয়ে ঠিক করে বসে আছে। তার বাপের স্বভাবই অমনি। সব দিক বিচার করে চলত। গোনা-গুনতি ছুটি নিয়ে ছেলে দেশে আসছে। বিয়ে করতে আসছে। এই ছুটির মধ্যে বিয়ে দিয়ে সব হাঙ্গামা চুকিয়ে ফেলতে হবে। একদিনও যাতে ছুটির দেরি হয়ে না যায়, তাই বুড়ো যতটা পারে কাজ এগিয়ে রেখেছিল। মেয়ে দেখে, মেয়ে পছন্দ করে মেয়ের বাপকে কথা দিয়ে তাকে বলে রেখেছিল তৈরি হয়ে থাকতে। তার ছেলে এলেই যাতে বিয়ের তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। লোকনাথের বাবা বিচক্ষণ ব্যক্তি, আট ঘাট বেঁধে কাজ করেন। বিয়ের আগে ছেলের একবার হাত দেখানো দরকার। তাই গ্রামের গুণীনকে বলে রেখেছিলেন। গুণীন এসে হাত দেখল। দেখে গণনা করে বলে দিলে এ

বিয়ের ফল ভালো হবে না। এ ছেলে ঐ বউ-এর মুখ দেখলেই মরবে।

সর্বনাশ! আজ বাদে কাল বিয়ে। সব ঠিক। এখন এই কথা বলে! বুড়ো বাপ ভারি রাগ করল। গুণীনকে ডেকে বললে—টাকা আদায়ের ফন্দি করেছ? শান্তি স্বস্ত্যয়নের ঘটা করে আমার ঘাড় ভাঙবে? সেটি হচ্ছে না। গুণীনও রাগ করল। বললে—আমি তো টাকা চাচ্ছি না। গণনায় যা পেয়েছি, বলে দিলুম। এখন অপনারা বুঝুন। বলে সে মুখ গোঁ করে চলে গেল। হয়তো মোচড় দিয়ে কিছু টাকা আদায়ের উদ্দেশ্য ছিল গুণীনের। কিন্তু এই রাগারাগির ফলে কিছুই হল না, স্বস্ত্যয়ন তো হলই না। অনেকে এসে বুড়োকে বললে—গুণীন যখন গুনে বলেছে অশুভ ফল, তখন বিয়ে না দেওয়াই ভাল। বিয়ে ভেঙে দেওয়া হোক। কিন্তু গর্বান্ধ বুড়োর আত্মসম্মান ছিল টনটনে। সে নিজে বিয়ে ঠিক করেছে। ছেলে আসছে খবর পেয়ে আগেভাগে কনে দেখে পছন্দ করে রেখেছে। এখন কি এ বিয়ে ভেঙে দেওয়া যায়? সে বললে—কথা যখন দিয়েছি, ও-বিয়ে হবেই, চলুক সব আয়োজন।

বুড়োকে ঠেকানো গেল না। দেখে শুনে সবাই বললে—হাজার হোক গুণীনের কথা। ঠেলবার নয়। আবার বুড়োও যদি ঘাড় হেঁট করতে না চায় তা হলে এক কাজ করা যাক। বিয়ে হয়ে যাক। কিন্তু লোকনাথকে তার বউ-এর মুখ দেখতে দেওয়া হবে না। বিয়ে করেই সে কারখানায় ফিরে যাক।

তাই হল। পাঁচজনের সুপরামর্শে লোকনাথ বউ-এর মুখ না দেখে বিয়ে করেই কারখানায় ফিরে এল। বন্ধুদের মুখেই শুধু শুনল বউ হয়েছে টুকটুকে ফুলের মত। সেই থেকে সতের বছর সে দেশে যায়নি, বউ-এর মুখও দেখেনি।

তারপর এতদিন পরে হঠাৎ কেন তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠল কে জানে? সতের বছর প্রতি বছর বসন্তের আগমনে সে দেখেছে

কেমন করে সবাই যায় আসে। কেউ যায় তার প্রিয়জনের টানে, কেউ যায় কোনো অজানাকে নিজের করে নেওয়ার মোহে, ঘর বাঁধার আগ্রহে। কেউ যায় শুধু ফাল্গুনের বাতাসের স্পর্শে। যাওয়া আর আসার এই স্রোত সে বারবার দেখেছে আর নিঃশ্বাস ফেলেছে। তারপর শেষে আর পারেনি থাকতে। যৌবন তখন তার প্রায় অতিক্রান্ত। বসন্তের বাতাস এতকাল শুধু এসেছিল আর তাকে পিছনে ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল। এবার সে নিল তার পিছু। যার কথা প্রাণপণে ভুলে ছিল তাকে প্রাণপণে মনে পড়ল এতদিনে। অনেকে বারণ করেছিল তাকে। মনে করিয়ে দিয়েছিল গুণীনের কথা। কিন্তু লোকনাথের মন আর মানে নি। ষোলোটা বসন্তের পর সতের বারের বার ফাল্গুনের প্রথম হাওয়ায় তখন বস্তির সজনে গাছে নতুন পাতা উঁকি দিতে শুরু করেছে। ফগুয়া আর অন্যান্য জোয়ান ছেলেরা দল বেঁধে যাচ্ছে বিয়ে করতে। লোকনাথের মনে পড়ল সতের বছর আগেকার একদিনের কথা— যেদিন এদেরই মত রঙিন মন নিয়ে সে বেরিয়ে পড়েছিল তার শৈশবের কৈশোরের মাটির টানে।

তাকে আর ঠেকানো গেল না। গেল লোকনাথ দেশে। দেখল তার এতদিনের বিয়ে করা বউ-এর সুন্দর মুখ। দেখল তার নিজের বউকে, যাকে সে চেনে না, যে তার পর, যাকে নিয়ে কোনোদিন সে ঘর করেনি। লোকনাথ থমকে দাঁড়াল তার নারীর সম্মুখে। অভিমান আর অবহেলার এক পাহাড় জমা হয়ে রয়েছে দু'জনের মাঝে। তার ওপারে রয়েছে যে অচেনা নারী, কেমন করে তাকে আপনার করে নেবে তা সে জানে না। কেমন করে জানাবে সে তার মনের ভাব মনের আকুতি? লোকনাথের কোনো বিদ্যে, কোনো কৌশল, কোনো কিছুই জানা নেই। বিমূঢ়ের মতো ঘুরে বেড়াল সে তার সুন্দরী বউ এর চারিপাশে; ভিতরে প্রবেশ করবার কোনো পথই খুঁজে পেল না। তখন মনে পড়ল তার কারখানার কথা। মনে হল এক

অজ্ঞের শক্তির অমোঘ ইঙ্গিতে তার আশ্রয় তার জীবনের গতি সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে এক চটের কারখানার পরিসীমাতে। এর বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা তার নেই ; ইচ্ছেও লুপ্ত হয়েছে। বউ-কে নিয়ে সে ঘরও করতে পারলে না, দেশেও টিকতে পারলে না একমাসের বেশী। ভাঙ্গা মন নিয়ে ফিরে এল সে কারখানায়। ভাবল যে যৌবন তার কত সুখের হতে পারত সেই যৌবনের কথা। বসে বসে ভাবল তার সুন্দরী বউ-এর কথা।

তবে যতই তার মন খারাপ হোক কারখানায় ফিরে এসে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে। দেশের আবহাওয়া যেন তার বুক চেপে ধরেছিল। মনে মনে সে স্বীকার করলে, এই চটকলের মজুরগুলো, এমন কি এর ঘর বাড়ি কলকব্জাগুলোও সুখে দুঃখে এতদিন তার সঙ্গে কাটিয়ে তার আপন হয়ে গেছে। কই, দেশে তো এমন আপন-জন একটিও পায়নি। নিজের বউ সেও তো হয়েছে পর।

ফিরে আসা অবধি লোকনাথের চিন্তাকে অধিকার করেছিল তার ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাওয়া অজানা জীবনের আফশোস। গুণীনের বারণের কথা সে ভুলেই গিয়েছিল। মন থেকে মুছে ফেলেছিল সে কথা। কিন্তু সে ভুলে গেলেও কারখানার আর সবার মনে গাঁথা ছিল সেই সতর্কবাণী। লোকনাথ ফিরে আসার পর থেকে তারা শুধু এই কথাই ভাবত যে, এইবার লোকনাথের কী হবে! লোকনাথ তার বউ-এর মুখ দেখে এসেছে। গুণীনের বারণের ফল এইবার কবে ফলবে? তারা সবাই প্রতীক্ষা করছিল।

এই কারণে লোকনাথের মৃত্যুর খবরটা আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। সবাই একযোগে বললে—এতো হবেই। এই তো হবার কথা ছিল।

দাস সায়েব আমাদের ডেকে বললেন—হিসেব করে দেখো লোকনাথের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আর কম্পেনসেশান বাবদ কত পাওনা হবে। আর কে ওয়ারিশ আছে তার খোঁজ নাও। ওয়ারিশের খবর

সহজেই মিলল। কারখানা-সুদ্ধ সবাই জানে তার একটা বিয়ে-করা বউ দেশে আছে, যার মুখ দেখে সে মরেছে। ছেলেপুলে তার নেই। যা পাবে সব ঐ বউ। খাতাপত্র উল্টে পাল্টে লোকনাথের প্রভিডেন্ড ফাণ্ডের হিসেব খাড়া করতে আমার প্রায় সন্ধে হয়ে গেল। পর-দিন দাস সায়েবকে দেখালুম লোকনাথের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে পাওনা হয়েছে ষোল-শ টাকা।

দাস সায়েব বললেন—এর উপর প্রায় চব্বিশ শ' টাকা কম্পেনসেশান। তা হলে চার হাজার টাকার মত পাবে ওর বউ। সুজিত, ওর দেশে টেলিগ্রাম করে ওর মৃত্যুর খবর দিতে বলেছিলুম, দেওয়া হয়েছে ?

—আজ্ঞে দিয়েছি।

—বেশ, তবে লোকনাথের কাগজপত্র তৈরী কর।

ডাক্তারের রিপোর্ট, পুলিস রিপোর্ট, ফ্যাক্টরি ইনস্‌পেকটারের রিপোর্ট প্রভৃতি তৈরি হতে আর পেতে সময় লাগে। এইসব দাখিল করতে হবে মিল ম্যানেজারে কাছে। মিল ম্যানেজার পাঠাবেন হেড আপিসে কলকাতায়। এমনি নানারকম ব্যাপার চুকলে তারপর টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা।

হচ্ছে, হবে করে এসব কাজ ধীরে সুস্থে এগয়। কে আর কার জন্যে নাওয়া খাওয়া ফেলে ফাইল খাতা টেনে হেঁচড়ে তাড়াহুড়ো করে কাজ উদ্ধার করে দেয় ? তাই গয়ং গচ্ছ করে লোকনাথের কাগজপত্র তৈরি হচ্ছিল, এমন সময় হঠাৎ একদিন লোকনাথের মা বাপ আর বিধবা বউ দাস সায়েবের আপিসে এসে হাজির। তারা বললে—খবর পেয়ে তারা ছুটে এসেছে। লোকনাথের পাওনাকড়ি যা আছে তা যেন দয়া করে ঐ বউটিকে দিয়ে দেওয়া হয়।

দাস সায়েব তাদের হঠাৎ আসায় খানিকটা বিব্রত বোধ করে বললেন—পাওনা যা আছে তা তো লোকনাথের বউ পাবেই। কিন্তু তার ব্যবস্থা করতে সময় লাগবে—তাড়াহুড়োর কাজ এসব নয়।

তারা এত খরচপত্র করে এত তাড়াতাড়ি ছুটে এল কেন ?

লোকনাথের বাবা বললে, ছেলে কোথায় মরেছে সেই স্থানটা তার একবার দেখা দরকার এই কারণে আসা। আর এসে যখন পড়েইছে তখন আর যা কিছু কর্তব্য আছে সব সেরে যাওয়াই ভাল।

দাস সায়েব বললেন, তিনি যত তাড়াতাড়ি পারেন কাজটা চুকিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন।

লোকনাথের বাবা-মার তখনও বিন্দুমাত্র ধারণা নেই যে, কত টাকা লোকনাথ পাবে। তারা জানত, হয়ত এক হপ্তার মাইনে, আর মানুষটা মারা গেছে ভেবে বিধবা বউ-এর মুখ দেখে কোম্পানী যদি দয়া করে কিছু দেন।

লোকনাথের বাবা দাস সায়েবের আপিস থেকে বেরতেই একজন বললে—লোকনাথের বাবা বটে ?

—হ্যাঁ, তুমি কে বট ?

—আমি কারখানার মিস্ত্রি। চতুরানন মিস্ত্রিকে সবাই চেনে। আমাকে ডাকে চতুরা বলে। কটক জিলার মানুষ আমি। লোকনাথকে জানতুম শুনতুম। লোকনাথকে মরতেও দেখলুম ছুই ওখানে কলে আটকা পড়ে।

—লোকনাথকে তুমি মরতে দেখেছ ? একবার দেখাও তো ভাই। কোন কলে তাকে নিয়ে গেল একবার দেখি ?

চতুরানন লোকনাথকে মরতে দেখেনি। কিন্তু কারখানার কলের একটা বেল্টিং দেখিয়ে কেমন করে বেল্টিং জড়িয়ে মানুষ মারা যায় তা বুঝিয়ে দিতে তার একটুও অসুবিধে হল না।

লোকনাথের মা এক-মাথা ঘোমটা টেনে ঘন ঘন চোখের জল মুছলেন, আর এই বিদেশে চতুরার মত এমন একজন পরমাত্মীয়ের মত মানুষ পেয়ে বর্তে গেলেন। তিনি ধরে নিলেন এই রাক্ষুসে কারখানায় তাঁর অসহায় পুত্রের একমাত্র বিশেষ বন্ধু ছিল এই চতুরা।

চতুরা তাদের ডেকে নিয়ে গেল নিজের বাসায়। বললে—এখানেই থাকুন আপনারা। কোনো চিন্তা করবেন না। এমন আতিথ্য এমন আশ্রয় পেয়ে এরাও নিশ্চিন্ত হল। বিশেষ করে দেশের মানুষ। লোকনাথের বন্ধু। বাসায় ডেকে নিয়ে চতুরা তাদের শুনিয়ে দিল কম্পেনসেশানের- অঙ্কটা কত বড়। শুনে লোকনাথের বাবা যেমন অবাক হল তেমনি হল তার লোভ। সে ঠিক করলে এই টাকা হাতে নিয়ে তবে সে দেশে ফিরবে।

দাস সায়েব চেষ্টা করছিলেন যত তাড়াতাড়ি পারেন লোকনাথের পাওনাকড়ি চুকিয়ে দেবার কিন্তু হেড আপিস থেকে খবর এল, যে সায়েব সই সাবুদ করবেন তিনি দু-হপ্তার ছুটি নিয়ে গোপালপুর গেছেন সমুদ্র-স্নান করতে। তিনি ফিরে না-আসা পর্যন্ত কাগজপত্র অপেক্ষা করবে তাঁর আপিসে। দাস সায়েব শুনেছিলেন যে, লোকনাথের বাবা বিশেষ করে টাকার জনেই চতুরার ঘরে রয়ে গিয়েছে। তাই এই দেরির খবর শুনে একটু উদ্বিগ্ন হয়ে তাদের ডেকে পাঠালেন। বললেন—টাকা আসতে দেরি হবে। খাতাপত্রের ব্যাপার—তাড়াতাড়িতে হয় না। তোমরা বাড়ি ফিরে যাও। কোনো চিন্তা কোরো না—যখন সময় হবে পুরো টাকা লোকনাথের বউ-এর নামে ডাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

লোকনাথের বাবা বললে—একটু দেরি হয় হোক। চতুরা বলছিল টাকাটা আদায় হলে সঙ্গেকরে নিয়ে যাওয়াই বরং ভালো।

—এই কথা বলছে চতুরা? তার ঘরে থাকার জন্যে কত দিতে হচ্ছে তাকে?

—দৈনিক দশ টাকা করে।

—তবে? সে তো বলবেই। দেশের লোক হলে হয় কি? নতুন লোক পেয়ে তোমাদের গলা কাটছে। কি খেতে দেয়? শাক ভাত? মাছ দেয় না নিশ্চয়?

—আজ্ঞে গরীব মানুষ আমরা—শাক-ভাতই আমাদের পরমান্ন।

—মাঃ চতুরা তোমাদের ঠকাচ্ছে। সেই জন্যেই আরো রাখতে চায়। তোমরা দেশে চলে যাও। কিছু ভেব না। টাকা ঠিক পৌছে যাবে।

—যে আজ্ঞে।

বলে লোকনাথের বাবা চলে গেল।

কিছুদিন পরে সে আবার দাস সায়েবের আপিসে এসে হাজির।

দাস সায়েব আবাক।

—সে কি! এই যে বললে তোমরা চলে যাচ্ছ? টাকা তো এখনও এসে পৌছয়নি। এখনও দেরি আছে। চতুরার কাছে টাকা গুণছ তো?

—আজ্ঞে চতুরা দশ টাকা থেকে কমিয়ে চার টাকা করে দিয়েছে। লোক ভালো। আর লোকনাথের জানাশোনা ছিল তো? আমাদের অপকার করবার জন্যে কিছু করবে না।

—উঁহু, আমার ভাল মনে হচ্ছে না। চার টাকাই বা নেবে কেন? ওতেও ওর যথেষ্ট লাভ। তা ছাড়া তোমাদের মিছিমিছি সময় নষ্ট পয়সা লোকসান হচ্ছে। টাকা পেতে এখনও অনেক দেরি। আমি আজই চিঠি পেয়েছি হেড আপিস থেকে।

চতুরা চার টাকা থেকে দু' টাকায় নামল। বললে—এত দূর থেকে এসেছেন, কলকাতা শহর দেখে যান। কালীঘাট দেখুন, দক্ষিণেশ্বর মন্দির দেখুন, চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, মনুমেন্ট, গড়ের মাঠ দেখুন তবে তো দেশে ফিরবেন? এই বলে বুড়ো-বুড়ীকে বাস্‌-এ চড়িয়ে শহর দেখতে পাঠিয়ে দিল।

লোকনাথের বাবা আরো কিছুদিন রইল। কিন্তু হাতের টাকা তার ফুরিয়ে আসতে লাগল। সে যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করতেই চতুরা এক টাকায় নামল।

আবার কিছুদিন রয়ে গেল লোকনাথের বাবা। দাস সায়েবের সঙ্গে দেখা করল। তিনি বললেন—হয়ে তো এসেছে প্রায় সবই,

কিন্তু এখনও অপেক্ষা করতে হবে কয়েকটা দিন। আগেই তিনি বলেছেন যে এখানে পড়ে থেকে তাদের কিছু লাভ হচ্ছে না। মিছিমিছি অর্থ নষ্ট হচ্ছে।

লোকনাথের বাবার হাতের টাকা এইবার সত্যিই ফুরিয়ে গেল। চতুরানন তখন বললে—ধার নিন। আমি টাকা ধার দিচ্ছি।

লোকনাথের বাবা কিন্তু মনস্থির করে ফেলেছিল দেশে ফিরবে বলে। তার আরও একটা জরুরী কারণ ছিল। ক-বার তারা যখন বাস-এ করে কলকাতা যায় লোকনাথের বউকে রেখে গিয়েছিল। চতুরা বলেছিল—সবে বিধবা, বেশী শহর দেখে বেড়ালে নিন্দে হবে। লোকনাথের বাবা ভেবেছিল, কথাটা ভালো। কিন্তু শহর থেকে সেদিন ফিরে এসে সন্ধের সময় বস্তিতে ঢুকতে যাবে, একজন বললে—শহর দেখে এলে ?

—হ্যাঁ ভাই, যাদুঘর দেখে এলুম। গাঁয়ের মানুষ, এসব আর কোথায় দেখব ?

—নিজেরা গেলে কই বউটিকে তো নিয়ে গেলে না ?

—বিধবা। নতুন সোয়ামী মরেছে। তাই রেখে গিয়েছিলুম।

—হুঁ। বলে লোকটা কেমন ভাবে তাকিয়ে একটু যেন মুচকি হেসে চলে গেল।

লোকনাথের বাবার সেটা একটুও ভাল লাগে নি। চতুরার ঘরে এসে দেখলে থানপরা বউটা মাথায় ঘোমটা দিয়ে চৌকাঠে বসে আছে। চতুরা সবে কারখানা থেকে ফিরে এসে রান্নার আয়োজন করছে।

লোকনাথের বাবা মনে মনে বললে—শহর দেখা তো অনেক হল। আর দরকার নেই। এইবার ফেরা যাক দেশে।

চতুরা তাই যখন ধার দেবার কথা বললে, লোকনাথের বাবা আর রাজি হতে পারল না। স্ত্রী আর বউকে নিয়ে দেশে ফিরে গেল।

এর কিছুদিন পরেই লোকনাথের বিধবা ফুলমণির নামে চার হাজার টাকা গিয়ে পৌঁছল ডাক মারফত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ফুলমণিকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। বাপের বাড়ি যাচ্ছি বলে দু'দিন আগে বেরিয়েছিল, কিন্তু বাপের বাড়িতে সে পৌঁছয়ও নি। একেবারে উধাও। ফুলমনির দাদা বেরল তাকে খুঁজতে। ডাকঘরে বলে গেল টাকাটা ধরে রাখতে কিছুদিনের জন্যে।

কোথায় তাকে খুঁজতে যাওয়া যায় এই নিয়ে লোকনাথের বাবার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে পরামর্শ করলে ফুলমণির দাদা। লোক-নাথের বাবার দু'একটা কথায় আর ইঙ্গিতে মনে হল প্রথমেই খুঁজে দেখা দরকার জগদ্দলে চটকলের বস্তিতে। এই ইঙ্গিত পেয়ে ফুলমনির দাদা এসে হাজির হল আমাদের চটকলে এবং বস্তির গলির মধ্যে চতুরার ঘরে আবিষ্কার করল তার বোনকে চতুরার বধূরূপে। মাথায় সিঁদুর, চওড়া লাল পেড়ে শাড়ি, হাতে গিল্টি করা আটগাছা করে চুড়ি।

দাদার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে পিঁড়ি পেতে দাদাকে বসিয়ে থালায় ভাত বেড়ে দিয়ে ফুলমণি যত্ন করে দাদাকে খাওয়ালে। খাওয়ার পর মাদুর পেতে দাদার হাতে পান তুলে দিলে। দাদার আর কিছু করবার ছিল না। সব দেখে শুনে গেল সে দেশে ফিরে। টাকা ফেরত এল গ্রামের ডাকঘর থেকে। লোকনাথের বিধবা, চতুরার বউ পেল চার হাজার টাকা। আর পেল স্বামীর আদর, হারোনো যৌবন, নিজের সংসার। তার জীবন-ভরা অবহেলার হল অবসান। আর তার চারিপাশ থেকে সরে গেল লোভাতুরের ভিড়।

দুষ্ট লোকে অবশ্য বললে, চতুরা লোকনাথের বউ-এর টাকার লোভেই অমন ফাঁদ পেতে তাকে ভুলিয়ে, শ্বশুর শাশুড়ির কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে তাকে বিয়ে করেছে। কিন্তু এ কথাও সবাই স্বীকার করলে যে, লোকনাথের বিধবা গ্রামে বসে ঐ টাকা পেলে

তার কিছুই সে ভোগ করতে পেত না। সবই গ্রাস করত তার শ্বশুর শাশুড়ি আর অন্যান্য আত্মীয় স্বজন। আজ সে চতুরার বউ হলেও রইল রাজরানী হয়ে।

॥ একুশ ॥

আমাদের কারখানায় আবার একটা অ্যাক্‌সিডেণ্ট হতে হতে বেঁচে গেল। অল্পদিনের মধ্যে পর পর এমনি ছুটো ঘটনা, প্রথমটায় একজন মানুষ মারা গেছে, দ্বিতীয়টায় কয়েকটা মানুষ মরতে পারত, এর গুরুত্ব সমস্ত মজুর-সমাজকে বিচলিত করেছে। তাদের মনকে নাড়া দিয়ে গেছে। এমনিতেই এদের কুসংস্কার ভরা মন, থেকে থেকে অশুভ ইঙ্গিত পায় বাতাসে, তার উপর চট কারখানার মত একটা জায়গা, যেখানে দৈত্যের মতো বড় বড় চাকা ঘুরছে, লক্‌-লক্ করছে ঘুরন্ত বেল্টিং-এর জিহ্বা, কামড়ে তুলে নিচ্ছে কপিকলের চেন মাটি থেকে বিরাট বিরাট পাহাড়। যেদিকে তাকানো যায় সেই-দিকেই বিপদ ভয় মার! যে কোন মুহূর্তে যে কোন মানুষের হাতকাটা যেতে পারে, পা কাটা যেতে পারে, বুক থেঁতো হয়ে যেতে পারে, মাথা গুঁড়িয়ে যেতে পারে। এখানে সব সময় ভয়ে-ভয়ে থাকতে হয়। বিপদকে ছুর্ঘটনাকে ভুলে থাকবার উপায় নেই। কোথাও একটু অলক্ষণ ছুর্লক্ষণ দেখলেই কুঁকড়ে ওঠে মন। কোথা দিয়ে কি ঘটে যাবে এই অজানা আশঙ্কাতেই ছুরুছুরু করতে থাকে বুক।

কোম্পানী অবশ্য রক্ষা ব্যবস্থা করেন। যন্ত্রের মধ্যে পড়ে অথবা বিজলির ঝটকা খেয়ে যাতে মানুষ জখম হতে না পারে, প্রাণ হারাতে না পারে তার জন্যে অবশ্যই নানারকম নিয়ম-কানুন অবস্থা-ব্যবস্থা আছে কারখানায়। ফ্যাক্টরী ইনস্পেক্টার এসে দেখে যান মাঝে মাঝে এই সব ছুর্ঘটনা-নিবারণী প্রণালীগুলি ঠিকমত চালু

রাখা হয়েছে কি না। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও মজুরদের মনে সাহস বাড়ে না। তারা ভয়ে ভয়েই থাকে। তারা বলাবলি করে মজুরদের প্রাণ, গরীবের জান, কে করে তার জন্যে তোয়াক্কা? এই যে বেল্টিং-এর গার্ড খুলে পড়েছিল বলে লোকনাথ মারা গেল, কে দেখতে গিয়েছিল সেটা? কোথায় ছিল তখন ফ্যাক্টরী ইনস্পেক্টার? তারা বলাবলি করে, গরীব মজুরকে দেখবার কেউ নেই। তাদের প্রাণের দামই বা কতটুকু? তাই দুর্ঘটনা যদি ঘটেও যায়, সে ক্ষেত্রে যত কম ক্ষতিপূরণ দিলে চলে, কোম্পানী নিশ্চয় সেই চেষ্টাই করবে। ক্ষতিপূরণ একেবারে না দিলেও যদি চলে সে চেষ্টাই বা করতে বাধা কি? ক্ষতিপূরণের যে সব বিধি আইন আছে সেই সব আইনের বলে ক্ষতিপূরণ আদায় করা কি গরীব নিরক্ষর মজুরের কর্ম? এরা জানে কোম্পানী বলবান, মজুর অসহায়। কোম্পানী যদি দয়া করে তবেই মজুর বাঁচলো। নইলে আর কে তাদের বাঁচাবে? যেমন বিসন্তরের ব্যাপারটা। আইন বিধি সবই অচল হয়ে যেত যদি কোম্পানী কিছু না করত বিসন্তরের জন্যে। এ তো চোখের সামনে দেখা এই সেদিন।

সবে ছুটি হয়েছে। বিসন্তর বাসায় ফিরছিল। বাসায় ফেরবার তাড়া ছিল একটু। দেশ থেকে কয়েকজন দেশোয়ালী ভাই এসে পৌঁচেছে। তারই বাসায় আছে তারা। সকালে কারখানায় বেরবার আগে বউকে বলে এসেছিল তাদের খাইয়ে-দাইয়ে বসিয়ে রাখতে; সে ছুটির পর এসে তাদের নিয়ে যাবে। পাশের ঢালাই কারখানায় কুলির দরকার। বিসন্তর ঢালাই কারখানার বড়বাবুর সঙ্গে ব্যবস্থা করে এসেছে, সে কুলি দেবে, বড়বাবুকেও দেবে কিছু। বিসন্তরের এটা উপরি ব্যবসা। আশপাশের নানা কারখানার বড়বাবু [illegible] সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো। তার হাত দিয়ে কুলি নিলে বাবুদেরও কিছু হয় আর যারা কাজে ঢোকে তারাও বিসন্তরকে কিছু দেয়। কারখানার ছুটির পরে বিসন্তরের বাড়তি রোজগার হয় কিছু।

তাই বিসন্তর শর্ট-কাট বেছে নিল একটা। কারখানার পিছন দিকে ছোট একটা দরজা আছে—মজুরদের সেদিক দিয়ে বেরবার কথা নয়। কারখানার সায়েবদের বাবুর্চি খানসামা দরোয়ানরা সেদিক দিয়ে বাজার করতে যায়, আড্ডা মারতে যায়, আর আসে সায়েবদের বন্ধু বান্ধবীরা। মোটের উপর এটা একটা প্রাইভেট দরজা। কারখানার খিড়কি দরজা বললেও চলে। বিসন্তরের সকলের সঙ্গেই যেমন ভাব দরোয়ানদের সঙ্গেও তেমনি খাতির। দরকার পড়লে বিসন্তর অনায়াসে সেদিক দিয়ে বেরতে পায়। সাহেবদের কোয়ার্টারে পৌছবার আগে কারখানার দেয়াল ঘেঁষে একটা কয়লার প্রকাণ্ড ডিপো। পাহাড়ের মত স্তূপ করা কয়লা সেখানে পড়ে থাকে। তারই পাশ দিয়ে শর্টকাট করবার রাস্তা।

সন্ধ্যার সময় ভালো করে চোখ চলে না। বিসন্তর লোকটা হয়তো খানিকটা রাতকানাও ছিল। খেল কয়লার চাংড়ায় হোঁচট। বিশ্রীরকম জখম হল পাটা। একে কয়লার কুঁচোয় পা কেটে রক্ত ঝরছে, কোথায় কুঁচো ঢুকে আছে কে জানে, তার উপর বাড়ি ফেরবার তাড়া। ঐ অবস্থায় বাড়ি পৌছেই দেশোয়ালীদের নিয়ে বেরতে হল। তারপর তাদের ব্যবস্থা করে দিয়ে অনেক রাতে যখন খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘরে ফিরল তখন তার পা ফুলে-টুলে একাকার। অযত্নে সেই পায়ের অবস্থা ক্রমেই হয়ে উঠল ভীষণ। নড়াচড়া বন্ধ। জ্বর। যেতে হল হাসপাতালে। ডাক্তার দেখে বললেন—পা কেটে বাদ দিতে হবে। কর্তৃপক্ষ যখন অ্যাম্পুটেশান হবে বলে খবর পেলেন তখন তাঁদের টনক নড়ে উঠল। পা কাটলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে মোটারকম। তাড়াতাড়ি চেষ্টা করলেন অ্যাম্পুটেশান বন্ধ করতে। কিন্তু ডাক্তার রায় দিলেন বিষের ক্রিয়া অনেক দূর গড়িয়েছে। পা না কাটলে রুগী বাঁচবে না। কর্তারা বুঝলেন মৃত্যু হলে ক্ষতিপূরণ আরো বেশী দিতে হবে। সুতরাং পা কাটাই স্থির হল।

কর্তৃপক্ষ খোঁজখবর নিয়ে বিসন্তরের পা পাকার ইতিহাস বার করে ফেললেন। এবং যখন শুনলেন কয়লার ডিপোয় হোঁচট খেয়ে পা কেটেছে, আর আরো শুনলেন যে, বিসন্তরের ঐদিকে যাবার কারণ ছিল সায়েবদের প্রাইভেট ফটক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া, তখনই বিসন্তরের নামে একটা চার্জ-শীট তৈরি হয়ে গেল এই বলে যে, সে কয়লা চুরি করে পালাচ্ছিল। সেই সময় পড়ে গিয়ে জখম হয়ে এই কাণ্ড বাধিয়েছে। চুরি যখন, তখন আর ক্ষতিপূরণের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। বিসন্তর যখন হাসপাতালে কাটা পায়ের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছে তখন তার বিরুদ্ধে চলেছে এই চক্রান্ত।

এই সময় কর্তৃপক্ষের কানে কে যেন তুললো চুরির অপরাধ প্রমাণ করা এ-ক্ষেত্রে একটু শক্ত হবে। কারণ বিসন্তর হোঁচট খেয়েছে কারখানার গণ্ডির মধ্যে। কয়লার যে চেক্‌-পোস্ট আছে তা পার হয়ে সে যায় নি। সুতরাং আইনের চোখে চুরি সে করে নি।

কর্তারা শুনে একটু ভাবলেন। মনে করলেন, জিনিসটা তাহলে একটু খতিয়ে দেখা দরকার। হেড আফিস থেকে একজন সায়েবকে পাঠালেন সরেজমিনে দেখে আসতে ব্যাপারখানা কি? কোনো দিক থেকে আর কিছু করা যায় কি না। সায়েব এসে নানা খুঁটিনাটি খবর নিলেন, কয়লার ডিপো দেখলেন, তারপর হাসপাতালে গেলেন বিসন্তরকে দেখতে। সে বেচারা তখন অর্ধমৃত অবস্থায় পড়ে আছে খাটিয়ার সঙ্গে মিশে। জীবন এবং মরণের মাঝে খাচ্ছে দোলা। ফল হল অন্যরকম। রুগীকে দেখে সায়েবের চোখ খুলল, দয়া হল। তিনি স্থির করলেন এর উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাওয়াই উচিত। কাগজে-কলমে একটা 'কেস্‌' দেখা আর মানুষটাকে নিজের চোখে দেখায় যা তফাত এ-ক্ষেত্রে তাই হল। বিসন্তর ক্ষতিপূরণ পেলে। বিসন্তরের দোস্তেরা বললে—ভাগ্যি সায়েব এসেছিল, নিজের চোখে দেখে গেল, তাই তো হল এমনটা!

কিন্তু মজুরের দুঃখ চোখে দেখবার সুযোগ কর্তৃপক্ষ কতই বা পান? কত মজুরই তো আছে। বলতে গেলে সবাই তারা দুঃখী—কেউ কম, কেউ বেশী। এদের গুনেও শেষ করা যায় না তো দেখা! সায়েবদের অত সময়ই বা কই? বিসন্তর ক্ষতিপূরণ পেয়ে গেল তার কপালে ছিল বলে। পা-টা কাটা গেলেও তার কপালটাকে রক্ষা করেছিলেন বিধাতা। কিন্তু ক্ষতিপূরণ নাও পেতে পারত—যেমন আরও অনেকেই পায় না এবং তাতে এক বিসন্তর ছাড়া আর কারো কিছু এসেও যেত না।

কিন্তু যা বলছিলুম। যে অ্যাকসিডেন্টটা হতে হতে বেঁচে গেল এবং সমস্ত মজুরদের মনকে বিচলিত করে গেল, তাদের জানিয়ে দিয়ে গেল কারখানার মধ্যে তাদের জীবনের মূল্য, তাদের পূর্ণাঙ্গ হয়ে বেঁচে থাকার মূল্য কতটুকু তা হচ্ছে এই।

সকলু আমাদের পুরোনো ক্রেন-ড্রাইভার। কপিকল চালাচ্ছে আজ প্রায় ত্রিশ বছর। সকলুর আগে ছিল সকলুর কাকা। সকলুর যখন বারো বৈছর বয়েস, সে বাপ-হারা হয়ে কাকার কাছে চলে আসে চটকলে। সকলুর কাকা ভেবেছিল তাকে কোনো কাজে লাগিয়ে দেবে; অন্তত কোনো সায়েবের ঘরে বয়-টয় বা অমনি কিছু। কিন্তু সকলুর কাজে মন ছিল না, তার আকর্ষণ ছিল তার কাকার কপিকলটার উপর। কাকার সঙ্গে সে সারাদিন লেপ্‌টে থাকত কপিকলের প্ল্যাটফর্ম-এ। চোখ বড় বড় করে দেখত কপিকলের আনাগোনা আর এদিক থেকে ওদিকে মাল সরানো। ছেলেবেলা থেকেই তার মন হরণ করেছিল চটকলের কপিকল। সকলু যখন শক্তসমর্থ হল, আর কাকা হল বুড়ো তখন কাকা তুলে দিল তার কপিকল তার ভাইপোর হাতে। উপযুক্ত হাতেই পড়ল। তারপর এই ত্রিশ বছর ধরে সকলু কপিকল নিয়েই আছে। পাকা হাত। কাজের মানুষ। কাজ করে আনন্দ পায়। প্রচুর যখন মাল এসে জমা হয় এক স্থানে তাদের এক-একটার ঝুঁটি ধরে তুলে হাওয়ার মধ্যে দোল দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে

গিয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় স্থানান্তরিত করতে তার ভারি ভালো লাগে। ভুলে যায় সে তখন চটকলের সামান্য চাকর। মনে করে ঐ-সব ভারি ভারি মালের একমাত্র নিয়ন্তা, একমাত্র মালিক সে-ই। তার নিজের ঘরে নিজেরই মালপত্র গুছিয়ে-গাছিয়ে রাখছে যেন। এ যেন তার নিজস্ব কাজ। কারখানার জমিতে থাকে থাকে মাল সাজিয়ে রেখে সে গর্বিত বোধ করে। প্রকাণ্ড কপিকলটার পিছনে পিঠ-টান করে সে দাঁড়ায়। তারই মুঠোর চাপে অতবড় শক্তিমান যন্ত্রটা করে নড়া-চড়া। কামড়ে তোলে বিরাট বিরাট ভারি ভারি পাটের গাঁট, বস্তার গাঁট। সকলুর বুক ফুলে ওঠে। উঁচু প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে তার ভাবতে ভাল লাগে যে সে কারখানার অন্যান্য মজুরদের চেয়ে অনেক উর্ধ্বে, সে অনেক বেশী ক্ষমতার অধিকারী।

এই সকলু সেদিন সকালে যখন তার কপিকল দিয়ে মাল ওঠাচ্ছিল, হঠাৎ কেমন করে কপিকল ফস্কে একখানা ভারি মাল নীচে পড়ে যায়! এক বিষম শব্দ। থরথর করে কেঁপে উঠেছিল মাটি। সকলে চমকে উঠেছিল। তাঁতীরা তাঁত ফেলে, স্পিনাররা স্পিনিং ফ্রেম ছেড়ে ছুটে এসেছিল। আর সকলু? সকলু মুখ কালো করে, ঘাড় হেঁট করে নেমে এসেছিল তার প্রিয় কপিকলের প্ল্যাটফরম্ থেকে। সকলুর ভাগ্য যে কোনো মানুষ চাপা পড়ে নি বা জখম হয় নি। একদল কুলি দাঁড়িয়ে ছিল কাছেই। মালটা যেভাবে পড়ে ছিটকে গিয়েছিল, ঐ কুলির ঝাঁকের দিকে ছিট্‌কোলে আর দেখতে হত না।

ঘটনাটা এইখানেই শেষ হল না। ক্রেন ছিঁড়ে মাল পড়ে যাওয়া তো সহজ কথা নয়। বড়বাবুরা এলেন, সায়েব-সুবোরা এলেন। কোমরে হাত দিয়ে ঘাড় উঁচু করে কপিকলের দিকে তাকিয়ে রইলেন, গড়িয়ে পড়া ভারি গাঁটগুলোর চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখলেন, একে জিজ্ঞেস করলেন, ওকে জিজ্ঞেস করলেন, কপিকলের চাকার

কাছ থেকে ছিটকে যাওয়া গাঁটগুলোর দূরত্ব ফিতের সাহায্যে মাপলেন : তারপর একখানা রিপোর্ট লিখে পাঠিয়ে দিলেন মিল-ম্যানেজারের কাছে। সেই সঙ্গে গেল সকলুর নামে একখানা চার্জ-শীট। তাতে বলা হল সকলু তার কর্তব্যে অবহেলা করেছে।

কারখানার এই নিয়ম। কারখানার চোখে আপনা-আপনি কখনো অ্যাকসিডেন্ট ঘটে না। সব সময় একজন কেউ দোষী থাকে। সঙ্গে সঙ্গে দোষী খুঁজে পাওয়া না গেলে কোনো না কোনো মজুরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেওয়া হয় তা-সে প্রত্যক্ষভাবে ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকুক আর না-ই থাকুক। এ ক্ষেত্রে অবশ্য দুর্ঘটনার সঙ্গে অতি প্রত্যক্ষভাবে সকলু-ই জড়িত ছিল।

সকলুকে জিজ্ঞেস করা হল, কেমন করে দুর্ঘটনাটা ঘটল, এ বিষয়ে তার কি বলবার আছে ?

সকলু বললে—তার কিচ্ছু বলবার নেই। কি করে যে এটা হল তার কিছুই সে জানে না। সকলুর উপরেই কপিকলের সমস্ত ভার, সে কিছু জানে না, এ কখনও একটা উত্তর হতে পারে ? তাঁরা আলোচনা করতে লাগলেন, এই ঘটনা ঘটানোর জন্যে সকলুকে কী ধরনের শাস্তি দেওয়া সমীচীন। কেউ কেউ বললেন—কাজে এত বড় অবহেলা, এর জন্যে ওর বরখাস্তই হওয়া উচিত। অন্য যে কোনো কারখানায় হলে তা-ই হত।

কেউ কেউ বললেন—বরখাস্ত করাটা একটু বাড়াবাড়ি হবে। এতদিনের চাকরি লোকটার। বরং ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হোক।

এতেও মিলের কর্তারা একমত হতে পারলেন না। তখন ঠিক করলেন হেড আপিস থেকে কাউকে ডেকে পাঠানো হোক—তিনি এসে যা-হয় ঠিক করে দিয়ে যাবেন।

যথারীতি হেড-আপিসের সায়েব এলেন। তিনি ব্যাপারটা শুনেই মত প্রকাশ করলেন—এ তো বোঝাই যাচ্ছে যে লোকটা

দুর্ঘটনা-প্রবণ লোক। এর হাতে কপিকল থাকলে আবার দুর্ঘটনা ঘটাবে। বরখাস্ত হোক বা না-হোক, কপিকলের কাছেই ওকে ঘেঁষতে দেওয়া উচিত নয়।

মিল ম্যানেজার দুর্ঘটনা-প্রবণতার কথা শুনে ঘাড় নেড়ে বললেন—এটা যেন কেমন শোনাচ্ছে? বরং লেবার অফিসারকে ডেকে জিজ্ঞেস করা হোক লোকটার এই গুণ বা অপগুণ সম্বন্ধে কিছু জানা আছে কি না।

দাস সায়েব এসে বললেন—সকলু আজ ত্রিশ বছর কাজ করছে, মাল ফস্কে তার হাত থেকে কোন দিন পড়েনি। এই প্রথম। বরং কপিকলটা ভালো করে পরীক্ষা করা হোক।

সকলু মন-মরা হয়ে বসেছিল এ কয়দিন। যখন শুনলে কপিকল পরীক্ষা করার কথা উঠেছে সে ফোঁস করে উঠলো। বলল—কপি-কলের কোনো দোষ পাবে না। আমি কি ওকে পরীক্ষা না করে চালাই? ওর প্রতিটি নাট্ বল্টুর খবর আমি রাখি। ও ঠিক আছে, ওর কিছু হয় নি।

কপিকলটাকে সকলু ভালোবাসতো। একখানা পোষা ঘোড়ার মত ভালবাসতো। যত্ন করত। সকলুকে অনেকে দেখেছে কপিকলের পিঠ থাবড়ে আদর করতে।

লোকে সকলুকে ধমক দিয়ে বলল—কলের দোষ হয়নি তো কল বিগড়লো কি করে?

সে উদাস হয়ে জবাব দিলে—সেই কথাই তো বুঝতে পারছি না।

যাই হোক পরীক্ষা-টরীক্ষা করে কপিকলের কোন দোষ পাওয়া গেল না।

অগত্যা সকলে মিলে ঠিক করলেন—অ্যাকসিডেণ্ট ইজ্ অ্যাকসিডেণ্ট। সকলু পুরোনো লোক—এবারের মত ছেড়ে দেওয়া হোক।

দাস সায়েব ফিরে গিয়ে সকলুকে বললেন—সকলু, এবারকার মত তোমার চাকরি বাঁচল। ওয়ার্নিংও মাপ হয়ে গেছে। যাও কাল থেকে কাজে লাগো গে।

সকলু এ-কদিন যে একটা ঘুমের ঘোরে ছিল। হঠাৎ ঝট্‌কা মেরে জেগে উঠল। সকলু, ত্রিশ বছরের ক্রেন ড্রাইভার সকলু ঘুরে দাঁড়িয়ে উত্তর দিলে—নেহি করেঙ্গে।

—সে কি সকলু? নেহি করেঙ্গে কি?

—ও কল আমার সঙ্গে বেইমানি করেছে হুজুর। ওর কোথাও কোনো দোষ ধরে নি, তবু আমার সঙ্গে বেইমানি করল। আজ এই তিরিশ বছর পরে। তিরিশ বছর ওর সঙ্গে আমি এক হয়ে কাজ করেছি হুজুর।

সকলুর চোখ ছল্‌ছল্‌ করে এল।

তারপর দিন সত্যিই সকলু কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে গেল।

সকলু আর তার কপিকল। একজন মানুষ আর একটা যন্ত্র। এই ত্রিশ বছর ধরে ঐ অদ্ভুত মানুষটা তার যন্ত্রকে যন্ত্র বলেই দেখেনি। দেখেছে তার এক বিশ্বস্ত বন্ধু, তার পোষা ঘোড়া বলে, যে তার সঙ্গে অবশেষে একদিন বিশ্বাসঘাতকতা করল—ভেঙে দিল তার মন।

মানুষ যে যন্ত্রকেও ভালবাসতে পারে, প্রাণহীন চলন্ত কলকে প্রাণবন্ত জীবের মত আপন করে নিতে পারে এর কিছু কি উদাহরণ আমাদের কারখানার মধ্যেই আমার আগেও চোখে পড়েছে কিন্তু সকলুর মতো কলকে এমন আত্মহারা হয়ে ভালবাসা, কলের উপর এমন দুর্জয় অভিমান, কলের বিচ্যুতিতে এমন চরম হতাশা আর আত্মগ্লানি দেখিওনি, দেখব বলে মনেও হয় না।

বাইশ

যেদিন হঠাৎ আমাদের মিলের ফটক দিয়ে লরি ঢুকতে লাগল মস্ত মস্ত কাঠের ক্রেট বোঝাই হয়ে সেদিন আমরা আবার অনেকদিন পরে সচকিত হয়ে উঠলুম। মনে হল, এইবার সুরু হল এক-শ' কোটি টাকার আধুনিককরণ। কিছুদিন থেকেই শোনা যাচ্ছিল যে বিলেত থেকে নতুন তাঁত এসে পৌঁচেছে খিদিরপুরের ঘাটে। শুনলুম সেইগুলিই ক্রেট্ সুদ্ধ আমাদের মিলে ঢুকছে। আবদুল তৈরী হয়ে ছিল। কত তাঁত এসে পোঁচেছে এবং কত তাঁত আসছে তার একটা হিসেব খাড়া করে নিয়ে গেল লেবার কমিশনারের আফিসে। এর ফলে আনুমানিক কত হাজার মজুর ছাঁটাই হতে বাধ্য সেটাও জলের মত বুঝিয়ে দিল লেবার কমিশনারকে। লেবার কমিশনারের কাছে আরও দরবার আসছিল অন্যান্য চটকলের মজুরদের কাছ থেকে। শোনা গেল তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে চটকলের কর্তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে শুরু করেছেন। কাপুর সায়েব গিয়েছিলেন আমাদের মিল থেকে লেবার কমিশনারের দপ্তরে। তিনি আশ্বাস দিয়ে এলেন যে ছাঁটাই করে শ্রমিক সমাজের শান্তিভঙ্গ করবে এত বড় বোকা তাঁর কোম্পানী নয়। লেবার কমিশনার নিরুদ্বিগ্ন হলেন।

নতুন যন্ত্র মিলের মধ্যে এসে পোঁছতেই মিল্-এর ফটক বহির্জগতের কাছ থেকে বন্ধ হয়ে গেল। আগে মাঝে মাঝে সরকারের, কর্পোরেশানের কিংবা কোনো প্রতিষ্ঠানের অতিথি হিসেবে দেশী-বিদেশী কেউ কেউ আমাদের মিল দর্শন করতে আসতেন—তাঁদের

আসা বন্ধ হল। বিনা-নিমন্ত্রণে মিলের মধ্যে ঢুকে পড়তেন রাজনৈতিক দলের লোক, ফুটবল ক্লাব, থিয়েট্রিকাল ক্লাব বা অন্য কোনো ক্লাবের লোক। কর্মীদের সঙ্গে কাজে অকাজে দেখা করতে আসতেন অনেকে—এদের সকলেরই আসা বন্ধ হল। শুধু টিকিট-ওয়ালা কলের পাকা শ্রমিক ছাড়া কেউই আর ভিতরে ঢুকতে পেল না। যে-যে অংশে নতুন যন্ত্র বসানো হচ্ছে সেই সব অংশে যে শ্রমিকেরা কাজ করত তাদেরও সাময়িকভাবে ছুটি দিয়ে আসা বন্ধ করে দেওয়া হল। এইভাবে চললো কিছুদিন। যতদিন না নতুন কল বসে শুধু ততদিনই। একমাত্র খোলা রইল মিলের লেবার দপ্তর। সেইখানে ঘন ঘন লোকজনের আনাগোনা চলতে লাগল। কী যে এত কাজ সেখানে চলেছে তার খবর বিশেষ বাইরে এসে পৌঁছল না। তারপর যখন নতুন যন্ত্র বসানো মিলের শেড্‌গুলি আবার খোলা হল, দেখা গেল, এরই মধ্যে অনেক কিছু ঘটে গেছে।

প্রথমত দেখা গেল যে, যে যন্ত্রগুলি কারখানার মেঝেয় নিজে-দের স্থান করে নিয়েছে সেগুলি মোটেই তাঁত-যন্ত্র নয়। সেগুলি বেশীর ভাগই স্পিনিংএর আধুনিক যন্ত্রাদি যাতে করে দ্রুত স্পিনিং হয়। সবাই বেশ খানিকটা অবাক হয়ে গেল। তাঁত আসবার কথা, এল স্পিনিং কল। আবদুল সাধারণতঃ পাকা খবর রাখত, এবার দেখা গেল সে-ও ঠকেছে। দ্বিতীয়ত দেখা গেল অনেক শ্রমিক ইতিমধ্যেই কাজে ইস্তফা দিয়ে দেশে চলে গেছে। লেবার দপ্তরে এই জন্যেই নাকি এতদিন ভীড় লাগত। শোনা গেল কোম্পানি এদের কাউকে নিজে থেকে ছাঁটাই করেন নি। এরা সবাই নিজের ইচ্ছায় কাজ ছেড়ে দিয়ে বেনিফিট নিয়ে দেশে চলে গেছে। তৃতীয়ত শোনা গেল, আরো অনেক মজুর নাকি কাজ ছেড়ে চলে যাবে।

নিজের ইচ্ছেয় শ্রমিক যদি কাজ ছেড়ে চলে যায় কারুর কিছু

বলবার নেই। তবু আবদুল, ফগুয়া আর ওদের দলের অনেকেই ব্যস্ত হয়ে উঠল। তারা মজুরদের ঘরে ঘরে ঘুরে তদ্বির করে আসতে লাগল। বোঝাবার চেষ্টা করল, বেনিফিটের লোভে কাজে ইস্তফা দিলে শেষ অবধি তাদেরই লোকসান। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বোঝা গেল, বেনিফিট পকেটে পুরে দেশে যাওয়ার যে হিড়িকটা এসেছে সেটা সহজে শান্ত হবে না। দেখতে দেখতে তাঁতীদের সংখ্যা গেল কমে। মনে হল কোম্পানী যেন এইটাই চাইছিলেন। কারণ তাঁরা তাঁতীদের ফিরিয়ে আনার দিকে না এগিয়ে যারা রয়ে গেল সেই সব তাঁতীদের প্রলুব্ধ করতে লাগলেন দু-হাতে দুটো করে তাঁত চালাবার জন্যে। বলা হল ডাণ্ডিতেও মেয়েরা তাঁতের কাজ করে। একটি মেয়ে চারটে তাঁত সামলায়। তাদের রোজগারও সেই কারণে ক···ত বেশী। তাঁতীরা যখন শুনলে তারাও দেড়া রেট পাবে তখন কাঁচা টাকার লোভে অনেকেই রাজী হয়ে গেল এই প্রস্তাবে।

দেখতে দেখতে চট কলের চেহারা গেল বদলে। বাইরে থেকে সেই আগের মতো কালিঝুলি মাখা দেখালেও ভিতরটা বেশ ঝকঝকে হয়ে উঠল। নতুন নতুন দেশী সুপারভাইজাররা পাট-ভাঙা পাৎলুন পরে টহল দিয়ে বেড়াতে থাকলেন। ফটক খুলে দেওয়া হল আবার। নতুন অতিথিরা নতুন যুগের নতুন চটকল দেখতে আসতে থাকলেন। লোকে বলাবলি করতে থাকল যে বহু বছরের গ্লানি মুছে ফেলে বহুদিনের জড়তা কাটিয়ে ভারতের চটশিল্প এবার নিজ-গরিমায় জগতের দরবারে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। শোনা গেল, এইবার শ্রমিকদের অবস্থা এমনই ভাল হবে যে চটশিল্পের ইতিহাসে এমন কখনও হয়নি।

কিছুদিন সবাই আশ্চর্য হয়ে ভাবল এই কথা যে, চটশিল্প আধুনিককরণের যে ধুয়োটা উঠেছিল সেটা কি শুধু এই স্পিনিং ফ্রেম বদলানোর ব্যাপার? তা যদি হয়; তাহলে ভারতের চট সংস্থা

ভারত সরকারের কাছে পঞ্চাশ কোটি টাকা ধার চেয়েছিল কেন? এখন পর্যন্ত যেটুকু আধুনিককরণ হয়েছে তার খরচ পাঁচ সাত কোটি টাকার বেশী নয়। তারপর বেশ স্পষ্টই বোঝা গেল যে এক শ কোটি টাকার আধুনিককরণ এখনকার মত রইল স্থগিত। কবে কত বছর পরে যে তা হবে তা-ও রইল অনিশ্চিত। শুধু এইটেই নিশ্চিত জানা গেল যে, যে কোন প্রকারেই হোক এইবার চলবে গঙ্গাতীরের চল্লিশ মাইল ব্যাপী চটকলের জগতে অবারিত মজুর ছাঁটাই। চট সংস্থা এবার একটু সুর বদলে বলতে সুরু করলেন যে, চট-শিল্পকে আধুনিকতার ভিত্তিতে দাঁড় করাতে গেলে প্রথমেই দরকার 'র‍্যাশানালাইজেশান' অর্থাৎ কিনা অপচয় বন্ধ করা। শব্দটা যাই হোক, মজুরদের কাছে তার মানে দাঁড়াল ছাঁটাই। মজুররা গিয়ে ধর্ণা দিল সরকারের কাছে। তারা বললে—আমাদের বাঁচান। সরকার বললেন—দেখ ভাই, চটশিল্প আছে বলে আমরা বিদেশ থেকে কোটি কোটি টাকা আমদানি করতে পারি। আজ সেই চটশিল্প বিদেশের বাজারে এক সঙ্কটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার প্রতিদ্বন্দ্বী অনেক। প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাক্রমও প্রচুর। কাজেই আজকের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের চটশিল্পকে আধুনিকতম হয়ে দাঁড়াতে হবে। তার জন্যে প্রথমেই দরকার র‍্যাশানালাইজেশান। বুঝলে ভাই, র‍্যাশানালাইজেশান। ছাঁটাই শব্দটা কেউ মুখে উচ্চারণও করল না। সরকারও বললেন—র‍্যাশানালাইজেশান। চটশিল্প সংস্থাও বলল—র‍্যাশানালাইজেশান।

বছর খানেক কেটে গেছে। একদিন ছুটির পর বাড়ি ফিরছি। কুলি লাইনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, দেখি এক জায়গায় মস্ত একটা ঝগড়া চলেছে। বহু লোকের ভিড়। কুলি বস্তিতে তো এমন কতই হয়, এই ভেবে পাশ কাটিয়ে চলে যাবো, হঠাৎ চোখে পড়ল ঝগড়ার প্রধান নায়ক আমাদের ফগুয়া। আর অপর দিকে দাঁড়িয়ে

কোমরে হাত দিয়ে চীৎকার করে চলেছে ফগুয়ার রমনী গোদাবরী। ভিড় ঠেলে একটু কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখি দুই কলহমান মূর্তির মাঝখানে শায়িত অস্থিচর্মসার একটি মনুষ্যদেহ।

চিনলুম বুধমাল তাঁতীকে। শুনেছিলুম বুধমালের টি -বি হয়েছে। কারখানার ডাক্তার চেষ্টা করেছিলেন ওকে কোনো হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিতে, কিন্তু সেদিক দিয়ে এখনও তিনি সফল হন নি। আমাকে দেখে বোধ হয় ফগুয়ার বীরত্ব চাগিয়ে উঠল। দেখলুম বুধমালকে এক-বগলে তুলে নিয়ে গোদাবরীকে ঝট্‌কা মেরে হটিয়ে দিয়ে ঢুকে গেল ঘরে। তারপর বুধমালকে সেখানে রেখে আবার বেরিয়ে এল লোকচক্ষুর সামনে। গোদাবরী আর কিছু বললে না। তাইতেই ভীড় পাত্‌লা হয়ে গেল দেখতে দেখতে।

ফগুয়া এগিয়ে এসে বললে—দেখলেন তো হুজুর বুধমালের অবস্থা?

আমি বললুম—ফগুয়া, তুইও সমারুর মত আরম্ভ করলি দেখছি। রুগী কুড়িয়ে ঘরে ঢোকাচ্ছিস্? তা-ও যে-সে রুগী নয়, টি বি রুগী!

—হুজুর ওকে আমরা অনেক বার বারণ করেছি। আবদুল আর আমি বুঝিয়ে বুঝিয়ে হদ্দ হয়ে গেছি। বলেছি, এমন করিস্ না। এরা মানুষ-মারা ফাঁদ পেতেছে—ওতে পা দিস্‌নি। কিন্তু ওকি শুনল আমাদের কথা? দেখি এখন কি করতে পারি!

যে লোভে বুধমালকে মেরেছে তার কথা জানতুম। শুধু তো বুধমাল নয়, এমন বহু তাঁতী আছে যারা বুধমালের মতো পাতালের পথে পা বাড়িয়েছে—কি হবে তাদের কে জানে?

নতুন যন্ত্র বসানো হতেই বুধমালের ডাক পড়েছিল একদিন কাপুর সায়েবের আফিসে।

—নতুন স্পিনিং ফ্রেম বসেছে দেখেছিস্ বুধমাল?

—দেখেছি হুজুর।

—কেমন দেখলি?

—ভাল যন্ত্র হুজুর। আমাদের রোজকার কিছু বাড়বে তো?

—সেইজন্যেই তো তোকে ডাকা। কত কামাচ্ছিলিরে?

—তা হপ্তায় আঠারো টাকা হচ্ছিল।

—বেশ। তোর হপ্তা সাতাশ টাকায় উঠবে, রাজী আছিস্?

এমন প্রস্তাবে কে-ই বা রাজী না হয়? জোলার ছেলে বুধমাল কিন্তু কেমন একটু সন্দেহের চোখে কাপুর সায়েবের দিকে তাকাতে লাগল।

—শোন্ বলি তবে। একলা তুই দুটো তাঁত চালাতে পারবি? তাহলে সাতাশ টাকার মতো তোর আয় দাঁড়াতে পারে।

বুধমাল চোখ বড় বড় করে বললে—আজ্ঞে দুটো তাঁত একজন মানুষে কখনও চালানো যায়? নিঃশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ পাবো না।

—কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। এতদিন তো তোরা সব গায়ে ফুঁ মেরে বেড়িয়েছিস। কোম্পানীর নুন খেয়েছিস এতদিন এবার কোম্পানীর হয়ে একটু খাট। হাত লাগা একবার তারপর দেখবি দুটো কেন, তিনটে তাঁত চলবে এক হাতে।

বুধমাল তবু গাঁই গুঁই করে। আবদুল এবং আবদুলের লোকেরা তাঁতীদের আগে থেকেই সাবধান করে দিয়েছিল যে এবার দু-তাঁতের দিন আসছে। এর মধ্যে প্যাঁচ আছে অনেক। দু-তাঁতের রেট সম্বন্ধে সবাই যেন হুঁসিয়ার থাকে। কোম্পানী যদি দ্বিগুণ রেট না দেয় তাহলে কেউ যেন ডবল-তাঁতে রাজী না হয়। বুধমাল বললে —রেট হুজুর কম হচ্ছে।

—কম হচ্ছে মানে? এ হল বিলিতি রেট—ডাণ্ডি থেকে রেট এসেছে। কষে পাঠিয়ে দিয়েছে ওখানকার ওস্তাদরা। এর কখনও ভুল হয়? দেখ বুধমাল, কাল তোর হপ্তার দিন। কত পাবি এ হপ্তায়?

—তা হুজুর যা কাপড় বুনেছি তাতে আমার হিসেবে আঠারো টাকা সাত আনা হবে।

—বেশ তবে এ হপ্তায়ও তোর রেট দেড়া করে দিলুম। তুই সাতাশ টাকা সাড়ে দশ আনা পাবি এ হপ্তায়। দু-তাঁতে রাজি হয়ে যা—সামনের হপ্তা থেকে তোর বাঁধা হয়ে গেল সাতাশ টাকা। বেশী কাপড় বুনতে পারিস তো আরো বেশী কামাবি।

টাকার লোভ বড় লোভ। বুধমাল রাজী হয়ে চলে এল। কাপুর সায়েব প্রথম এবং প্রধান বেড়া টপকালেন। তিনি জানতেন বুধমালকে রাজী করাতে পারলেই অন্যান্য তাঁতীরাও রাজী হয়ে যাবে একে একে। হলও তাই। দেখতে দেখতে বাছা বাছা অনেক তাঁতী এসে দু-তাঁত চালাবার কাজ নিলে। এটা হয়ে যেতেই এল কাপুর সায়েবের মারফৎ কোম্পানীর দ্বিতীয় চাল। আমাদের মিলে দু শিফ্‌ট্‌ কাজের ব্যবস্থা চালু হল। সকালে এক শিফ্‌ট্‌, বিকেলে এক শিফ্‌ট্‌।

ডবল তাঁতে হাত দিয়েই তাঁতীরা দেখল, একটা অসম্ভব রকমের পরিশ্রম না করলে দুটো তাঁতকে চালু রাখা কঠিন। যন্ত্রের যত উন্নতি হবে, যন্ত্র যত আধুনিক হবে, যন্ত্র পিছু মানুষও লাগবে তত কম। স্পিনিং বিভাগে সেটা হয়েছে। স্পিনার ছাঁটাই হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সুতো উৎপাদন কমে নি। তাঁত বিভাগে নতুন বা উন্নত কোনো তাঁত আসে নি যাতে করে একজন মানুষ একাধিক তাঁত অনায়াসে চালাতে পারে। তবু সেই পুরোনো দিনের তাঁতগুলিকেই অর্দ্ধেক তাঁতী দিয়ে চালাবার চেষ্টা চলতে লাগল। নতুন তাঁত না কেনায় চটশিল্পের ত্রিশ চল্লিশ কোটি টাকা বেঁচে গেল, এদিকে তাঁতীকুলকে র‍্যাশানালাইজেশানের নামে শোষন করায় কোম্পানীদের পকেটও হতে থাকল স্ফীত।

বুধমালের উপর অমানুষিক খাটুনি এসে পড়ল। এমনিতেই শরীর খুব ভালো নয়, তার উপর এই পরিশ্রমে স্বাস্থ্য তার ভেঙে পড়বার মত হল। দুটো শিফ্‌ট থাকায় অনেক তাঁতী নিজেদের মধ্যে একটা নতুন রকমের ব্যবস্থা করে নিলে। করে নিলে মানে করে

নিতে বাধ্য হল। বুদ্ধিমান সমালোচকেরা বললেন—এ ব্যবস্থা যাতে তাঁতীরা করে নিতে পারে সেই জন্যেই আসলে দু-সিফ্‌ট্‌-এর পত্তন। তাঁতীরা করল কি, তারা দ্বিতীয় শিফ্‌ট্‌এর এক-একজন তাঁতীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করে রাখলে যে সেই তাঁতীরা যেন তাদের শিফ্‌ট্‌ আরম্ভ হবার আগেই কারখানায় চলে আসে। এসে তার সঙ্গীকে সাহায্য করতে থাকে। আট ঘণ্টা করে এক-একটা শিফ্‌ট্‌। সঙ্গীরা চার ঘণ্টা আগে চলে আসতে লাগল। এইভাবে দুটো তাঁতের কাজ দু-জনে মিলে ভাগাভাগি করে চালাতে থাকল। আবার সঙ্গীর শিফ্‌ট্‌-এর অর্দ্ধেকটা প্রথম সঙ্গী থেকে যেতে লাগল তাকে সাহায্য করবার জন্যে। ফলে দাঁড়াল অনেক তাঁতীই খাতায় আট ঘণ্টা করে কাজ দেখালেও ফলতঃ বারো ঘণ্টা করে কাজ করতে থাকল। তার মানে তাদের রোজগার দেড়গুণ হল বটে কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের খাটুনিও বাড়ল দেড়গুণ এবং বাড়ল বিরামহীন পরিশ্রম আগের থেকেও অনেক বেশী।

বুধমাল যে কোনো কারণেই হোক এই ব্যবস্থায় রাজী হয়নি। অনেকে সঙ্গী হয়ে সাহায্য করতে চেয়েছিল বুধমালকে কিন্তু সে কাউকে সঙ্গী করেনি। সে বলত—বেআইনী কাজ করব না। বেআইনী কাজে সাহায্য করব না। তার মতে, প্রথমত তার তাঁতে বাইরের লোক লাগিয়ে তার সাহায্যে কাজ ওঠানো বেআইনি। দ্বিতীয়ত মজুরকে বারো ঘণ্টা খাটানো কোম্পানীর পক্ষে বেআইনি। বন্ধুরা বুঝিয়ে বলেছিল—কোম্পানী যখন সব জেনে শুনেও চোখ বুজে আছে তখন কার কি? এত তাঁতী এইভাবে চালাচ্ছে, তুইও চালা—নইলে শরীর তোর ভেঙে পড়বে। কিন্তু বুধমাল অনড়। আধ ঘণ্টা আগে এসে কল সাফ সুৎরো করে তারপর পুরো আট ঘণ্টা দু-টো তাঁতের পিছনে প্রাণপণে লেগে থেকে শেষে আর আধঘণ্টা গোছগাছ ফিটফাট করে দিয়ে তবে সে ঘরে যেত। এই ন-ঘণ্টার অত্যধিক খাটুনি তার শরীরে আর সয়নি। একদিন শেড্‌-এর

মধ্যেই শুয়ে পড়েছিল। তুলে এনে তাকে নিয়ে গিয়েছিল বস্তীতে অন্যান্য মজুররা। তারপর দিন থেকে সে আর কলে যেতে পারেনি। ডাক্তার বলেছেন—অন্ততঃ ছ-মাস তাকে বিশ্রাম নিতে।

ফগুয়ার ঘরে যেদিন বুধমাল ঢুকল তার পরদিন গোদাবরী এসে আমার আর সুজিতের সঙ্গে দেখা করল। ঘরের এক কোনে দাঁড়িয়ে আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বললে—আপনারা হুজুর ফগুয়াকে একটু বুঝিয়ে বলুন।

আমরা তাকে বললুম যে আমরা চেষ্টা করছি বুধমালকে যাতে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। খুব সম্ভব আজই একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

গোদাবরী বললে—তবু হুজুর ফগুয়াকে একটু বোঝান আপনারা। আপনাদের কথা ও শোনে। আপনারা ছাড়া কেউ ওকে বোঝাতে পারবে না।

—কি বোঝাবো রে ?

—সমারুও রুগী এনেছিল ঐ রকম করে।

হঠাৎ তখন আমাদের দুজনেরই কাছে পরিস্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা। টি বি রুগীর ছোঁয়াচকে গোদাবরী ভয় পায় নি। ঘরে ছেলে আছে, তারও যে ছোঁয়াচ লাগতে পারে তাতেও অত ঘাবড়ায় নি। বস্তীর মানুষ হয়তো ছোঁওয়া ছুঁয়ির ব্যাপারে অত সচেতন নয়। আসলে ও ঘাবড়েছে সমারুর মত ফগুয়ারও আর-এক রুগী আনা দেখে। ভয় সেই পুরোনো নাট্যের আবার এক নতুন অভিনয় বুঝি সুরু হল। ফগুয়া বুঝি এইবার পালালো তাকে ফেলে বস্তী ছেড়ে কোথায় কোনো অজানার সন্ধানে। ঘর-পোড়া গরু রাঙা মেঘ দেখে আঁৎকে উঠেছে।

আমরা বললুম—ওরে, ফগুয়ায় আর সমারুতে যে অনেক তফাৎ। ফগুয়া কত বড় কাজের ভার নিয়েছে জানিস্ ? ওর কি বস্তী ছেড়ে গেলে চলে ? বস্তীতে যে ওর মন ওর প্রাণ। যাই হোক

তুই যখন বলছিস্ আমরা ওকে ডেকে পাঠিয়ে ওর সঙ্গে কথা কইব।

॥ তেইশ ॥

বুধমাল হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে আর তাঁত ধরতে পারল না। তার শরীর আর বইছিল না। অবসর নিয়ে যা বেনিফিট জমেছিল তাই হাতে করে দেশে ফিরে গেল। কমলো একজন তাঁতী।

ওর আগে যে-সব মজুর স্বইচ্ছায় রিট্রেঞ্চমেণ্ট বেনিফিট নিয়ে বাড়ী ফিরে গিয়েছিল তারা চির বিদায় নিয়ে গিয়েছিল চটকলের কাছ থেকে। ভেবেছিল দেশের হাওয়ায় তারা পরম নিশ্চিন্তে থাকবে—আর কোনদিন নোংরা বস্তীতে মুখ দেখাতে হবে না। কিন্তু দেখা গেল এরা প্রায় সবাই একে একে ফিরে আসছে। যেমন মাদ্রাজী মিস্ত্রী আপান্না। আপান্না খাটতো স্পিনিং শেড্-এ, পেত হপ্তায় পনের-ষোলো টাকা। তার স্ত্রী ছিল ব্যাচিং বিভাগে, পেত বারো টাকার মতো। প্রথম চোটটা এসেছিল স্ত্রীর উপর। তার কাজ ছাড়িয়ে দেবার জন্যে নানারকম প্রচেষ্টা। বেচারার কাজের চাপ বাড়িয়ে দেওয়া হল হঠাৎ। ভয় দেখিয়ে বলা হতে লাগল, কাজের পরিমাণ কম হলেই চার্জ শীট দেওয়া হবে। তারপর তাকে লোভ দেখানো হতে থাকল, সে যদি রিট্রেঞ্চমেণ্ট বেনিফিট নিতে চায় তাহলে ছ-শো টাকা নিয়ে এখনই সে বাড়ী যেতে পারবে। আপান্নার বৌ উভয় চাপে পড়ে এবং শেষ অবধি বন্ধুদের উপদেশ অনুযায়ী ছ-শো টাকা নিয়ে বাড়ী গেল। সে সময় ঐ ধরণের উপদেশ দেবার মত কোথা থেকে যেন প্রচুর বন্ধু-ও জুটে গিয়েছিল মজুর-[illegible]। আবদুলের পরামর্শ যদি একজন

শুনত, অন্য সব 'বন্ধু'দের পরামর্শে কাঁচা টাকা হাত পেতে নেবার জন্যে এগিয়ে আসত অন্তত: দশ জন।

ছ-শো টাকা পেয়ে আপান্নার বৌ ভাবলে সে মস্ত বড়লোক হয়ে গেছে। স্বামীকে চিঠি লিখলে বাড়ী চলে আসতে। আপান্না ছুটি নিয়ে দেশে গিয়ে দু-মাস খুব ফুর্তি করলে। ছ-শো টাকা উড়িয়ে দিতে বিশেষ কষ্ট হল না। তারপর বৌ নিয়ে সে ফিরে এল চটকলে। সংসারের নানা খরচ। খরচের অভ্যাস গেছে বেড়ে। স্ত্রীর কোনো রোজগার নেই। অগত্যা ধার। সুদ গুণে খাই খরচ দিয়ে একসঙ্গে কিছুতেই আর কুলোয় না। কোথায় পাওয়া যায় টাকা? অকুলানের কুল হল ছাঁটাই বেনিফিট। বন্ধুদের উপদেশে আপান্না স্ব-ইচ্ছায় ছাঁটাইএর জন্যে দরখাস্ত করল। প্রথমে ফাঁদে পড়ল স্ত্রী। তারপর সেই ফাঁদেই পড়ল স্বামী। বেনিফিট নিয়ে দেনা শোধ করে আপান্না চলে গেল দেশে। কিন্তু কতদিন? দেশে তো রোজগার নেই, শুধু খরচ। বছর ঘুরতেই হাতের টাকা হয়ে গেল শেষ। ফিরে এল আবার সেই চটকলের বস্তীতে। এখন আর তার পারমানেণ্ট কাজ নেই। নিজের ষোলো টাকা বৌ-এর বারো টাকা রোজগার নেই। কামারহাটি অঞ্চলে গিয়ে কোনোরকমে একটা বদলি মজুরের কাজ নিয়ে দিন কাটাচ্ছে। দু-হপ্তা কাজ করে, দু-হপ্তা থাকে বসে।

এমনি আরো কত। শুধু তো উইভিং শেড্ স্পিনিং শেড্এ নয়। আধুনিককরণের নামে চোরা-ছাঁটাইএর ধাক্কা সব বিভাগেই। মাথায় করে কুলিরা পাটের গাঁট বইত। সেখানে করতে হবে আধুনিককরণ। ঠেলাগাড়ি করে পাট বইতে হবে। দুনরাজ স্যাংড়া কুলি। চিরকাল মাথায় করে পাট বয়ে এসেছে, ঠেলতে সে ভালও বাসে না, জানেও না। তবু কি করবে, কোম্পানীর হুকুম—মুখ চুণ করে ঠেলা গাড়ি করে কাঁচা পাটের গাঁট পাথর লোহা ফেলা এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা দিয়ে ঘটর ঘটর করে নিয়ে যায়। স্যাংড়াদের মধ্যে

একজনের কি দোষে দু-তিনবার চার্জশীট হল। বেচারা ভয় পেয়ে গেল। তখন তাকে বলা হল—দেখ তোমার চার্জ উঠিয়ে নেওয়া হবে তুমি যদি স্ব-ইচ্ছায় কাজ ছেড়ে চলে যেতে চাও। এই দেখ, ছাঁটাই হলেই হাতে হাতে বারো শ' টাকা পাবে। তার সঙ্গে, এই দেখ, তুমি হলে পুরোনা স্যাংড়া কুলি; তোমার প্রভিডেন্ট ফাণ্ড জমেছে আট-শো টাকা, এটাও পাবে। সে আর বিশেষ বাছ-বিচার না করে হাজার দু'য়েক টাকা নিয়ে দেশে ফিরে গেল। খবরটা রটতেই স্যাংড়া কুলিদের মধ্যে হৈ হৈ ব্যাপার। এত টাকা একসঙ্গে তাদের মধ্যে কে চোখে দেখেছে? দলে দলে স্যাংড়ারা লাইন করে দাঁড়িয়ে গেল ছাঁটাই হবার জন্যে। তার মধ্যে দুনরাজ-ও। দুনরাজ ভেবেছিল সে-ও বুঝি দু হাজার টাকা পাবে। কিন্তু সে পেল মাত্র সাত শ টাকা। বেচারা ভারি মুষড়ে পড়ল। তারপর যখন শুনল দু-হাজার টাকা পেয়েছে নামমাত্র কয়েকজন কুলি তখন আর ও নিয়ে মাথা ঘামালে না। মনের সুখে দেশে ফিরে গিয়ে দু-তিন বিঘে জমি কিনলে। কিন্তু জমি কিনলেই তো আর ফসল হয় না। জমি চষা, বীজ বোনা, গাছ বাড়া, তারপর তো ফসল। এক বছরের ধাক্কা। এতদিন সে খায় কি? কাজেই দুনরাজ তিনমাস পরেই কলকাতায় ফিরে এল। ফিরে এসে দেখে চাকরী পাওয়া আর আগের মত সহজ নেই। অনেক চেষ্টায় যদিও বা পাওয়া যায় তা হলেও আগের মাইনের অর্ধেকে। বেচারা শেষ অবধি কাশীপুরে চলে গিয়ে সেখানকার চটের প্রেস্-এ অতি কম মাইনের স্যাংড়া কুলির কাজ পেয়েছে।

এইভাবে গেছে রামলু। এইভাবে গেছে যামিনী, ডাবুবালা। গেছে গোষ্ঠ, লছমন, হানিফ, ঝন্টু। ঝন্টু তো ছাঁটাই হবার জন্যে মুকিয়ে ছিল। সবাই ছাঁটাই হয়ে টাকা বগলে পুরে চলে যাচ্ছে, সেই বা হবে না কেন? অনেক দিন ধরে তার সখ ব্যবসা করবার। ঝন্টুর ধারণা তার নাকি ব্যবসা বুদ্ধি খুব পাকা। আবদুল এসে তাকে

উপদেশ দিল, ছাঁটাই হস্‌নি। ঠকবি। কিন্তু সে কানেই তুলল না আবহুলের কথা। দরখাস্ত করল ছাঁটাই-এর। পেল বার-শো টাকা। তার থেকে ছ-শো টাকা নিয়ে বড়বাজার থেকে কাপড় কিনে এনে রাস্তায় বসে গেল বেচতে। বড়বাজারে যাওয়া আসা করবার জন্যে একটা সাইকেল কিনল ছু-শো টাকায়। মিলের সবাই চিনতো ঝণ্টুকে। সবাই এল তার কাছ থেকে কাপড় কিনতে, কিন্তু প্রায় সবাই-ই কিনল ধারে। ধারে কারবার হলে হাতের টাকা যায় ফুরিয়ে। হাতের টাকা ফুরিয়ে গেলে ব্যবসা হয় অচল। অগত্যা ঝণ্টুকে সাইকেল বেচে দিতে হল। তাতেও চলল না ব্যবসা। টাকার অভাবে কারবার গেল ডুবে। তখন আবার চাকরীর চেষ্টা। অনেক খুঁজে বদলির কাজ পেল একটা। এক হপ্তা খাটে তো ছু-হপ্তা থাকে বসে।

চটশিল্পে নিযুক্ত ছিল আড়াই লক্ষ মজুর। যুদ্ধের বাজারে কয়েক বছর তিন লক্ষের কাছাকাছি উঠেছিল। দেখতে দেখতে নেমে এল এক লক্ষ নব্বই হাজারে। ষাট হাজার কুলি স্ব-ইচ্ছায় কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। এতে কারো কিছু বলবার নেই, কারো কিছু করবার নেই। আবহুল বলে ঐ ষাট হাজারের মধ্যে বড় জোর দশ হাজার কুলি সত্যিসত্যিই নিজে থেকে কাজে ইস্তফা দিয়েছে। বাকি পঞ্চাশ হাজার অজ্ঞ মানুষকে স্রেফ দরজা দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে—ভীত তাড়িত পশুর মত তারা চটকলের ফটক ছেড়ে পালিয়েছে। আবহুলের মতো যারা, তারা শুধু নিজেদের হাত কামড়েছে আর ভেবেছে আমাদের এতগুলি ছোট ছোট দলের বদলে একখানা, শুধু একখানাই প্রকাণ্ড সংহতি নেই কেন? আবহুলের ধারণা আরো ষাট হাজার মজুর ছাঁটাই হবে। কি ভাবে তারা ছাঁটাই হবে তা এখনও জানা নেই। তারা 'স্ব-ইচ্ছায়' কাজ ছেড়ে চলে যাবে না এর জন্যে আরো নতুন কিছু উপায় উদ্ভাবিত হবে কেউ জানে না। আবহুল শুধু জানে যে এ ধাক্কা সামলাবার মতো সংগঠন নেই মজুরদের। আগের দিনে

তাঁত পিছু সাত-জন মজুর কাজ করত চটশিল্পে। এই ছিল গড়। এর মধ্যে তাঁতী এবং অন্যান্য সব রকম মজুর গুনে এই গড় দাঁড়াতো। এবার যা দাঁড়াতে চলেছে—তা হচ্ছে তাঁত পিছু আড়াই-জন মজুর। এই জন্যেই চেষ্টা চলেছে একজন তাঁতীকে দিয়ে দুটো করে তাঁত চালাবার।

আমাদের চটকলে মজুরাণী কাজ করত এক হাজার। দেখতে দেখতে কোথায় তারা উপে গেল। ছাঁটাই-এর প্রথম আক্রমণটা এসেছিল স্ত্রী-মজুরদের উপর। খুব সম্ভব ওদের কাছ থেকে বিরোধিতা কম পাওয়া যাবে এবং ওদের সহজে ভয় পাইয়ে দিতে পারা যাবে এটা জানা ছিল বলে। তা ছাড়া আরও একটা মস্ত কারণ ছিল। আধুনিককরণ এবং র‍্যাশানালাইজেশানের হুজুগে যখন চটকল পাই পয়সার হিসেব স্নুরু করলে, তারা দেখলে যে গড়ে পুরুষ মজুরের চেয়ে স্ত্রী মজুরের পিছনে তাদের খরচ বেশী হচ্ছে। মেয়েদের মাইনে পুরুষদের চেয়ে হয়তো সামান্য কিছু কম কিন্তু মেয়েদের আছে মেটারনিটি বেনিফিট। আট হপ্তায় সেটা দাঁড়ায় একশো ত্রিশ টাকা। এ ছাড়া যে-সব মিল মজুরানীদের কচি বাচ্চাদের দেখাশোনা করবার জন্যে সভ্যদেশের অনুকরণে 'ক্রেশ্' করে দিয়েছেন তাঁদের প্রতি ক্রেশ-এর পিছনে মূলধন লেগেছে নব্বই হাজার টাকা। তার উপর যে মেম সাহেব দেখাশুনা করেন তাঁর মাইনে ও অন্যান্য মাসিক খরচ আছে। আজকাল আবার আইন হয়েছে কোনো কারখানায় পঞ্চাশ জন মজুরানী থাকলেই সেখানে ক্রেশ্ রাখতে হবে। এই সব কারণে অনেক মেয়ে-মজুর রাখা মানেই মিলের খরচ-বৃদ্ধি। এখন কমাও খরচ অর্থাৎ ছাড়াও মেয়েদের।

১৯৫০ সালে মালিকা আসে পূর্ববঙ্গ থেকে তার দুটি ছেলে

ছুটি মেয়ে আর তার টি বি-তে ভোগা স্বামীকে নিয়ে। স্বামীর কাজ করবার ক্ষমতা ছিল না। সে সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে মুসলমান মজুরাণীরা তাদের খোলার ঘর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। মালিকা এসে পড়ায় আমাদের ঘড়িকলে কাজ পেয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে একটা ফেলে যাওয়া খোলার ঘরও পায়। কোনোরকমে তার স্বামীর ও সন্তানদের খাওয়ার ব্যবস্থা হয়। হপ্তা হয় সাড়ে পনের টাকা। এর উপর রিফিউজী লোন্-এর চেষ্টা করে। কিন্তু পায়নি। মালিকার বয়েস তখন আটাশ। তিন বছর কাজ করবার পর একদিন কলের মধ্যে হাত পড়ে গিয়ে তার কব্জি ভেঙে যায়। যতদিন অকর্মন্য ছিল ভাতা পেয়েছিল। হাত ভাঙার দরুণ ক্ষতিপূরণও পায় কিছু। সেরে উঠলে ইউনিয়ানের সাহায্যে তাকে হালকা কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। কিন্তু তারপর ১৯৫৫ সালে যখন ছাঁটাই সুরু হল তখন ঝাপটাটা মালিকার উপর এল খুব সহজেই। কারণ সে যে শুধু স্ত্রী-মজুর তা নয়, সে উপরন্তু হালকা কাজের মজুরাণী। প্রায় সবার আগে তারই চাকরী গেল। চটকলে কাজ করতে গিয়েই যে তার হাত ভেঙেছে সুতরাং তাকে কাজ দেওয়ার চটকলের একটা দায়ীত্ব আছে এ নিয়ে কেউই মাথা ঘামালে না। হাতে ক্ষতিপূরণের কিছু টাকা ছিল, তাই দিয়ে খরচ চালাতে লাগল কোনক্রমে। চাকরীর জন্যে ইউনিয়ানে ধরাধরি করতে লাগল কিন্তু ইউনিয়ান কিছু করতে পারল না। এদিকে টাকা ফুরিয়ে আসতে সংসারের অবস্থা হয়ে পড়ল সঙ্গীন। অর্দ্ধাহারে স্বামীর হল মৃত্যু। একটি ছেলেকেও হারাল সে। লোকের কাছে চাকরীর জন্যে যখন ঘোরাঘুরি করছে তখন বস্তীর লোকেরা মিষ্টি মুখে সহানুভূতি জানাতে আসতে থাকল—বেকার মেয়েদের ভাগ্যে যা সচরাচর ঘটে থাকে। শেষে একদিন মালিকা চটবস্তী থেকে হয়ে গেল নিরুদ্দেশ। কোথায় যে গেল কেউ তার খোঁজ পেলে না।

এই হল মালিকা। এমনি করেই নিখোঁজ হল সম্পূর্ণা, নেপি,

বাসী। আর সব কেউ গেল দেশে, কেউ দেশে গিয়ে আবার ফিরে এল অন্য কোনো কারখানায়। আমাদের চটকল হয়ে পড়ল প্রায় স্ত্রী-শূন্য। যে সব স্ত্রীর একটি করে পুরুষ ছিল তারাও কোনো না কোনো কারণে কোনো চক্রান্তে পড়ে স্ত্রীদের সঙ্গেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

এদের মধ্যে বাকি রয়ে গেল বিলাসিনী আর তার দুই সতীন। বিলাসিনী চটকলে এসেছিল বিশ বছর আগে রামব্রীজ সর্দারের সঙ্গে। আরো কয়েকজন মেয়ে এসেছিল তার সঙ্গে আশপাশের গ্রাম থেকে। তার বয়েস তখন ষোলো। দলের মধ্যে সেই ছিল সবচেয়ে ছোট আর সবচেয়ে সুন্দরী। রামব্রীজ তাকে একটা কাজে লাগিয়ে দিল কিন্তু কয়েকদিন কাজ করবার পর তার কাজ গেল। সে নাকি কাজের অনুপযুক্ত। এর মধ্যে রামব্রীজের কোনো সয়তানী ছিল কিনা জানা নেই। কিন্তু বিলাসিনী অত শত বোঝেনি। সে বেচারা কাঁদতে কাঁদতে তার কুপীর মধ্যে গিয়ে ঢুকেছিল। রামব্রীজ তাকে আগেও টাকা ধার দিয়েছিল, আবার দিয়ে গেল কিছু। বললে এখন এই দিয়ে চালাও। কাজ পেলে শোধ কোরো। বিলাসিনী কাজের অপেক্ষায় বসে থাকে। সবার কাজ হয়, বিলাসিনীর আর হয় না। বেচারা শুধু কাঁদাকাটা করে। দেনা তার ক্রমেই বেড়ে যায়। দেশে ফিরে যাবার কথা ভাবে। কিন্তু সুদ সুদ্ধ দেনা যা দাঁড়িয়েছে তা শোধ করবার ক্ষমতা তার বাপ-মায়েরও নেই। কাজেই দেশে ফিরে যায় কি করে? শেষে রামব্রীজ একদিন তার কুপীর দরজায় দাঁড়িয়ে বলল—দেখ বিলাসিনী, তোমার তো আর কোনো উপায়ই নেই। তোমার চাকরীর আমি অনেক চেষ্টা করছি, এখনও হয় নি। কবে হবে জানি না। কপাল! এদিকে শুনি বস্তীর ছোকরারা তোমার ঘরের দিকে উঁকি দিতে আরম্ভ করেছে। ঘরের বাইরে গেলে তারা তোমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। এটা তো ভাল নয়। এমন করে আর কতদিন থাকবে?

আমি বলি কি, তোমায় আমি সাদি করে ফেলি। তাহলে তোমার আর কোনো ঝঞ্ঝাট থাকবে না। আমি তোমায় ভালই রাখব।

শুনে বিলাসিনী আঁৎকে উঠেছিল। রামব্রীজকে তাড়িয়ে দিয়ে কুপীর দরজা বন্ধ করে ভাবতে বসেছিল গালে হাত দিয়ে। তার এই বয়েস আর রামব্রীজের? রামব্রীজকে কখনও বিয়ে করা যায়? কখনই না। সে দেখবে নিজে রোজগার করতে পারে কি না। মনে পড়ে যায় বাপ-মায়ের কথা। দুস্থ সংসার। পেট ভরা খাবার জোটে না কোনোদিনই। রামব্রীজ যখন গিয়ে তাদের বলল, মেয়ে বড় হয়েছে মেয়েকে কাজে লাগিয়ে দাও, তোমাদের দুঃখ ঘুচবে, তখন বাপ-মায়ের সে কি আপত্তি! বলে, ভগবানের আইন মতে আমরা খাওয়াবো মেয়েকে। মেয়ে খাওয়াবে আমাদের এ কোনো আইনই নয়। বিলাসিনী নিজে তখন জোর করে বাপ-মায়ের কথা না শুনেই চলে এসেছিল রামব্রীজের দলের সঙ্গে। এর পর তার নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ালেই নয়। চাকরী সে জোগাড় করবেই। তারপর রামব্রীজের দেনা শোধ করে নিজেই সে বিয়ে করবে নিজের পছন্দ মত।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সে দেখল রামব্রীজ ছাড়া তার আর কোনো গতি নেই। চাকরী রামব্রীজের হাতে। রামব্রীজ যদি চাকরী না জুটিয়ে দেয় তাকে আর কেউ চাকরী দিতে আসবে না। এদিকে যত দিন যাচ্ছে রামব্রীজের দেনাও তত বেড়ে গিয়ে আষ্টে পৃষ্ঠে তাকে জড়িয়ে ফেলছে। যেদিকে তাকায় সেদিকেই সে দেখতে থাকল রামব্রীজ! অগত্যা রামব্রীজকে সে বিয়ে করল।

বিয়ে করেই দেখল রামব্রীজের আরও দুই বৌ আছে লছমী আর লছমনিয়া। কিন্তু তখন আর কিছু করবার উপায় ছিল না। সতীন নিয়ে ঘর করতে সুরু করল বিলাসিনী। লছমী লছমনিয়া দুজনেই চটকলে খাটত, রোজগার করত। বিয়ের পরে প্রায়

অবতরণিকা

চটের কারখানার পাচিলের পিছনে আছে এক চমকপ্রদ জগত। বাংলাদেশের বহু পাঠক-পাঠিকারই পরিচয় নেই সেই জগতের সঙ্গে। অথচ পাট হচ্ছে আমাদের ডাল ভাতের মতই একান্ত আপন। বাংলার কোটি কোটি মানুষের অন্নের প্রধান উৎস ঐ পাট। আমার নিজের কথা বলতে পারি। উপজীবিকা হিসেবে যখন প্রথম আমি পরিসংখ্যান চর্চা গ্রহণ করি তখন আমার মাস-মাইনের টাকার যোগান আসত পাটের উৎপাদন মাপার কাজ থেকে। চাষী, মজুর, মুটে, বণিক, দালাল, দাদনদার দোকানদার, আপিসের কেরাণী, নৌকোর মাঝি, লরির চালক, ছোট বড় কারখানার মালিক এবং আরো কত কারুর জীবিকা এবং জীবিকাংশ নির্বাহ হয় পাট এবং চট থেকে। প্রথম যে ইংরেজ বণিক পাটের আঁশ হাতে তুলে নিয়ে ভেবেছিলেন এ দিয়ে মসিনা এবং শনের পরিবর্ত্তে সস্তায় রজ্জু এবং বস্ত্র বানানো যায় কিনা, তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি পাট থেকে চট উৎপাদনে মানুষের প্রয়াস ভবিষ্যতে এমন বিরাট ব্যাপক রূপ নেবে। আজ থেকে এক-শ যাট বছর আগে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মারফৎ শ-খানেক টন কাঁচা পাট ইংলণ্ডে পাঠানো হয় পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে কলে ফেলে ওকে কাজে লাগানো যায় কি না। এই সঙ্গে কিছু হাতে বোনা চটও গিয়েছিল ইয়োরোপের বাজারে। ফল দাঁড়ায় এইরকম। কলে চট বোনার কোনোরকম সহজ উপায় উদ্ভাবিত হল না। কিন্তু বাংলাদেশের হাতে বোনা চটের আদর দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল ইয়োরোপের বাজারে এমন কি উত্তর আমেরিকাতেও। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই লাভবান ব্যবসা চালিয়েছিলেন প্রায় সত্তর বছর। সে সময় বাংলার গ্রামে পাটের সুতোয় বোনা সরু মোটা চট, চটের ছালা, পাটের দড়ি, পর্দ্দা প্রভৃতি প্রচুর উৎপাদন হত। এত সস্তায় পাওয়া যেত চটের জিনিস যে ওজনদরে,হিসেব করলে দেখা যেত যে পাটের ওজনদরের সঙ্গে চটের ওজনদরের প্রায় কোনো তফাৎই নেই। অর্থাৎ যারা বুনতো

তারা তাদের শ্রমের জন্যে প্রায় কোনো মুনাফা না রেখেই ছেড়ে দিত। আসল লাভ করত ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। বড়ই লোভনীয় ছিল ব্যবসা। ইতিমধ্যে কলে পাটের সুতো কাটার আর কাপড় বোনার উপায় উদ্ভাবিত হয়ে গেল। স্কটল্যাণ্ডের ডাণ্ডি প্রদেশের কলে উৎপাদিত চট আমাদের দেশের হাতে-বোনা চটের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু করে দিলে। আমাদের দেশের তুলো থেকে উৎপন্ন হাতে ভাঙা হাতে বোনা সুতির কাপড়ের শিল্পকে ম্যান্‌চেষ্টার ও ল্যাঙ্কাশায়ার কেমন করে তাদের কলে-বোনা কাপড়ের সাহায্যে ধ্বংস করেছিল এ ইতিহাস অনেকেরই জানা আছে। ডাণ্ডি কেমন করে বাংলাদেশের চটের ঘরোয়া শিল্পকে শেষ করে দিয়েছিল তার কোনো সাজানো গোছানো ইতিবৃত্ত কোথাও নেই। কিন্তু এটা জানা আছে যে দেশীয় শিল্পটি ধ্বংস হবার পরেই বিদেশী চট-শিল্প প্রথমত ডাণ্ডির মাটিতে এবং তারপর বিদেশীদের আওতায় কলকাতার মাটিতে তড়িৎগতিতে বিস্তৃতি লাভ করে। এই সময় থেকে বাংলা দেশে ব্যাপকভাবে পাট বোনা সুরু হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলকাতার উত্তরে রিষড়ায় প্রথম চটকলের পত্তন। সে সময় চটের চাহিদা বিশ্বের বাজারে এমন যে চটকলের মতো এত মুনাফা করতে পারে এমন কোনো কারখানাই বোধ করি কোথাও ছিল না। 'বোর্নিও জুট কোম্পানী' ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। পাঁচ বছরের মধ্যে দ্বিগুণ ফেঁপে ওঠে সেই কারখানা। আট বছরের মধ্যে কোম্পানীতে যত মূলধন ঢালা হয়েছিল তার দ্বিগুণ উঠে আসে শুধু মুনাফাতে। 'বরানগর জুট কোম্পানী' ছ-মাস কাজ করে অংশীদারদের শতকরা ১৫ টাকা ডিভিডেণ্ড দেয়। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ডিভিডেণ্ড ছিল শতকরা ২৫ টাকা ১৮৭৪ এর শতকরা ২০ টাকা এবং ১৮৭৫ এর শতকরা ১০ টাকা। তখনকার দিনে পাট কলের শেয়ার বাজারে পড়তে পেত না। খাতা খোলার একবেলার মধ্যে সব শেয়ার বিক্রী হয়ে যেত। কলকাতার পাটকলের দিকে আঙুল দেখিয়ে লোকে বলত—ঐ দেখ ট্যাঁকশাল।

চটের বাজারের এই অপরিসীম সফলতা সত্ত্বেও পাটের চাষীর অবস্থা রয়ে গেল কিন্তু আগেরই দিনের মত দুর্দ্দশাপূর্ণ। তাদের অবস্থার কোনো উন্নতি হল না। লাভের কড়ির সমস্তটাই গিয়ে পড়তে লাগল কলওয়ালাদের পকেটে। এই লাভের যারা মূল রসদ জুগিয়ে এসেছে তাদের কথা সেদিনও যেমন কেউ ভাবেনি আজও ভাবে না। এই সময় চটের কারখানার পর

এই সব দেশী সুপারভাইজারদের উপর হুকুম এল—চালাও কড়া শাসন। কাজে ফাঁকি বরদাস্ত করবে না। এঁরা থেকে থেকে আজকাল জরিমানা করেন। না করলে এঁদেরই জবাবদিহী করতে হয় কর্তৃপক্ষের কাছে। আজকাল প্রায়ই তাই দেখা যায় কোনো সুপারভাইজার হয়ত মিলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, ধাঁ করে একটা ববিন্ বা কিছু কোথা থেকে ছটকে তাঁর মাথায় বা পিঠে এসে লাগল। একেবারে নির্ভুল টিপ। কিন্তু কে যে মারল, কোথা থেকে এল দ্রব্যটা ধরা যায় না।

আমাদের মিলের স্পিনিং শেড্এর সুপারভাইজার চক্রবর্তী একদিন খুব তড়বড় করে যাচ্ছিলেন স্পিনিং শেড্এর মধ্যে দিয়ে। হঠাৎ একটা লোহা এসে লাগে তাঁর মাথায়। সামনে থেকে আসে কি পিছন থেকে আসে তা-ও তিনি বুঝতে পারেন না। তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন। হাত যখন সরিয়ে নেন, দেখেন পাঁচটা আঙুল রক্তে চট্‌চট্ করছে। তারপরই তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। ডাক্তার এসে দেখে চক্রবর্তীর মাথা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর সুরু হয় তদন্ত। চক্রবর্তীর বন্ধু ভরদ্বাজ আরেকজন ডাণ্ডী-ফেরং সুপারভাইজার; তিনি সাক্ষ্য দেন তিনি নাকি নিজের চোখে অমুক মজুরকে দেখেছেন লোহা ছুঁড়ে মারতে। সত্যিই কিন্তু ভরদ্বাজ অকুস্থলে ছিলেন না। কোনো সুপারভাইজারই ছিলেন না। ভরদ্বাজের গভীর সন্দেহ ছিল একজনের উপর এবং তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল ও ছাড়া আর কেউ চক্রবর্তীকে মারবে না। বিচারশালায় ভরদ্বাজের সাক্ষ্য যখন নেওয়া হল তখন আসামী এবং অন্যান্য মজুরেরা সবাই মিলে একসঙ্গে প্রতিসাক্ষ্য দিল যে ভরদ্বাজ ঘটনার সময় সেখানে ছিলেন না। ভরদ্বাজ তার উত্তরে বলেন, ঘটনাস্থলে তো অনেকেই ছিল, তারা যদি কে আসামী তাকে দেখে না থাকে তাহলে তারা যে আমাকেও দেখবে না এ আর বিচিত্র

কি? এই উত্তরের ফলে আসামীর শাস্তি হল। তার উপর একটা তালিকা তৈরী হল দাগী আসামীদের নাম নিয়ে। বলে দেওয়া হল, এবার থেকে ঘটনাস্থলের ত্রিশগজের মধ্যে যে-কোন দাগী আসামীই থাকুক তাকে শাস্তি পেতে হবে। এর ফলে জিনিস ছুঁড়ে সুপারভাইজারদের মারা আমাদের মিলে একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

সবাই ভাবল বুঝি চুকে গেল গোলমাল। কিন্তু তার পরেই ঘটল এক অতি শোচনীয় ঘটনা। ভরদ্বাজ একদিন দুপুর বেলা খাওয়া সেরে স্পিনিং শেড্-এর মধ্যে দিয়ে হেঁটে ফিরে চলেছেন নিজের আফিসে এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে কে একজন এসে ছুরী মেরে তাঁর পেট ফাঁসিয়ে দিল। ভরদ্বাজ মাটিতে পড়ে যেতেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে পাঁজাকোলা করে তুলে তাঁর আপিসের মধ্যে নিয়ে গেল কয়েকজন মজুর। তারপর ফিরে গিয়ে তারা শেড্-এর মেঝে ধুয়ে রক্তের সমস্ত চিহ্ন সাফ করে দিলে। ঘটনা যখন কর্তৃপক্ষের কানে পৌঁছল তখন ভরদ্বাজ মারা যাচ্ছেন। ভরদ্বাজকে জিজ্ঞেস করা হয়, কে মেরেছে বা কে সাহায্য করেছে তাদের নাম বলতে। কারুর নাম বলবার আগেই ভরদ্বাজ মারা যান। শেড্-এ গিয়ে দেখা যায় শুধু জল আর জল। সত্যি কোন জায়গায় যে খুন হয়েছে কোনমতেই বোঝবার যো নেই। রোজই যেমন ধোওয়া মোছা হয় আজও তেমনি হচ্ছে। ঘটনার কথা কেউ কিছু জানে না। কেউ দেখেও নি শোনেও নি। তদন্ত ঐখানেই খতম। কর্তারা এতবড় একটা খুনের কোনো কিছুই হিল্লে করতে পারলেন না। মজুরদের কারো কাছ থেকে কোনো কথাই বার করতে পারলেন না। তবে উৎপাদন বাড়ানোর অছিলায় যে জরিমানা আর অত্যাচারের হিড়িকটা এসেছিল সেটা এর পর থেকে বন্ধ হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গেই বিলাসিনী পেয়ে গেল একটা কাজ। তারপর আজ এই বিশ বছর রামব্রীজের তিন বৌ রোজগারপাতি করে টাকা এনে স্বামীর হাতে তুলে দিয়েছে। রামব্রীজ আরামে কাটিয়েছে দিন। রামব্রীজের লাইন সর্দ্দারী কাজ ছিল। উপরি ছিল নানারকম। কিন্তু মহা দোষ ছিল জুয়ো খেলার। জুয়ো খেলে খেলে লোকটা প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। কাজেও ফাঁকি দিতে আরম্ভ করে। মন পড়ে থাকে জুয়োর পিছনে। শেষে সর্দারি প্রথা উঠে যেতে তার দাপট-ও চলে যায়। তখন সে কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে তিন বৌ-এর রোজগারের টাকায় দিন গুজরান করতে আরম্ভ করে। সেই সঙ্গে চলতে থাকে তার জুয়োর আড্ডায় আনাগোনা। শোনা যায় কর্তৃপক্ষকে সে শ্রমিকদের সম্বন্ধে নানা-রকম খবর সংগ্রহ করে এনে দিত এবং কর্তৃপক্ষ তার কাজ না-থাকা সত্ত্বেও তাকে ভালো চোখে দেখতেন। গুজব যে উক্ত কারণেই অন্যসব স্ত্রীলোকের চাকরী যাওয়া সত্ত্বেও তার তিন বৌ-এর চাকরী যায়নি!

বিলাসিনী হপ্তা পেত বারো টাকা বারো আনা। লছমী লছমনিয়াও ঐ রকম। রামব্রীজ নিয়ম করে দিয়েছিল যে বৌরা নিজেদের প্রত্যেকের কাছে দু-আনা মাত্র রেখে বাকি সব টাকা রামব্রীজের হাতে তুলে দেবে। বিলাসিনী একবার কি একটা দোষ করায় সুপারভাইজার তার চার আনা জরিমানা করেন। বারো টাকা বারো আনার বদলে সে পায় বারো টাকা আট আনা। হপ্তা নেবার সময় রামব্রীজ এসে হাজির। বিলাসিনী বেচারা নিজের দু-আনা না রেখেই পুরো সাড়ে বারো টাকা তুলে দিয়েছিল স্বামীর হাতে। রামব্রীজের সে কী রাগ! তার বারো টাকা দশ আনা পাবার কথা, পেল কি না দু-আনা কম! বিলাসিনীকে ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল সুপারভাইজারের সামনে। মারতে মারতে বললে—দেখুন সার্ কাজে ফাঁকি যখন দিয়েছে তখন

শুধু চার আনা জরিমানাই যথেষ্ট নয়—এমনি করে একে শিক্ষা দিতে হয়—বলে আবার হাত তোলে। সুপারভাইজার মাঝে প'ড়ে তাকে সামলান।

আর সবার কাজ গেলেও বিলাসিনী লছমী আর লছমনিয়ার কাজ রয়ে গেল। আর রামব্রীজের কোনো কাজ না থাকা সত্ত্বেও সে মিলের মধ্যে নিয়মিত যাওয়া আসা করতে থাকল এবং কর্তৃপক্ষের পরম উপকারে লাগতে লাগল।

মজুররা চটে ওঠে আজকাল একটুতেই। আগেকার দিনের সেই শান্ত নিরীহতা, সেই নির্ভরশীল নির্লিপ্ততা আর নেই। যাদের চাকরী গেছে তারা এক সঙ্গেই তো কাজ করত, তারা এসে ধরাধরি করে, বিরক্ত করে, ধার ধোর চায়, তার উপর কেমন করে যেন তাকায়। মন মেজাজ ভালো থাকে না কারুরই। কাজেও তেমন মন লাগে না। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কেমন যেন একটা অনিশ্চয়তা। কার কপালে যে কি আছে কিছু জানা নেই। আজকাল আবার মিলেও কড়াক্কড়ি বেড়েছে। ধুয়ো উঠেছে উৎপাদন বাড়াবার। কাজে ফাঁকি দিলে চলবে না। ধমক ধামক আছেই, তার উপর জরিমানা। কোম্পানী খরচ কমাবার জন্যে সায়েব সুপারভাইজারদের আস্তে আস্তে বিদায় দিয়ে তার জায়গায় দেশী সুপারভাইজার নিযুক্ত করতে সুরু করেছে। এতে খরচ কমেছে, ভারত সরকারকেও দেখানো হচ্ছে—দেখ আমরা ভারতীয়দের কত চাকরী দিচ্ছি। ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের এবং লভ্যাংশ বন্টনের আসল ভার অবশ্য সমস্তই রয়ে যাচ্ছে পুরোনো কর্তাদেরই হাতে। ডাণ্ডি থেকে ট্রেনিং দিয়ে দেশী ছাত্রদের নিয়ে আসা হতে থাকল সুপারভাইজার করে। শেষে তাতেও কুলোলো না—কলকাতাতেই মস্ত প্রতিষ্ঠান খাড়া করে ছাত্রদের চটশিল্প-এর 'টেক্‌নিক্' শিক্ষা দেওয়া হতে থাকল।

উবে যেতে পারেন তাহলে নীচের তলার মজুর মজুরানী এদের স্থিতি আর কতটুকু ? সমারু, ছত্রধর, কালু সর্দার, গোদাবরী, গোদাবরীর সখা চম্পাকলি, লাখো হাজারি, ফগুয়া, নরোত্তম, আবদুল, লোকনাথ বিসম্ভর, সকলু, বুধমাল, আপান্না, ন্যাংড়া কুলি হুনরাজ, বিলাসিনী, লছমী, লছমনিয়া আর তাদের একত্র স্বামী রামব্রীজ, এদের মধ্যে বেশীর ভাগই চলে গেছে ; যারা এখনও টিকে আছে তাদেরও যেতে দেরী নেই। এই ক-বছরেই তো আমি এই দেখলুম। এক-শ' বছর ধরে চলেছে এই অভিনয়। এর অনেক কিছুই আমি দেখি নি। শুনেছি কিছু কিছু। তবে অনুমান করতে পারি সবটাই। পুনঃ পুনঃ ঘটেছে একই দৃশ্যের আবির্ভাব। সকলে মিলে নিজেদের স্বার্থরক্ষার তাগিদে বছরের পর বছর পরিশ্রমের ফলে দাঁড় করিয়েছে এই বিরাট চটশিল্পকে। এর মধ্যে অধিকারীদের যেমন স্বার্থ পদানত অধিকৃতদেরও তেমনি। কিন্তু এই দুই দলের স্বার্থ কোনদিন এক হয় নি। এবং এক হয়নি বলেই সব সময়েই টলমল টলমল করে অগ্রসর হয়েছে চটশিল্পের যুগ। মাটিতে শিকড় গেড়ে বসেনি কোনদিন। অথচ দুই দলের যুক্ত স্বার্থের মিলিত আগ্রহে যদি চটের শিল্প গড়ে উঠতে পারত এতদিন তাহলে কবে কোনকালে অটল হয়ে বসত এ পৃথিবীর মাটিতে। বারবার সংকটের সম্মুখীন হতে হত না, বার বার সহস্র কুলিকে খেদিয়ে দিতে হত না চটের কারখানার দ্বার থেকে বুভুক্ষু কুকুরের মতো। চটের বস্তীর মাটিও এমন লক্ষ চোখের অশ্রুপাতে সিক্ত হয়ে উঠত না। এক-শ' বছরের চটের ইতিহাসে কী লেখা হবে ? শুধুই কি এমনি স্রোতের মুখে হাল ছেড়ে ভেসে যাওয়ার কাহিনী ? না কি বাঁকের মুখে এখনও আছে আশার আলো ? জানি না।

ফগুয়া ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকে বললে—হুজুর, গোদাবরীর

ছেলেকে মিস্ত্রীখানায় ঢুকিয়ে দিতেই হবে। নইলে ওরা না খেয়ে মরবে।

জিজ্ঞেস করলুম—না খেয়ে মরবে কেন? গোদাবরীর হল কি?

শুনেছিলুম গোদাবরী ছাঁটাই বেনিফিট নেবার জন্যে ঝুঁকছিল। আবছুল আর ফগুয়া সামলে রেখেছিল তাকে। গোদাবরীর ছেলে বড় হয়েছে, তাকে কাজে লাগিয়ে দেবার তোড়জোড় চলছিল অনেকদিন ধরে। কয়েক মাসের মধ্যে তার কাজও হয়ে যেত হয়তো একটা, কিন্তু হঠাৎ কিসের তার এত জরুরী ঘটল জানতুম না। তাই ফগুয়ার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালুম।

ফগুয়া বললে—ডাক্তারখানা থেকে ওকে এই মাত্র ফিরিয়ে আনলুম। ওর যা অসুখ, ডাক্তার বলেছে ওর আর একদিনও কাজ করা উচিত নয়।

ফগুয়া আর আবছুল, ওরাই এতদিন বোঝে নি। গোদাবরী যে বার বার ছাঁটাই বেনিফিটের কথা বলেছে সে ওর অসুখেরই কথা ভেবে।

গোদাবরী টের পেয়েছিল খুব বেশী দিন সে আর বাঁচবে না। কলে যদি আট ঘণ্টা করে খাটে তাহলে আরও দ্রুত আসবে তার অবসান। কারখানায় দু-তিনবার সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল কাজ করতে করতে। কোনদিন কিন্তু সে ঘুণাক্ষরেও জানতে দেয়নি আবছুলকে বা ফগুয়াকে তার অসুখের কথা। গোদাবরী অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল এ কথা লোকমুখে শুনে ফগুয়া তাকে জোর করে নিয়ে গিয়েছিল ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার যা বলেছেন তা একরকম প্রায় জবাব দেওয়া। কাজেই গোদাবরী হল ছাঁটাই। যে ছাঁটাই বেনিফিটের বিরুদ্ধে আবছুল আর ফগুয়া অবিশ্রান্ত লড়ে এসেছে, এবারে তারা হার মানল তার রুদ্র মূর্তির কাছে।

সুজিত আর আমি বুঝিয়ে বললুম দাস সায়েবকে। মিস্ত্রী নেওয়া

ভারত বিভাগ হয়ে পাকিস্তানের উদ্ভবে ভারতের চটশিল্প অসুবিধায় পড়েছিল। তা ছাড়া যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর বাজারে চটের চাহিদা কম পড়ায় তাদের লাভের অঙ্ক গিয়েছিল নিরতিশয় কমে; এই অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে সফলভাবে বেরিয়ে আসতে চটশিল্পের লাগল কয়েকটা মাত্র বছর। তাদের প্রধান সহায় ছিল তাদের নিজেদের সংহতি। এমনিভাবে ব্যবসা সংকটে যখনই এরা পড়েছে, এক-শ বছর ধরে কতবার এসেছে এমন সংকট, প্রতিবারেই তারা নিজেদের একবদ্ধ প্রচেষ্টায় বাধা টপকে বেরিয়ে গেছে। শ্রমিক-কুলকে প্রতিবারেই হতে হয়েছে প্রতিহত বঞ্চিত। যেমন ১৯৩১ সালে। সেবারের জগৎব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটে শ্রমিকের দল কর্মহীনতার অবাধ স্রোতে ভেসে গিয়ে অনাহারে মরেছিল কুকুরের মতো। এবারে দেখা গেল সকলে মিলে একসঙ্গে কি করে নিজেদের ব্যবসাকে সুদৃঢ় করা যায়, পৃথিবীর বাজারে কেমন করে সফলভাবে পাকিস্তানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যায়, নতুন ক্রমবর্দ্ধমান বাজারে কেমন করে প্রবেশ করে নিজেদের স্থান করে নেওয়া যায় এবং সমস্তটাই নিজেদের মধ্যে খাওয়া খাওয়ি মারামারি না করে, সুসংযত সুমসৃণ গতিতে, তার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল এদের শক্তিশালী সুগঠিত সংস্থা। আমেরিকার বাজারে যখন মন্দা তখন এরা অস্ট্রেলিয়ার বাজারে পাঠিয়েছে এদের প্রতিনিধি। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতচর্ম সরকার যখন সেখানকার কৃষ্ণচর্ম অধিবাসীদের উপর অন্যায় অত্যাচার সুরু করল তখন ভারত সরকার দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে সমস্ত আমদানী রপ্তানীর কারবার বন্ধ করে দিয়েছিলেন। প্রচুর চটের থলি যেত দক্ষিণ আফ্রিকায়। মোটা টাকা আসত আমাদের চটশিল্পের সিন্দুকে। সেই অর্থাগমের পথ

বন্ধ হতেই এরা কোরিয়া যুদ্ধের বাজারে মোটা মুনাফায় চট বেচে তিনগুণ ঘাটতি পুরিয়ে নিল। এমনি কতবার যে এরা নিজেদের সামলেছে তার ঠিক নেই। এবারে এরা এদের লাভের কড়ি বজায় রাখতে গিয়ে যখন শ্রমিকদের অপ্রতুল জীবিকার দিকে নজর দিতে বাধ্য হল, তখন কিন্তু শ্রমিকদের স্বার্থ বাঁচাবার জন্যে শ্রমিকদের কোনো শক্তিশালী সংহতি ছিল না। ক্ষুদ্র অপরিসর স্বার্থ ভরা যে সব ছোট ছোট সংগঠন ছিল তারা মারামারি করত নিজেদের মধ্যে। এক দল যদি এগিয়ে যেতে চাইত একদিকে অন্য দল তাদের পিছিয়ে নিয়ে আসত অন্যদিকে। কাজেই এক ঝটকায় ষাট হাজার শ্রমিক যে ছিট্‌কে বেরিয়ে গেল এবং আরো ষাট হাজার যে যাবার পথে সেটা কিছুই বিচিত্র নয়। কর্ত্তৃপক্ষের মেজাজ যে প্রফুল্ল এবং শ্রমিকদের অন্তর যে বিপর্যস্ত যার ফলে তারা খুন পর্যন্ত করতে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাও কিছু আশ্চর্য নয়। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য আজ প্রায় এক-শ বছর ধরে চলেছে এই অবারিত দুঃখের কাহিনীর এই মর্মান্তিক দারিদ্রের একটানা স্রোত। সোনালী সুতোর বদলে সোনার মোহর আসছে ঘরে অথচ সহস্র সহস্র মানুষের চোখের জল ভরা এই বিক্ষুব্ধ অধ্যায়ের শেষ হচ্ছে না। টান আসছে কেবল এক দিক থেকে, পোড়েন নেই। এক-শ বছর প্রায় শেষ হতে চলল। চটশিল্পের সুদীর্ঘ অগৌরবের ইতিহাস শতাব্দির তটে এসে প্রায় ঠেকেছে। এর শেষ দৃশ্য কি তা কি কেউ জানে?

আমারই এখানে কেটে গেল আজ কত বছর! বিভূতিবাবুর দয়ায় ঢুকেছিলুম কারখানায়। ক্ষমতার গৌরবে ভরপুর স্ফীত বিভূতিবাবু। লোককে চাকরী দিতে পারতেন, টাকা ধার দিতে পারতেন, লোকের উপকার করতে পারতেন, তেমনি ইচ্ছে করলেই পারতেন অপকার করতে, লোকের চাকরী খেয়ে দিতে। সেই বিভূতিবাবুর মত লোকই যদি চটশিল্পের রঙ্গমঞ্চ থেকে কর্পূরের মত

চটের কারখানায় বিদেশ থেকে যেমন যন্ত্র এসে পড়তে লাগল তেমনি অতি তীব্র ভাবে দরকার হয়ে পড়ল সেই সব যন্ত্র চালাবার জন্যে অনেক জোড়া হাতের। সস্তায় মজুর পাওয়ার জন্যে রেষারেষি লেগে গেল কারখানার সঙ্গে কারখানার। আজকের দিনে বোঝা যায় না, কিন্তু সেই প্রথম যুগে যতদূর সম্ভব সস্তা হারে এক ঝাঁক মজুর সংগ্রহ করার উপরই নির্ভর করত কোম্পানীর সফলতা। আজকে 'ভিক্টোরিয়া'ও 'শ্যামনগর' এই উভয় চটকলই এক ম্যানেজিং এজেন্সির তাঁবে দুই ভাই বোনের মত গায়ে গায়ে বিরাজ করছে ; কিন্তু ঐ ভিক্টোরিয়া জুট কোম্পানীই সে সময় শ্যামনগর কোম্পানীর বিরুদ্ধে নালিশ রুজু করেছিল। ভিক্টোরিয়ার যে নিজস্ব এলাকায় সে মজুর বসিয়েছিল সেখানে বাইরের মিল শ্যামনগরকে ঢুকতে দিতে তার বিষম আপত্তি ছিল। দু-বছরের উপর সে লড়েছিল এই কেস্ নিয়ে। এরই থেকে বোঝা যায় যতদূর সম্ভব সস্তায় মজুর নিয়োগই ছিল চটকলের মূল নীতি। পর্বত প্রমাণ মুনাফা ঘরে আসা সত্ত্বেও এই নীতির সেদিনও যেমন পরিবর্ত্তন হয় নি, আজও হয় নি।

এই হচ্ছে মোটামুটি চট শিল্পের পূর্ব ইতিহাস। অসমাপ্ত চটান্দ উপন্যাসটি পুরোপুরি উপভোগ করবার সুবিধে হবে বলে এই ইতিহাসটুকু বলে দিতে হল। এই উপন্যাস লেখার কালে আমি অনেকের কাছে সাহায্য পেয়েছি, তাঁদের সকলের নাম প্রকাশ করা সম্ভব হল না। আমার একটি বিশেষ বন্ধু ও ছাত্র আমাকে গোড়া থেকে উৎসাহ দিয়ে এবং সর্বতোভাবে সাহায্য করে এসেছেন। তাঁর অনুরোধে তাঁকেও অজ্ঞাত রাখতে হল। এঁদের সকলের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

মার্চ্চ, ১৯৬৩ মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি সবই কাল্পনিক। চটশিল্পের বাস্তব
জগতের বহু ঘটনা বহু চরিত্রই আমার অজানা। সেই
রকম অজানা চরিত্র বা ঘটনার সঙ্গে আমার কল্পনার
যদি কোনো মিল কোনো পাঠক অকস্মাৎ
আবিস্কার করে বসেন, তা হলে তা
দৈবঘটিত বলেই ধরে নেবেন।

হচ্ছিল তখন। একে কারখানারই পুরোনো মজুরাণীর ছেলে তার উপর মজুরাণী নিজে ছাঁটাই হতে চাইছে, এ কথা দাস সায়েব কাপুর সায়েবকে বুঝিয়ে দিতে তিনি অরাজী হলেন না।

গোদাবরীর ছেলে মুনকা কাজে ঢুকল।

প্রথম যেদিন সে সারাদিনের কাজ সেরে এসে তার রুগ্না মায়ের বিছানার পাশে দাঁড়াল, দেখল ফগুয়া—আর আবদুল দুজনে তার জন্যেই অপেক্ষা করছে। আজকের দিনে তার অনেকদিন পরে মনে পড়ল নিজের বাপ সমারুর কথা। বাপকে শেষ দেখেছে নেহাৎ শিশু বেলায়। বাপের চেহারা এবং অন্যান্য স্মৃতি তার মনের মধ্যে ঝাপ্‌সা হয়ে এলেও এ কথা সে কোনোদিন ভুলতে পারে না যে তার বাপ তার মাকে আর তাকে ফেলে পালিয়েছে। ফগুয়ার দিকে চোখ পড়তেই তার হঠাৎ মনে হল ফগুয়াও তার বউকে ফেলে পালিয়েছে, কিন্তু এই দুই পালানোর মধ্যে কত তফাৎ! একজন পালিয়েছে চটবস্তী থেকে চোরের মত মাথা নীচু করে আর একজন পালিয়ে চলে এসেছে চটবস্তীরই মধ্যে। মুনকা কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

আবদুল তার কাছে এগিয়ে এসে তার পিঠে হাত রেখে বললে—মুন্‌কা, কেমন লাগছে?

মুনকা বললে—নিজের হাতে প্রথম রোজগার করব। ভালই লাগছে।

আবদুল বললে—দেখ, বস্তীর ছেলে তুই। সুখ দুঃখ দুই-ই এখানে আছে। সুখের চেয়ে দুঃখই বেশী বুঝবি ক্রমে। তবে চটের শিল্পের এক-শ বছর হবে আর সতের বছর পরে। তোর বয়েস হবে তখন চৌত্রিশ। ফগুয়া আর আমি ততদিনে বুড়ো হয়ে পড়ব। তোরাই চালাবি তখন বস্তীর সমাজ। আমি আশীর্বাদ করি তোর চৌত্রিশ বছর হবার আগেই চট-বস্তীর যত দুঃখ কষ্ট সব তোরা ঘুচিয়ে ফেলবি।

সুনকা বিশেষ কিছু না বুঝে ফ্যাল ফ্যাল করে আবদুলের দিকে তাকিয়ে রইল।

তার দৃষ্টি দেখে মনে হয় সে যেন জানতে চায়। জানতে চায় বস্তীর কুলিদের দুঃখ ঘোচাবার কি পথ?

আবদুল কিছু না বলে সুনকার দিকে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। আবদুলের জানা আছে পথ। ভালো করেই জানা। শুধু পথে যাত্রীর এখনও অভাব। নতুন যাত্রীদলের অগ্রণী হয়ে সুনকাই বোধ হয় প্রথম এল।

—শেষ—

